কামতাপুরী : বাংলা সীমান্তে
গোপন গেরিলা সরকার ?

মিত্র প্রকাশন প্রকাশনা

আলোকপাত

জুন ১৯৮৬ □ মূল্য ৪.০০

প্রণব
পতনের
পশ্চাদপট

রামকৃষ্ণ মিশন
কি সত্যিই
হিন্দু নয় ?

আলপনা গোস্বামীকে নিয়ে জ্যোতি বসুর সংসারে অশান্তি !

ফুটবলের তিন প্রধান
কে কেমন ?

শর্মিলা ঠাকুর :
দুই দুনিয়ার দ্বন্দ্ব

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : শিপ্রা বিশ্বাস - স্ক্যান করেছেন : সুমন বিশ্বাস

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।
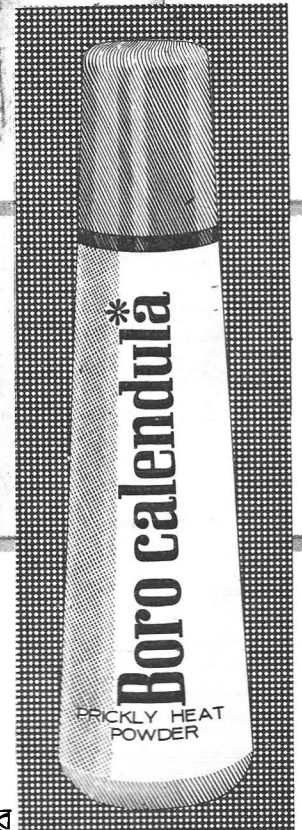
ক্যালেন্ডুলার ভেষজ গুণে ভরপুর...
Boro calendula*
PRICKLY HEAT POWDER
গ্রীষ্মের
দিনগুলিতে বোরো ক্যালেন্ডুলার সাহায্যে
সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে আপনার ত্বককে ঘামাচি
থেকে সুরক্ষিত রাখুন। প্রাকৃতিক উপাদান ক্যালেন্ডুলা
ও হাইড্রাস্টিস্ ভেষজের নির্য্যাসে তৈরী এই প্রিক্লি হিট পাউডার
আপনার শরীরকে দুর্গন্ধমুক্ত করে, আপনাকে তরতাজা রাখে সারাদিন।

আপনি কি...
ভালো কোয়ালিটি পাবার জন্যে বেশী দাম দিচ্ছেন?
না, বাজে কোয়ালিটি কিনছেন?

বিজ-এর সুষমতা
গ্রহণ করুন!

দামে

আগে পরিষ্কার করার পাউডার দু'রকমের হত। এক তো খুব উঁচু কোয়ালিটির, যার দাম চোকাতে গিয়ে পকেট খালি হয়ে যায়, আর অন্যটি একদম সস্তা কোয়ালিটির, যার দাম নিশ্চয়ই কম, তবে কোয়ালিটি...মাফ করবেন!

তারপর এলো বিজ

বিজ—দামে আর কোয়ালিটিতে এক অসাধারণ সুষমতা বজায় রাখে। আসলে বিজের দাম থেকে দ্বিগুণ লাভ পাওয়া যায়, দেখুন কি করে—সুপার বিজ অন্য নামকরা পাউডারের তুলনায় ২৫% কম দামে পাওয়া যায়, আর এটি অন্য সস্তা পাউডারের চেয়ে কম পরিমাণে ব্যবহার করতে হয়—অথচ ফল হয় তেমনিই ঝকঝকে... ঝলমলে!

NEW SUPER BIZ
multipurpose CLEANING POWDER WITH SUPER DETERGENT
5-refill pack
GODREJ SOAPS LIMITED BOMBAY 400 079
NET WT 2.5 kg
MADE IN INDIA

কাজে

সুপার-বিজে বাড়তি ডিটারজেন্ট আছে,—যা তেলচিটেভাব সহজে, আর দাগ-ময়লা-কালি নিমেষে সাফ করে। সুপার বিজে চট্ করে ফেনা হয়, তাই অনেক তাড়াতাড়ি, অনেক ভালো করে আর অনেক সহজে সাফ করতে পারে।

সুপার বিজ মসৃণ বা খরখরে সবকিছুর ওপরই সমান প্রভাবশালী। স্টীলের বাসন বা কাঁচের, কাঁটা-চামচ বা সিঙ্ক আর মেঝে—প্রায় সবকিছুই এই দিয়ে সাফ করতে পারেন। পরিষ্কার করার সমস্যা যত রকমেরই হোক না কেন, তার সমাধানের জন্যে যখন বহুপযোগী সুপার বিজ রয়েইছে, তখন আর আলাদা আলাদা দামী পাউডার কেনবার দরকার কি? সাশ্রয় আর কোয়ালিটি কোনোটাই হারাবেন না! বিজের দারুণ সাশ্রয় আর দারুণ কাজের সুষমতা গ্রহণ করুন!

দাম কম হলে কি হয়, তেমনিই ঝকঝকে...ঝলমলে রয়!

CASGS-163-244BEN

আলোকপাত ● প্রথম বর্ষ ■ পঞ্চম সংখ্যা ■ জুন ১৯৮৬

বাস্তব জীবনের আয়না

প্রধান সম্পাদক : আলোক মিত্র
সহায়ক সম্পাদক : রমাপ্রসাদ ঘোষাল
সহ সম্পাদক : প্রদীপ বসু
উপসম্পাদক : হাবিব আহসান
রবিশঙ্কর বল
গুরুপ্রসাদ মহান্তি

সংবাদদাতা :
দিল্লি : পুষ্কর পুষ্প
হায়দ্রাবাদ : পারভেজ খান
মাদ্রাজ : কাবেরী শেঠী
লণ্ডন : বলবন্ত কাপুর
ওয়াশিংটন : শেখর তেওয়ারি
লস এঞ্জেলেস : আফসান সফি
বম্বে ব্যুরো প্রধান : রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব
আলোকচিত্রী : বিকাশ চক্রবর্তী
অঙ্গসজ্জা : শান্তনু মুখোপাধ্যায়

দিল্লি কার্যালয় :
কে.এল. তলোয়ার ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক
৩০৫ রোহিত হাউস, ৩, তলস্তয় মার্গ
নয়াদিল্লি—১১০০০১
দূরভাষ : ৩২৪৪১৬, ৩২৪৫৩০
বম্বে কার্যালয় :
জি. কৃষ্ণান; আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৮৯০ এমব্যাসি সেন্টার
নরীম্যান পয়েন্ট
বম্বে—৪০০০২১
দূরভাষ : ২৪৩৫৭৭ গ্রাম : মায়াকহানি
কলকাতা সম্পাদকীয় ও ব্যবসায় কার্যালয় :
স্টিফেনস কোর্ট
ফ্ল্যাট—৫ এ (পাঁচতলা)
১৮ এ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা—৭০০০১৬
দূরভাষ : ৪৫—৪৩৫২
প্রধান কার্যালয় :
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ ২১১০০৩
দূরভাষ :৫৩৬৮১, ৫১০৪২, ৫৫৮২৫, ৫৫৭৭৩
গ্রাম : মায়া এলাহাবাদ
টেলেক্স : ০৫৪০ ২৮০
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ—২১১০০৩ থেকে দীপক মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং মায়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে মুদ্রিত।
ফোটোকম্পোজিং : মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এলাহাবাদ-এর একটি ইউনিট—সুরুচি অফসেট।

AIR SURCHARGE 50 PAISE PER COPY for Dibrugarh, Silchar, Tinsukia, Jorhat, Tejpur, Sillong, Kathmandu and 25 Paise, Agartala

সূচীপত্র

আলোকপাত : পৃষ্ঠা ৮

প্রণব মুখার্জি ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিলেন অনেকদিন। কেন্দ্রিয় মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় অবস্থান থেকে তারপর তার ক্রমাবনমন আর এই সাম্প্রতিক বহিষ্কার, ঘটনাগুলি কি একান্তই আকস্মিক ? পশ্চাদপটের অনেক গোপন তথ্য।

মুখ্যমন্ত্রী—পুত্র চন্দন বসু এখন জড়িয়ে গেছেন ফিল্মস্টার আলপনা গোস্বামী বিতর্কে ? মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রবধূ শ্রীমতী ডলি কেন নামলেন টি.ভি. র পর্দায় ? জর্জকে ছেড়ে আলপনা চন্দনের সঙ্গে মাখামাখি বাড়ালেন কেন ? ব্যবসার পিচ্ছিল পথে পা বাড়িয়ে চন্দন কি মুখ্যমন্ত্রীর পাবলিক ইমেজ নষ্ট করছেন ?

প্রচ্ছদ কাহিনী : পৃষ্ঠা ৩০

ঠাকুর পরিবারের মেয়ে এখন পতৌদির নবাব পরিবারের বেগম। যার পর্দানসীন থাকার কথা তিনি এখন ফিল্মি দুনিয়ার সম্রাজ্ঞী। ব্রাহ্ম সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা নারী মুসলিম ঘরানায় কিভাবে খাপ খাওয়াচ্ছেন নিজেকে ?

চেনামুখ অচেনা মানুষ : পৃষ্ঠা ৭৬

বিশ্ববিদ্যালয়ের আজব পাঠ

বড় আশ্চর্যের এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অনেকে বলে রাজনীতির কেন্দ্রস্থল, কেউবা বলে কাজে ফাঁকি দেওয়ার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, কেউ কেউ বলে ধর্মঘটের রেকর্ড, আবার কিছু স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্ররা ডিনামাইট দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে উড়িয়েও দিতে বলছে।

কেন্দ্র কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিগ্রহণ নিচ্ছে না? উপাচার্য, মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা দূর করতে পারছেন না? পরীক্ষা বা রেজাল্টের ক্ষেত্রে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? অতীতে এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতের গর্ব। আজ তার এই অবস্থা কেন? পুরনো উপাচার্য (রমেন পোদ্দার) এবং নতুন উপাচার্য-এর নানা ভাল মন্দ কার্যকলাপ জনসাধারণের জানা দরকার।

'আলোকপাত' কি সঠিক তদন্ত করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আলোকপাত করতে পারে না?

সুব্রত চন্দ্র
দমদম ক্যান্টনমেন্ট
কলকাতা–৬৫

অজন্তা অনুপমা

অজন্তার গুহাগুলির মধ্যে একটাতে ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি ছবি আছে–একদল নারী উপহার সামগ্রী বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে গাইড দর্শকদের দেখায় দ্বিমাত্রিক ছবি–গুলি অন্ধকারে কেমন ত্রিমাত্রিক হয়ে যায়। নারী মূর্তিগুলিকে তখন মার্বেল পাথরের তৈরি মনে হয়। এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় চমকে দেবার জন্য পুরাকালের শিল্পীরা যে আলোছড়ানো রঙ তৈরি করতেন সেটা কি রকম? আজ কি আর তেমন রঙ তৈরি করা যায় না! সাম্প্রতিককালের থ্রি-ডি ছায়াছবির সাথে এর কোন যোগসূত্র আছে কি? 'আলোকপাত' এ বিষয়ে আলোকপাত করলে বাধিত হব।

পথিক মণ্ডল
নিউ ব্যারাকপুর
২৪ পরগণা

প্রসঙ্গ : বাবরি মসজিদ

'আলোকপাত' এপ্রিল '৮৬ সংখ্যায় 'দাঙ্গা:রাম জন্মভূমি, না বাবরি মসজিদ' শীর্ষক প্রতিবেদনটি নিরপেক্ষ বলতে পারি না। প্রতিবেদক অজয়বাবুরা না জানলেও আমরা জানি, বাদশাহ বাবরের মন্ত্রী মীর মহম্মদ ১৫২৮ খৃঃ পতিত জায়গায় মসজিদটি তৈরি করেন। পূর্বে কোন মন্দির বা কোন কিছুর চিহ্নই ছিল না, তা সত্বেও ১৮৮৫ খৃঃ মহন্ত রগুনা ব্রহ্ম দাশ বাবরি মসজিদের সামনে একটি চতুঃষ্কোণ স্থানের জন্য আদালতে মন্দির তৈরির আবেদন পেশ করেন। আপিলে ঐ জায়গাটিকে রাম জন্মভূমি হিসেবে দেখানো হয়েছিল। দাবী নামঞ্জুর হয়, আদালতে কেবল মাত্র নথিভূক্তই থাকে। ১৫২৮ খৃঃ থেকে ১৮৮৫ খৃঃ পর্যন্ত, দীর্ঘ ৩৭৫ বৎসর পর জায়গাটি হঠাৎ রাম জন্মভূমি হয়ে ওঠে, পরে উত্তর প্রদেশ সরকারের ওয়াকফ বোর্ডের নামে ঐ সম্পত্তি ১৯৩৬ সালে নথিভূক্ত হয়। ১৯৪৯ সালে ২২ ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে মহন্ত অভয় রাম দাশ (হুমানগড়) সহযোগীদের নিয়ে মসজিদের প্রাচীর টপকে তার মধ্যে কয়েকটি মূর্তি রেখে দেন, সেই থেকে রাম জন্মভূমির বিকাশ। ১৯৮৬ সালে ১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৫:১৯ মিঃ বাবরি মসজিদের দরজার তালা খুলে দিয়ে ভারতীয় আইনের খোলা চোখে এ কোন কালিমা লেপন করা হল?

সামাদ মোল্লা
ভরতপুর, মগরা, হুগলী

টালা-পলতার বিষ

কলকাতায় প্রতি ১০ জন মানুষের ৮ জনেরই বিভিন্ন ধরনের পেটের রোগ। খোদ সরকারের বিভাগীয় ডাইরেক্টরের একমাত্র ছেলে মারা গেলেন জণ্ডিসে আক্রান্ত হয়ে। টালা পলতা থেকে কোনও রকম পরীক্ষা ছাড়াই কোলকাতার জন্য পানীয় জল পাঠান হচ্ছে। অপরীক্ষিত জলে থেকে যাচ্ছে সিসা, আর্সেনিক, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, ফ্লোরাইড ও নাইট্রেট প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বিষাক্ত পদার্থ। টালা পলতার ল্যাবরেটরিতে জলের অ্যালার্ম টেস্টিং-এর ইনকিউবেটর দীর্ঘদিন অচল। ক্লোরিন বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

কলকাতা আজ জলবাহিত মহামারীর কবলে। জড়ভরত সরকার ও বিরোধী দল, রাজনৈতিক উত্তেজনার আগুন পোহানো জনসাধারণ সম্পূর্ণ নির্বিকার। অথচ এই হল 'রিয়েল লাইফ', যা অবিলম্বে 'আলোকপাত' এর সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ তদন্তের অপেক্ষা রাখে বলে মনে করি।

অশোক কুমার ভট্টাচার্য
কালীঘাট, কলকাতা–২৬

সবিনয় নিবেদন

জীবনের রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে যে 'রিয়েল লাইফ' আপনাকে ভাবায়, 'আলোকপাত'-এর পাতায় তা তুলে ধরুন সত্যনিষ্ঠভাবে।। কাহিনী আকারে পাঠান অনধিক একশ শব্দের সার্থক জীবন রচনা। যাবতীয় চিঠিপত্র কলকাতা সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠিয়ে দিন।

প্রধান সম্পাদক

'পাথরের নারী'

প্রায় বিস্মৃত এক দামাল জীবনের কাহিনী তুলে এনেছে আলোকপাত এপ্রিল '৮৬ সংখ্যায়, স্মরণ বিভাগে 'পাথরের পুরুষ' শিরোনামে। এই পুরুষ সিংহের কিছু উদ্দীপনাময় কাহিনী পড়তে পড়তে মনে পড়ে গেল এক পাথরের নারীর কথা। স্বাধীনতার আগে এই নারীও এক অলৌকিক জীবনীশক্তিতে টগবগ করেছেন। অত্যাচারিতা হয়েছেন; ব্রিটিশ শাসকের পুলিশ বাহিনী কারাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে তাঁর ওপর। তবু তিনি ভেঙে পড়েন নি। পিছিয়ে আসেন নি। সাধারণ মানুষ অবাক বিস্ময়ে মন্তব্য করেছে, এও কি সম্ভব! মনে পড়ে যাচ্ছে গোলাম কুদ্দুসের তাঁকে নিয়ে লেখা কবিতার দুটি লাইন "ইলা মিত্র পাথরের মেয়ে; ইলা মিত্র স্টালিন নন্দিনী।" ...এই পাথরের মেয়েকে 'আলোকপাত' স্মরণ করবে না?

শম্ভূনাথ মুখোপাধ্যায়
সাধুরহাট, ২৪ পরগণা

স্বামী সৎকারে সপ্ত পত্নী

কানে থাকত সব সময় সদ্য ফোটা ধুতুরা ফুল, মাথায় জটা, সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখা, গলায় সাপ, হাতে ত্রিশূল, পরিধানে বাঘের চামড়া এ-রকম একজন সাধুকে হাবড়ায় চিনত না এমন একজনও নেই। সেই সাধু আশ্চর্যজনকভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। গত শ্যামাপূজার সময় হাবড়ারই এক মণ্ডপে ঐ সাধু যখন ধ্যানস্থ অবস্থায় অবতীর্ণ তখন তাঁরই গলার দীর্ঘদিনের পোষা ঝুলন্ত সাপটি তাঁকে দংশন করে। মৃত্যুর পর তাঁর সাতজন স্ত্রী আসেন তাঁকে সৎকার করার জন্য। এই ঘটনাটি নিয়ে 'আলোকপাত' কি একটু ভাববে?

রতন চক্রবর্তী
উত্তর হাবড়া, ২৪ পরগণা

যে অর্পিতা

আমাদের নিত্যকার জীবনপ্রবাহ বয়ে চলে একটি নির্দিষ্ট খাতে, অকস্মাৎ কোনো দুর্ঘটনার পাথর এসে পড়ায় থেমে যায় জীবনধারা, স্রোতের শেষ বিন্দুটি রক্তের সঙ্গে মিশে শেষবারের মতো গড়িয়ে চলে সংবাদপত্রের পাতায়। এইখানেই ইতি। ধরা যাক কয়েকদিন আগেকার একটা ঘটনার কথা। কে অর্পিতা? চিনত না কেউ। কিন্তু এই অর্পিতাই খবর হয়ে উঠল যেদিন তাকে চলমান ট্রেনের ইঞ্জিনের সঙ্গে ঝুলতে দেখা গেল। সংবাদপত্রে তোলপাড়। কিন্তু তারপর? রহস্যের যবনিকাপাত, কেউ জানল না আসল ঘটনা। চারপাশের হট্টগোলের মধ্যে কখন তা চুপিসারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃত রহস্যের উপর কি আলোকপাত করা যায় না?

কাজরী বসু
'পূর্বাচল', সল্ট লেক, কলকাতা–৯১

'আচ্ছা, আমরা যদি সবাই সত্যি কথা বলতে পারতাম।' কথাটি বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ সমরেশ বসুর 'বিবর' উপন্যাসের প্রথম পাতার একমাত্র লাইন হিসাবে উচ্চারিত। আসলে শ্লীল-অশ্লীলতার বিতর্ক সংবাদ ও সাহিত্যে অনেক-দিনের, কিন্তু সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যবোধ কখনও অশ্লীল হতে পারে না, যেমন অসুন্দর হতে পারে না জীবন ও সত্য।'আলোকপাত' সত্যকে ধর্ম করে জীবনের অন্বেষণে হেঁটে চলেছে। সেই সন্ধান যা পায়, প্রকাশ করে তাকেই। এই প্রকাশ-শৈলী কখনও কলঙ্কিত হতে পারে না, হওয়াতে পারি না।

অথচ 'আলোকপাতের' সাফল্যে ঈর্ষাতুর কিছু ব্যবসায়িক মানুষ শিল্প ও সংস্কৃতির সোল এজেন্সি নেওয়ার কায়দায় 'গেল' 'গেল' রব তুলেছেন। তারই বিনীত প্রত্যুত্তর ওই ওপরের স্তবকটি। আসলে 'আলোকপাত' একটি অচলায়তন ভাঙতে পেরেছে। নিজ হাতে গড়া গুটিকয় তরুণ, কয়েকজন প্রবীণ সাহিত্যিকের সহযোগিতায় অন্যদের অতিক্রম করে অসীম বেগে ছুটে চলেছে সাফল্যের রাজপথে। এতেই ঈর্ষা, এতেই অপপ্রচার। কিন্তু সম্মানিত পাঠক তাতে বিভ্রান্ত নন, 'আলোক-পাতের' চতুর্থ প্রকাশের তুমুল সম্বর্ধনাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আবার সম্মানিত লেখকরাও 'আলোকপাত'-এ লেখার জন্য উৎসাহিত হচ্ছেন। সম্প্রতি 'পরি-বর্তন'-এর সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখতে চেয়ে চিঠি লিখেছেন। লেখকদের এই এগিয়ে আসাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

আমরা 'রিয়েল লাইফ হিউম্যান ইন্টারেস্ট' থিমে বিশ্বাস করি। নরকের গুহা থেকে স্বর্গের সিঁড়ি পর্যন্ত যেখানেই জীবন, সেখানেই আমরা। প্রথম প্রতিবেদনে আমি বলেছিলাম, আমরা মানুষ খুঁজতে বেরিয়েছি। বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলীর সেই চরণটি আমাদের মন্ত্র: 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। অমৃতস্য পুত্রাঃ মানুষ কখনও অশ্লীল হতে পারে না, যেমন হতে পারে না তার জীবনায়ন। তবু অপপ্রচারের কুলিশকে গ্রাহ্য না করেও সংহিতার শ্লোকে মনোনিবেশ করি 'সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি, দোষম ইচ্ছন্তি পামরাঃ।'

এবার বোধ করি আমাদের রাজনৈতিক প্রতি-বেদন সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। আমরা রাজ-নীতিগত কারুকার্যে বিশ্বাস করি না। রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়া যে জীবন সমাজের কাছে দায়বদ্ধ, আমরা সেই জীবন পরিক্রমা করি। সেদিক থেকে রাজনৈতিক জীবনটা হয়ে ওঠে সামাজিক সম্পত্তি। 'সকল সংবাদ মাধ্যম কোন না কোন রাজনৈতিক তত্ত্বের তল্পিবাহক হবে'— এমন ভ্রান্ত ধারণাকে আমরা কুসংস্কার বলতে চাই। আমরা এর বিরোধী। চোখে রঙিন চশমা এঁটে জীবনকে দেখলে তা রঙিন দেখাতে বাধ্য, সাদা চশমায় সাদা দেখায়। আমরা জীবনকে জলের মত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। তাই তার কারুকার্য আমরা প্রতিফলিত করি।

'কণ্টকল্পিত' এবং বিধান শিশু উদ্যানের স্রষ্টা কলকাতার দাদু এবং ভাবতীয় রাজনীতির দাদা অতুল্য ঘোষ আর নেই। 'আলোকপাতের' প্রথম আত্মপ্রকাশকে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন: কথা দিয়েছিলেন 'আলোকপাত'-এ লিখ-বেন বলে। তাঁর মহাপ্রয়াণে আমরা হারালাম আমাদের শুভাকাঙ্খীকে, কলকাতার শিশুরা হা-রাল স্নেহময় দাদুকে, ভারত হারাল একজন প্রাজ্ঞ পুরুষকে। এতে আমরা মর্মাহত।

চলতি সংখ্যায় প্রচ্ছদ প্রতিবেদন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পরিবারে ঘনিয়ে ওঠা এক বিতর্ক যা পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনের উপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। চিত্রতারকা আলপনা গোস্বামীর সঙ্গে জ্যোতি বসুর পুত্র চন্দন বসুর সম্পর্ক নিয়ে যে রটনা তার পিছনে প্রকৃত সত্য কতটুকু তাকেই উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছি আমরা, কারণ এরা প্রত্যেকেই বাংলার জনজীবনকে প্রভাবিত করেন। মুখ্য-মন্ত্রী জ্যোতি বসু, তৎপুত্র শিল্পপতি চন্দন বসু, চিত্রাভিনেত্রী আলপনা গোস্বামী এবং প্রশাসনিক রীতিনীতির প্রশ্ন এখানে জড়িত। তাই বৃহত্তর জনস্বার্থের কথা ভেবে আমার পক্ষে সংবার্দ-প্রবাহের দিকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে চুপচাপ তাকিয়ে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। তাই কলকাতা ব্যুরোর দুই প্রতিনিধি হাবিব আহসান ও বিকাশ চক্রবর্তীকে এই বিতর্কের পশ্চাদপট অনুসন্ধানে পাঠালাম। তাদেরই অন্তর্তদন্ত রিপোর্ট এ সম্পর্কে যাবতীয় গুজবের অবসান করুক, এই আমি চাই।

উত্তরবঙ্গের কামতাপুরী রাষ্ট্র ঘোষণার খবর ভারতের সার্বভৌমতার পক্ষে সত্যিই ভারি বিপ-জ্জনক। এর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক প্রতিকার—পন্থার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার। খবরটি প্রথমে কলকাতা ব্যুরো সংগ্রহ করে। সেই স্বঘোষিত কামতাপুরী রাষ্ট্রের নেপথ্যদর্শন নিয়েই এবারকার 'সরজমিন' প্রতিবেদন।

এবারের একান্ত প্রতিবেদনে আমরা একটি অতীব গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন। মহামান্য কল-কাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের অন্তবর্তী রায়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভক্তের হৃদয়মন্দির রামকৃষ্ণ মিশন সংখ্যালঘু বলে স্বীকৃত। সংখ্যালঘু হলে তারা হিন্দু হল কি করে? অথচ রামকৃষ্ণ অনু-রাগীরা সে কথা মানতেই চান না। রামকৃষ্ণ মিশন বনাম রহড়ার শিক্ষকদের সেই ঐতিহাসিক মামলার প্রেক্ষাপটে আলোকপাতের প্রতিবেদক বিশ্লেষণ করেছেন—রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দু না অহি-ন্দু—এই বিতর্কটি।

কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের প্রাক্তন ২ নং সদস্য প্রণব মুখার্জিকে সম্প্রতি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রিয় অর্থমন্ত্রীর উপর এপ্রিল মাসে নয়াদিল্লিতে ঘটে গেছে সর্বনিন্দিত হত্যা প্রচেষ্টা। সত্যিই কি প্রণব মুখার্জিকে রাজনৈতিক ভাবে শেষ করে ফেলার একটা চক্রান্ত চলছে? এর পিছনে কি উপর মহলের কোন চাল আছে? প্রণব মুখার্জির পতনের পশ্চাদপট নিয়ে যাবতীয় দুরূহ ও গুরুতর প্রশ্নের মোকা-বিলায় এবারের আলোকপাত।

এপ্রিল মাসে কর্মরত অবস্থায় পি.জি.হাস-পাতালের ডাক্তার সুব্রত চক্রবর্ত্তীকে গোয়েন্দা পু-লিশ নিয়ে গেল টালিগঞ্জের রিট্রিট হোমে। জুনি-য়ার ডাক্তার অ্যাসোশিয়েশন খেপে গেল। কেন এই পুলিশি হানা? সত্যি কি সুব্রত চক্রবর্তী নক-শালপন্থীদের খতমবাহিনী দ্বিতীয় কমিটির সম-র্থক? নাকি রাজ্য সরকারের সমালোচনাকারীদের নেতা বলেই তার উপর এই পুলিশি জুলুম। এবারের অন্তর্তদন্ত পর্যায়ে ওই অধ্যায়ের পুংখানুপুংখ অনু-সন্ধানী প্রতিবেদন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লেখার সময়েই শুরু হয়ে যাচ্ছে বাংলা নববর্ষ। 'আলোকপাতের' পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জন্য রইল নববর্ষের শ্রদ্ধা অভিবাদন।

আলোক মিত্র

আরিফ তাহলে দিল্লি দরবারের গলায় ঘন্টা বাঁধলেন?

আরিফের ৩ নং সুনহরী বাগের বাংলোতে তেমন লোকজন আসছে না আজকাল। ইস্তফা দেওয়ার পরে তাঁকে যত জন সাধুবাদ জানিয়েছিল তাদের সুর কেমন যেন কাটা কাটা লাগে এখন, আর ২৬ ফেব্রুয়ারি আরিফের চেহারায় যে আভা দেখা দিয়েছিল তাও কেমন নিস্প্রভ মনে হয়। তিনি যতই 'নর্মাল' হচ্ছেন ততই কিছু দৃশ্যমান আর কিছু অদৃশ্য ভয়ের কারণে তিনি ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যাচ্ছেন। গত কয়েকদিনে দিল্লি দরবারের ওপর যে কাল ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল তা এখন সরে গেছে। আরিফ দেখতে পাচ্ছেন, দিল্লি দরবারের লাল টকটকে রাগী দুই চোখ আর খাস পারিষদবর্গের বারটি হাত। সেই ১২ হাত যে একটু ইশারা পেলেই আরিফের গলায় এসে পড়বে না, তার কোন গ্যারান্টি নেই। অবশ্য এসব করাও খুব সহজ ব্যাপার নয়। আসলে আমরা বহু শতাব্দী ধরেই উল্টো দিক থেকে ভাবছি, কারণ ভাবনার মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া আমাদের তাই-ই শিখিয়েছে। আমরা ভাবতে শুরু করি ঠিক এইভাবে যে, কোন সমস্যাই সমস্যা নয়। বস্তুত যেটাকে আমরা জেতা মনে করি, সেটা প্রকৃতপক্ষে হারা। আর এর পরেই 'বদলা' নেওয়ার ভাবনা উদয় হয়। ক্রোধ আর ঈর্ষা আমাদের মনের ভেতর নিজেদের কাজ শুরু করে দেয়।

লম্বা চওড়া ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার রাজনীতি এখনও পর্যন্ত এই দেশে শুরু হয়নি। আরিফ বিদ্রোহের রাজনীতিতে ফাঁসতে চান নি, তাই তাঁর অবস্থা এখন 'না ঘরকা, না ঘাটকা'। যখন তিনি ইস্তফা দিলেন তখন কিছু লোক তাঁর সেন্টিমেন্টে হাওয়া দিয়ে তাকে 'আঁধি' বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আরিফের ভয় ছিল যে, যদি তিনিই আঁধি বা ঝড় তোলেন তবে ১৯৭৮ সালে কংগ্রেসে যোগ দেবার পর তিনি যে শক্ত খুঁটিতে তাঁবু বেঁধেছিলেন তা উড়ে যাবে। ইস্তফা দেবার আগে আরিফ তাঁর সার্বজনীন ইমেজ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন আর এখন তাঁর মজবুত তাঁবু উড়ে যাওয়ার আশংকায় ভীত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আরিফের মুখে এখন শুধু একটিই কথা, 'আমি আর রাজীব গান্ধী শাহবানু কেসের ব্যাপারে একই মত পোষণ করি; কিছু লোক ওঁকে আমার সম্পর্কে ভুল বোঝাচ্ছে।'

মুসলিম লীগের জি.এম. বনাতবালা যখন শাহবানু কেসের সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বিপক্ষে নিজেদের মতামত পেশ করেছিলেন, সেই সময়ে একদিন ২৩ আগস্ট আরিফও তাঁর বক্তব্য রাখেন আর এর থেকেই লোকেরা বোঝে যে আরিফও হোমরা চোমরা কেউ। কোরান ও শরীয়তের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে জোর গলায় তিনি ঘোষণা করেন যে, শরীয়তের মতের সঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের কোন বিরোধ নেই। এই ভাষণের ফলে গোটা দেশের নবীন মুসলমানদের মধ্যে উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে। আরিফের বক্তব্যের জবাব দেন জিয়াউর রহমান আনসারী। তিনি সংসদে সুপ্রীম কোর্টের রায় নিয়ে আলোচনাও করেন। আনসারীর বক্তব্য হল, সুপ্রীম কোর্টের রায় শরীয়তের বিপক্ষে গেছে। এই সময়েই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যে, দিল্লি দরবারের ইচ্ছাতেই আরিফ এই সব বলেছেন। এর পর থেকেই দেশ বিদেশের পত্র পত্রিকায় তাঁর কথা ছাপা হতে লাগল, টিভি-র নিউজ লাইন প্রোগ্রামে তাঁর যথেষ্ট প্রশংসাও হল। দিল্লি দরবারেও আরিফ যথেষ্ট সম্মান পেলেন। ঠিক এ সময়েই আনসারী মোমিন কনফারেন্সের আয়োজন করলেন। তিনি সেখানে রাজীব গান্ধীকে ডাকলেন। প্রথমে রাজীব ব্যাপারটাকে আমল দেননি কিন্তু তাঁকে জানান হল যে দেশের সমগ্র মুসলমানদের মধ্যে ৭০ শতাংশই মোমিন সম্প্রদায়ের, কাজেই কনফারেন্সে না গেলে অধিকাংশ মুসলমানের ভোট থেকে বঞ্চিত হবে কংগ্রেস। আরিফ কিন্তু চাননি প্রধানমন্ত্রী ওই সম্মেলনে যোগ দিন। সুরক্ষার কারণে বিজ্ঞানভবনে এই সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে যখন আনসারী সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ব্যাপারে আলোচনা করেন, তখন প্রচুর হাততালি পড়ল। এরপর থেকেই রাজীব গান্ধীর কণ্ঠস্বর বদলে গেল, দিল্লি দরবারে আরিফের মর্যাদাও কমতে লাগল। এদিকে রাজ্যসভায় উপসভাপতি নাজমা হেপতুল্লাকে দিল্লি দরবারে ডেকে নেওয়া হল। ফলে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মুখর হল জনতা পার্টির সাহাবুদ্দিন। তিনি আরিফের সমালোচনা শুরু করলেন। পাশাপাশি মুসলমানদের কাছে কংগ্রেসের নিন্দেও শুরু করলেন।

নাজমাকে বলা হল মুসলিম নেতাদের সঙ্গে

কথা বলে সে সব দিল্লি দরবারকে জানাতে। এসব চার পাঁচ মাস আগে শুরু হয়েছিল। এরপর নাজমা লক্ষ্ণৌ গিয়ে আলি মিয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তারপর তিনি দেবওয়ান্দ যান। সমস্ত সম্প্রদায়ের নেতাদের একসঙ্গে জড়ো করে দিল্লিতে নিয়ে আসেন। এঁরা সবাই একই সঙ্গে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। সুপ্রীম কোর্ট, শরীয়তের বিপক্ষে রায় দিয়েছে। আরিফ তখন একলা। একবার তিনি ভেবে ছিলেন তাঁর সপক্ষে রায় দেবে এমন কিছু লোককে দিল্লি দরবারে নিয়ে যাবেন কিন্তু মাখনলাল ফোতেদার তাঁকে এই কাজ করতে বারণ করেন। দিন দিন বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর হন আরিফ। তাঁকে মন্ত্রনালয়ের কাজে জুড়ে দেওয়া হল, কিন্তু তাতেও তাঁর মন নেই। শেষে তিনি ভাবলেন কোন রকমে নাজমার সক্রিয়তা কমিয়ে দিতে পারলে তবেই তিনি রেহাই পাবেন। সেজন্যে কিছু সংসদীয় ও কিছু বিরোধী সদস্যকে তিনি বেশি মাত্রায় সক্রিয় করে তুললেন। এরা একদিন অভিযোগ করল যে, রাজ্যসভার উপসভাপতি হয়ে দিল্লি দরবারের কাজে তিনি বড় বেশি অংশ নিচ্ছেন। সেই সময়ে ঠিক হল যে নাজমাকে পার্টির কাজে লাগান হবে। ফোতেদারই এই পরামর্শ দিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন পি. শিবশংকর।

অরুণ নেহেরুর অনুমতি নিয়ে বীর বাহাদুর সিং অযোধ্যার রাম জন্মভূমি খুলে দেন। এটা হিন্দুদের খুশি করার জন্য করা হয়েছিল। কারণ এরপর বাবরি মসজিদ নিয়ে মুসলমানরা অসন্তুষ্ট হবে। এছাড়াও শাহবানুর কেসে তাদের রাগ আছেই কাজেই প্রলেপ হিসাবে 'নতুন মহিলা সংরক্ষণ বিল' আনা হবে। ফলে হিন্দু ও মুসলমান দুটো সম্প্রদায়কেই খুশি করা হবে। কিন্তু আরিফ এই দুই সম্প্রদায় বহির্ভূত শুধুমাত্র একজন ভারতীয়। ভারতীয় হওয়ার জ্বালা আরিফের চেয়ে বেশি ভাল আর কে বুঝবে?

ইস্তফা দেওয়া ছাড়া আরিফের আর কোন রাস্তাই ছিল না। কারণ দিল্লি দরবারে থাকলে আরিফের অবস্থা হত খাঁচায় আটকান প্রাণীর মত। ঠিক তিনমাস আগে আরিফ নিজের বন্ধুদের বলেছিলেন, 'কিছু লোক এই দেশকে চতুর্দশ শতাব্দীতে নিয়ে যেতে চায়। রাজীব গান্ধী যদি ওনার আশপাশের লোকজনদের কথায় চলেন তবে দেশ চতুর্দশ শতাব্দীতে যাবে। মুসলমানদের সমূহ সর্বনাশ তাতে।' আরিফের কথাবার্তা শুনে মনে হয় যে তিনি যথেষ্ট হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

এই সবের মধ্যেই মুসলমান নেতাদের সঙ্গে বসে দিল্লি দরবার এক নতুন বিলের ব্যাপারে আলোচনা করছিল। পরে বনাতবালা, সুলেমান শেঠ, সাহাবুদ্দিন প্রভৃতি লোকেরাও এতে অংশ নেয়। আরিফের চিন্তাও বাড়ল ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে; দিল্লি দরবার বিরোধী দলগুলির সঙ্গে কথা বলে ঠিক রাত তিনটের সময়। তাদের বলা হল যে ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জরুরি কাজকর্মের জন্য তারা যেন দেখা করে। স্বভাবতই বিরোধী দলের নেতারা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন এ ধরনের নিমন্ত্রণে। সকাল বেলায় সংসদ ভবনে পৌঁছবার পর তাদের বলা হয় যে, সেদিনই 'মুসলিম মহিলা বিল' পেশ করা হবে। এই বৈঠকে যথেষ্ট কথা কাটাকাটি হয় ও রাজীব গান্ধী বেশ অসন্তুষ্ট হন।

২১ ফেব্রুয়ারি আরিফ লোকসভায় একেবারে পিছনের সিটে বসেছিলেন। সেদিনই সরকারের বিল পেশ করার কথা। এই সময় অরুণ নেহেরু এলেন ও বসলেন আরিফের পাশেই। আরিফ নিজের দুঃখের কথা অরুণকে বলে ফেললেন। ইস্তফা দেবার কথাও বললেন। অরুণ নেহেরু সচকিত হলেন। কিছুক্ষণ পরে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। এরপর সোজা রাজীব গান্ধীর কাছে গিয়ে বললেন, 'আরিফ ইস্তফা দেবার কথা বলছেন।' রাজীব আরিফের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু অরুণ তাতে রাজি হলেন না।

এদিকে বিরোধী দলগুলির আপত্তির কারণে শেষ পর্যন্ত বিল পাশ করা সম্ভব হল না। এরপর আরিফকে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা বলা হল। দীর্ঘ আধ ঘন্টা ধরে রাজীব তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, কেন তিনি এই বিলের বিরোধিতা করছেন না। ব্যক্তিগতভাবে রাজীব নিজে যে এতে সন্তুষ্ট নন, তাও জানালেন। অনেক সময়েই মানুষকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। আরিফের মনে হল প্রধানমন্ত্রী হয়ত বিলটি পেশ করার ব্যাপারে বিরোধিতা করবেন, কিন্তু সেরকম কিছু হল না।

আইনমন্ত্রী অশোক সেন যখন বিল পেশ করলেন, তখন আরিফ সেখানে বসে। ঠিক দুটো বেজে পঁচিশ মিনিটে বিল পেশ করা হল। দুঘন্টা ধরে বাদ প্রতিবাদ চলল। বিকেল সাড়ে চারটের সময় বিলটি স্বীকার করে নেওয়া হয়। ঠিক সে সময় বলরাম জাখর বিলটি স্বীকার করার ঘোষণা করলেন, সেই সময়ে আরিফের চোখ ছলছল করে উঠল, তিনি পকেট থেকে পেন বার করে তাঁর ফাইলে কি সব লিখতে লাগলেন। তারপর তিনি লোকসভা থেকে বেরিয়ে এলেন। সেখান থেকে সোজা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে একটি বন্ধ খাম দিলেন প্রধানমন্ত্রীর এক পরিষদকে। তারপর বললেন, 'মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকের আগেই এটা প্রধানমন্ত্রীকে পৌঁছে দিন। ব্যাপারটা জরুরি।' পরে ওখান থেকে বেরিয়ে তিনি তাঁর গাড়িতে বসলেন ও শ্রমশক্তি ভবনে গেলেন। নিঃশব্দে তিনি তাঁর কাগজপত্র গোছাতে লাগলেন। সেই সন্ধ্যায় আরিফ নিজের স্টাফদের ডেকে দেখা করলেন তাদের সঙ্গে। সকলের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। এরপর তিনি তাঁর নিজের বাড়ি ৩নং সুনহরী বাগে ফিরে গিয়ে স্ত্রী রেশমাকে সব কিছু বললেন। রেশমা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। আরিফের মনে হতে লাগল, এতক্ষণে তাঁর ইস্তফা নিশ্চয়ই রাজীব গান্ধীর কাছে পৌঁছে গেছে। তিনি নিশ্চয়ই আরিফকে ডেকে পাঠাবেন। কিন্তু দিন চলে যেতে লাগল, না এল কোন ডাক, না এল ফোন। আরিফ আরো উদাস হয়ে গেলেন। পরে একদিন আরিফ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কোথাও গিয়েছিলেন, ফিরে আসার পর তাকে জানানো হয় যে দিল্লি দরবার থেকে একটা ফোন এসেছিল, তিনি কোথায় গিয়েছেন জানার জন্য। তবে তাঁকে ফোন করতে বা দিল্লি দরবারে যেতেও বলা হয়নি। আরিফের মনে হল দিল্লি দরবারের আর প্রয়োজন নেই তাঁকে। নানা রকম চিন্তায় রাত ভোর হল। সকাল দশটা বাজল, কিন্তু দিল্লি দরবারের ফোন এল না। নিজেকে খুব অসহায় লাগছিল তাঁর। সরকারি ড্রাইভারকে ডেকে তিনি বললেন, 'গাড়ি নিয়ে যাও, এখন আর এর প্রয়োজন নেই আমার কাছে। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে শ্রমশক্তি ভবনে ফিরে যেতেই সকলে নানারকম কানাকানি শুরু করে দিল। প্রধান সচিবকেও সব কথা জানানো হল। সচিব বসন্ত সাঠেকে ফোন করলেন। তারপর সাঠে সোজা সেই খবর পৌঁছে দিলেন রাজীব গান্ধীকে। এবং জানালেন, আরিফের ইস্তফা না নেওয়াই উচিত। কিন্তু তাঁর এ কথার কোন জবাব দিলেন না প্রধানমন্ত্রী।

এরপর আরিফ সংসদে এলেন। লোকসভায় ঢোকার আগেই অরুণ সিং তাকে লবিতে ডাকলেন। প্রায় এক ঘন্টা ধরে তাঁকে বোঝানো হল। কিছু পরে অরুণ নেহেরুও এলেন। তিনিও আরিফকে যথেষ্ট বোঝালেন। যারা আসা যাওয়া করছিল কাছ দিয়ে তারা বুঝতে পারল ব্যাপারটা যথেষ্ট গুরুতর। সারা সংসদে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে আরিফ ইস্তফা দিয়েছেন। তারপর সারাদিন আরিফকে সাধুবাদ দেওয়ার পালা চলল। সংসদের অন্যান্যদেরও আরিফ বোঝালেন, কি ধরনের পরিস্থিতিতে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় রাজীব গান্ধীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, আধঘন্টা কথাও হয়। আর সেদিনই আরিফের ইস্তফা গ্রহণ করা হয়।

এই ঘটনার পর কংগ্রেসে যেন তুফান এল। কিন্তু তা নিতান্তই চায়ের কাপে। দু'দিন পর যখন সংসদীয় দলের বৈঠক হল রাজীব গান্ধী তখন এ ব্যাপারে যথেষ্ট কঠোর মনোভাব দেখালেন।

উত্তরপ্রদেশের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করেছিলেন তাঁর তরফের বক্তব্য পেশ করার। কিন্তু তাঁকে তা করতে দেওয়া হল না। এই বিলের মধ্যে যথেষ্ট আপাত বিরোধী ব্যাপার আছে। কিন্তু সমস্যা হল—দিল্লি দরবারের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? আরিফ একদিক থেকে ঘন্টা বেঁধে দিলেন। কিন্তু দিল্লি দরবারের বেড়ালের গলায় সে ঘন্টা বেজেও বাজছে না। যদি কোনরকমে বেড়ালটাকে দৌড় করানো যায় তবেই ঘন্টা বাজবে। আপাতত: সংসদে এমন ক্ষমতা কারো নেই যে এই কাজ করতে পারবে। আরিফের সমস্যা ছিল তাঁবু উড়ে যাবার, আর অন্যান্যদের আশা হল শক্ত খুঁটিতে নিজেদের বাঁধা তাঁবু যাতে উড়ে না যায়। 'বিপদ' আর 'আকাঙ্ক্ষা' এই দুই-এর মধ্যবর্তী হয়ে 'মুসলিম মহিলা বিল' ফেঁসে গেছে আর খুব তাড়াতাড়ি এই বিল পাস হয়ে যাবে।

দরবারী লাল

প্রণব পতনের পশ্চাদপট

প্রণব মুখার্জি ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিলেন অনেকদিন। কেন্দ্রিয় মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় অবস্থান থেকে তারপর তার ক্রমাবনমন আর এই সাম্প্রতিক বহিষ্কার, ঘটনাগুলি কি একান্তই আকস্মিক? কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের পশ্চাদভূমিতে সক্রিয় চরিত্রগুলি কারা? কিভাবে তারা পরিবর্তিত হয়ে যায়? গত কয়েক মাস ধরে প্রণব মুখার্জি ও তাঁর পরিবারের ওপর সংঘটিত আক্রমণগুলির সঙ্গে কি এই বহিষ্কারের কোনও সম্পর্ক আছে? স্বরাজ পাল বা ধীরুভাই আমবানীর নাম প্রণব প্রসঙ্গে বারবার ওঠে কেন? 'আলোকপাত'—এর ব্যুরোগুলির সহযোগিতায় প্রণব পতনের পশ্চাদপট নিয়ে দীপ বসুর সন্ধানী আলোকপাত।

মে মাসের তিন তারিখে দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে প্রণব মুখার্জি প্রায় বীরের সম্বর্ধনা পেলেন। হাওড়া স্টেশন চত্বরের সেই জনসভায় প্রণববাবু সরব হলেন, "কংগ্রেস আজ একদল ক্ষমতার দালালের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। এদের হাত থেকে কংগ্রেসকে বাঁচাতেই হবে। বাঁচাবেন সাধারণ মানুষেরাই। কংগ্রেস অর্থে শুধু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবর্গ বা সংসদ সদস্যরাই নন, কংগ্রেস অর্থে গ্রামগঞ্জের আপামর জনতা।" ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় কংগ্রেস থেকে তার বহিষ্কারের সংবাদটি শুনে প্রণববাবু 'মর্মাহত' হলেও, পরিকল্পনা রূপায়ণ দপ্তরের মন্ত্রী এ.বি.এ.গনি খান চৌধুরি খবরটি পেয়েই বলেছিলেন, "তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে দলের এবং প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আসলে মন্ত্রীসভাতে স্থান হয় নি, এটাই ছিল প্রণববাবুর বিক্ষোভের মূল কারণ।" পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ গুহ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "গত দশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেসে গণ্ডগোলের মূল কারণ ছিলেন প্রণববাবু। এবার দলে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।"

যে প্রণববাবু পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনদিনই কোনও নির্বাচনে জেতেন নি, রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন গুজরাট থেকে, তিনি হঠাৎ বাংলার গ্রামেগঞ্জের আপামর জনতাকে নিয়ে রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে পড়লেন, ঘটনাটির মধ্যে অভিনবত্ব থাকলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। কিছুদিন আগে থেকেই প্রণববাবু, যিনি এককালে দিল্লির উঁচু মহলের রাজনৈতিক বৃত্তভূমিতেই শুধু ঘোরাফেরা করতেন হঠাৎ পশ্চিমবাংলার গ্রামে-গঞ্জে 'শতবর্ষের আলোয় কংগ্রেস' এই শ্লোগান নিয়ে ঘোরাঘুরি শুরু করেছিলেন। বোম্বের কংগ্রেস শতবার্ষিকী সভায় সভাপতি রাজীব গান্ধীর কংগ্রেসে দুর্নীতি বিষয়ে উল্লেখের ঘটনাতেই সম্ভবতঃ অনুপ্রাণীত হয়ে প্রণববাবু একরকম স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই কংগ্রেসের শতবর্ষের ভাবমূর্তি নিষ্কলঙ্ক করার ব্যাপারে সাতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অথচ ১৯৬৯—এ দল বিভাজনের পর প্রণববাবুর বাংলা কংগ্রেসে যাওয়া, জরুরী অবস্থার দিনগুলি, শ্রীমতী গান্ধীর শাসনকালে কংগ্রেসের সাংগঠনিক ও সৈদ্ধান্তিক ক্ষেত্রে অজস্র অসঙ্গতি কখনই প্রণববাবুকে কংগ্রেসের শতবর্ষের ঐতিহ্যটিকে স্মরণ করায় নি। ১৯৮৪—র ৩১ অক্টোবরের পর থেকেই ক্রমান্বয়ে প্রণববাবুর মধ্যে এই উদ্ধারক চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে।

বিভিন্ন সময়ে দেওয়া বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে প্রণব মুখার্জি একটি কথাকেই বারবার বলেছেন, তা হ'ল: কংগ্রেস আর শ্রীমতী গান্ধীকে তিনি সমার্থক বলেই মনে করতেন। কংগ্রেস—এর নীতি বা কার্যপ্রণালীর ব্যাপারে তার কোনও মাথাব্যাথা ছিল না, প্রকৃতপক্ষে তার রাজনৈতিক জীবনের মূলমন্ত্র, 'শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি নির্বিকল্প আনুগত্য।"

খুব স্বাভাবিক কারণেই তাই প্রণববাবুর বোঝা উচিত ছিল রাজনীতিতে শুধু আনুগত্যকে মূলধন করে খুব বেশিদিন টিঁকে থাকা যায় না। দেশের রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হ'লে যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় তা হ'ল পায়ের তলার মাটি। বলাবাহুল্য প্রণববাবুর সেটি কোন সময়েই ছিল না। সে কারণে সহজেই তিনি বহিষ্কৃত হয়ে গেলেন, আনুগত্যের মূলধন থেকে আর সুদ তোলা সম্ভব ছিল না বলেই।

কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীতে প্রণববাবুর সম্ভবতঃ কখনই মুখ্যভূমিকা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তার গুরুত্ব ছিল শুধুমাত্র প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী পরে অর্থমন্ত্রী এবং ইন্দিরা গান্ধীর কাছের লোক, এই হিসেবেই। বিহারের জগন্নাথ মিশ্র, কর্ণাটকের গুণ্ডু রাও, গুজরাটের মাধব সিং সোলাংকি বা মধ্যপ্রদেশের বিদ্যাচরণ শুক্লাও সেই অর্থে 'বাগী'। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল প্রণববাবু যেখানে পশ্চিমবঙ্গে তার সমর্থনে কোনও উল্লেখযোগ্য সাড়াই পাননি সেখানে অন্যান্য রাজ্যের বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী নেতারা তাদের পেছনে যথেষ্ঠ সমর্থন আদায় করতে পেরেছেন। অথচ কংগ্রেস হাইকমাণ্ড প্রণবকেই নাকি সবচেয়ে বিপজ্জনক বিবেচনা করে বহিষ্কার করে দিলেন কংগ্রেস থেকে। সঙ্গে যেন লোক দেখানোর জন্যেই সাসপেণ্ড করা হ'ল অনন্তপ্রসাদ শর্মা ও প্রকাশ মেহরোত্রার মত যথাক্রমে বহুদিন সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে থাকা আর প্রায় অরাজনৈতিক দুই বৃদ্ধকে। শ্রীপত মিশ্রের সাসপেণ্ড হওয়ার পেছনে অবশ্য আছে অরুণ নেহেরুর আর ভারতের কেন্দ্রিয় রাজনীতিতে প্রভাবশালী উত্তরপ্রদেশের আন্তর্প্রাদেশিক রাজনীতি। আসলে প্রণব তো এমনিতেই ফুরিয়ে যাচ্ছিলেন। ইন্দিরার মৃত্যুর পর তাকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আর কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ড থেকে, প্রণবের রাজ্যসভার সদস্যপদের মেয়াদ ফুরোতেও আর বেশি দেরি ছিল না।
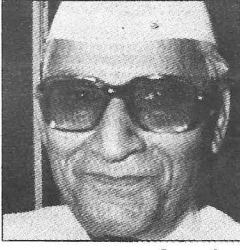
প্রণব মুখার্জি,

এ.পি. শর্মা

প্রণবের ২২ এপ্রিলের চিঠিটি পেয়ে অরুণ নেহেরু ও মাখনলাল ফোতেদার প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী ও গনি খান চৌধুরীর কাছ থেকে জেনেও নেন যে প্রণবের তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে নেই। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃত্বকে সচকিত করে দেওয়া হ'ল, 'গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।' রাজনীতি ক্ষেত্রে হতপ্রভ প্রণববাবুকে বহিষ্কার করে রাজীব গান্ধী বোধহয় শুধু এই কথাটাই বোঝাতে চাইলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসীদের, কংগ্রেসের ওপরতলার নেতৃত্ব বদল হয়েছে, এটা বুঝে উঠতে তারা এত দেরি করছে কেন?

১৯৭২ সালে প্রণব মুখার্জি কংগ্রেসে (অর্থাৎ তৎকালীন 'নব কংগ্রেস') যোগ দেন। বাংলাদেশ যুদ্ধে জয়লাভের পর শ্রীমতী গান্ধীর রাজনৈতিক ভাবমূর্তি তখন সবচেয়ে উজ্জ্বল। কংগ্রেসে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটতে শুরু করেছে শ্রীমতী গান্ধীকে কেন্দ্র করে। খোদ কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া সময়ানুগ শ্লোগানের উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন, 'ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা।' ৬৯ সালের দল বিভাজনে সনাতন কংগ্রেসীদের একটা প্রধান অংশই বেরিয়ে গেছেন। কংগ্রেসের পরিচালন ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটতে শুরু করেছে এর পর থেকেই। ৭২ ও তার পরবর্তী দিনগুলোতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত হয়েছে শ্রীমতী গান্ধীর ওপর। আর শ্রীমতী গান্ধীকে ঘিরে তৈরি হয়ে গেছে তার অনুগত একটি 'ককাস', নির্বাহী শক্তিজোট। এরা ছিলেন সঞ্জয় গান্ধী, আর.কে. ধাওয়ান আর বিজয় ধর। এদের মধ্যমণিরূপে ছিলেন নিঃসন্দেহেই আর.কে. ধাওয়ান।

শ্রীমতী গান্ধী অপ্রত্যাশিতভাবে রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী ভি.ভি.গিরিকে সমর্থন করায় সংসদের কংগ্রেস সদস্যরাই যখন দ্বিধাগ্রস্ত, তখন প্রণববাবু ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষ নিয়ে গিরিকে ভোট দেন। এরপর সংসদ সদস্যদের যে কোনও বিদেশ ভ্রমণেই প্রণববাবু ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি। প্রণববাবুর শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি আনুগত্যের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে ১৯৭২-এ কংগ্রেসে যোগদানের এক বছরের মধ্যেই বাণিজ্যমন্ত্রকের উপমন্ত্রীর পদ পেয়ে যান তিনি। এরপর হন জাহাজ দপ্তরের উপমন্ত্রী। ১৯৭৫-এ জরুরী অবস্থা জারি হবার ছ'মাসের মধ্যেই প্রণববাবু শুল্ক ও ব্যাঙ্কিং দপ্তরের রাজ্যমন্ত্রীর পদ পেয়ে যান। তারপর জরুরী অবস্থা, ও তৎপরবর্তী জনতা শাসন, প্রণবের ইন্দিরা আনুগত্যে কোনও ভাঁটা পড়েনি। শাহ কমিশন গঠিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মত কংগ্রেসী নেতারাও যখন শ্রীমতী গান্ধীর বিপক্ষে চলে গেলেন, প্রণববাবু তখনও ইন্দিরা আনুগত্যে অটল রইলেন। শ্রীমতী গান্ধী এধরনের লোকই চাইছিলেন, যার নিজের রাজ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রভাব নেই, যিনি একান্ত অনুগত এবং বিশ্বস্ত। ১৯৮০ তে ক্ষমতায় এসেই ইন্দিরাজী প্রণবকে বাণিজ্যমন্ত্রী করলেন, তারপর ইস্পাত ও খনি দপ্তরের মন্ত্রী তারপর ১৯৮২-তে প্রণব চলে এলেন কেন্দ্রিয় রাজনীতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদাটিতে। প্রবীণ কংগ্রেসী ও দক্ষ রাজনীতিবিদ আর. ভেঙ্কটরমনকে সরিয়ে ৪৬ বছরের প্রণববাবুকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হ'ল।

১৯৬৯ থেকে এই এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রণববাবুর উত্থানের গতিপথ বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিসই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তার এই ভাগ্যোদয়ের পেছনে প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিয়ত কাজ করে গেছে শ্রীমতী গান্ধী ও তার ককাসের একটি গূঢ়তর উদ্দেশ্য।

প্রণব মুখার্জি শুরু থেকেই যে পদগুলি পেতে থাকেন তাতে দেশের ও বিদেশের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি ও সেগুলির কর্ণধারদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখার সুযোগ পান। শ্রীমতী গান্ধীর আমলে কংগ্রেস 'ফান্ড রেইজার'-রাই যথেষ্ট সমাদর পেয়ে এসেছেন। এই 'ফান্ড রেইজিং'-এর দায়িত্বে নিঃসন্দেহে ছিলেন শ্রীমতী গান্ধীর 'পার্সোনাল প্রাইভেট সেক্রেটারী' আর.কে.ধাওয়ান। দেশের আমলাবর্গের এক বিরাট অংশই ছিল ধাওয়ানের আনুগত্যে পুষ্ট। এই আমলাদের সহায়তায় ধাওয়ান দেশের শিল্পগোষ্ঠীগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করতেন কংগ্রেসের ফাণ্ডে নিয়মিত অর্থপ্রদানের জন্য। বলাবাহুল্য শুল্ক ও ব্যাঙ্কিং দপ্তর, ইস্পাত ও খনি দপ্তর, শিল্প দপ্তর সবশেষে বাণিজ্য দপ্তরের সঙ্গে মন্ত্রী হিসেবে জড়িত থাকার দরুণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখার কাজটা প্রণববাবুই করতেন। 'কাপরো' গ্রুপের মালিক স্বরাজ পাল এবং 'রিলায়েন্স টেকস্টাইলস' গ্রুপের প্রধান ধীরুভাই আমবানির সঙ্গে তার এধরনের সম্পর্ক সুবিদিত। প্রণব মুখার্জি ১৯৮২ সালে বাণিজ্য মন্ত্রী হবার পর আগষ্ট মাসে বোম্বাইয়ের স্টক এক্সচেঞ্জে রিলায়েন্স গ্রুপের শেয়ার বিক্রির হিড়িক পড়লে রিলায়েন্সের ম্যানেজমেন্ট বিপন্ন হয়ে পড়েন। তখন অব্দি অনাবাসী ভারতীয়রা কোনও ভারতীয় কোম্পানীর ১ লাখ টাকা ফেস ভ্যালু মূল্যের শেয়ার পর্যন্ত কিনতে পারতেন। কিন্তু ২০ আগষ্ট শ্রী মুখার্জীর দপ্তর থেকে এই সীমা (সেইলিং) অপসৃত করা হয়। ফলে ৭২ ঘন্টার মধ্যে আইল অব ম্যান (লক্ষণীয় যে ব্রিটেন নয়, ৭০০০ মাইল দূরের একটা ছোট্ট দ্বীপ)-এর 'থরটন ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড', 'গেইনফোর্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড', 'ভিকটর ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড' এই তিনটি কোম্পানী শেয়ার কিনতে এগিয়ে আসে। সেপ্টেম্বর এবং অকটোবর মাসের মধ্যে মোট এগারটি
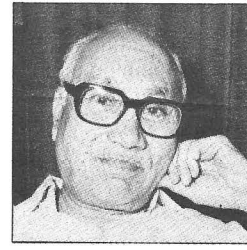
প্রকাশ মেহরোত্রা,

শ্রীপত মিশ্র

রোমান ইনভেস্টমেন্ট লিঃ ক্রোকোডাইল ইনভেস্টমেন্ট প্রভৃতি অশ্রুত নামের কোম্পানী, মোট ২২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনে রিলায়েন্সকে একটি রিলায়েন্ট ভিত্তিভূমিতে দাঁড় করিয়ে দেয়। এছাড়াও পলিয়েস্টার তন্তু আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক তার দপ্তর থেকে ততদিন বসান হয় নি যতদিন না রিলায়েন্স তার নিজের উৎপাদন শুরু করছে। নির্লন, জে.কে. প্রভৃতি ভারতের আর বাকি দশটি পলিয়েস্টার তন্তু আমদানীকারক কোম্পানীর তুলনায় ধীরুভাই আমবানীর মালিকানাধীন রিলায়েন্সের মুনাফা এভাবেই বেড়ে গেল। এছাড়া ৮৩ তে স্বরাজ পালের মালিকানাধীন 'ক্যাপরো' গ্রুপ যখন এসকর্ট ইন্ডিয়া এবং ডি সি এম-এর শেয়ার কিনতে গিয়ে 'ফেরা'-কে যথেচ্ছভাবে লঙ্ঘন করছিল তখনও ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রক সে ব্যাপারে নিতান্তই উদাসীন থেকে গিয়েছিল।

রাজীব ক্ষমতায় আসার পর প্রথমেই তিনি ধাওয়ানকে সরিয়ে দিলেন। রাজীব গান্ধীকে ঘিরে তখন নতুন 'ককাস' তৈরি হয়ে গেছে। এর সদস্যরা হলেন অরুণ সিং, অরুণ নেহেরু আর মাখনলাল ফোতেদার। প্রধানমন্ত্রীত্ব ও কংগ্রেসের সভাপতিত্ব পেয়ে রাজীব স্বভাবতই চাইলেন ইন্দিরা আমলের রাজনৈতিক শক্তিগোষ্ঠীগুলিকে সরিয়ে নিজের পছন্দসই শক্তিগোষ্ঠী তৈরি করতে। এইসূত্রেই তাঁর দুন স্কুলের প্রাক্তন সতীর্থরা ও অন্যান্যরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার শুরু করলেন। প্রধানমন্ত্রী হবার পর রাজীবের কাছে প্রণব মুখার্জির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। তাঁর ভালভাবেই জানা ছিল প্রণবের কোনও রাজনৈতিক ভিত্তিভূমি নেই। তাই ক্রমান্বয়ে প্রণব অপসৃত হ'তে লাগলেন মন্ত্রীসভা, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি কমিটি থেকে। অবশেষে কংগ্রেসের দেড় কোটি প্রাথমিক সদস্যের একজনও আর রইলেন না তিনি।

কলকাতায় ফিরে প্রণববাবু সোচ্চার হলেন: ইন্দিরা রাজন্যভাতার বিলোপ ঘটিয়েছিলেন, আর এখন রাজীব গান্ধী রাজা মহারাজাদের মন্ত্রী করছেন। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর অর্থমন্ত্রক প্রাপ্তিই বোধহয় প্রণববাবুকে 'মর্মাহত' করার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। মাধব রাও সিন্ধিয়ার রেলদপ্তর প্রাপ্তিতে গনিখান-এর অসন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ তা 'নেতৃত্বদ্রোহিতার' সামিল হ'ত আর তিনি পরিকল্পনা রূপায়ণের মত হঠাৎ সৃষ্ট দপ্তরের দায়িত্বেও রয়েছেন। তবু গনিখান স্পষ্টই বলেছেন—আসলে মন্ত্রীত্ব হারিয়ে প্রণব-

কমলাপতি ত্রিপাঠী ও পুত্র লোকপতি : কমলাপতির বিক্ষোভের পশ্চাদপট ?

বাবু বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন ।

এদিকে এবছরের জানুয়ারী মাস থেকেই প্রণববাবুকে ঘিরে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকে। কেউ বার-বার প্রণববাবুর স্ত্রী শুভ্রা দেবীকে ফোন করে জানাতে থাকে, "আপনার স্বামী অনেক বেশি কিছু জেনে ফেলেছেন, তিনি বেশি কথাবার্তা বলছেন, বারবার পশ্চিমবঙ্গে যাচ্ছেন, আপনার বিধবা হওয়া অনিবার্য...।" এছাড়া তার গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, ২০ মার্চ তাঁর দক্ষিণ দিল্লির বাড়িতে বোমা ছোঁড়ার ঘটনা প্রভৃতি কতকগুলি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটতে থাকে। ২৭ এপ্রিল 'ইলাসট্রেটেড উইকলি অফ ইণ্ডিয়ায়' প্রণব মুখার্জির এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় 'দ্য ম্যান হু নিউ টু মাচ' এই শিরোনামে, যার অস্যার্থ হ'ল প্রণববাবু কংগ্রেসের অনেক গোপন তথ্য জানেন, যা ফাঁস করলে কংগ্রেসের অনেক নেতারই রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। থ্রিলার ধরনের একটা সন্দেহের আবহ তৈরি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসে ভুয়া সদস্যপদের বিষয়টি নিয়ে ঘটেছে কমলাপতি ত্রিপাঠীর আসরে প্রবেশ। ৮২ বছরের এই বৃদ্ধ কংগ্রেস নেতা সততই পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে ভালবাসেন। স্মৃতি নাকি সততই সুখের। শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে বিস্মৃতি থেকে কিছুটা ফিরিয়ে আনেন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে। বলাবাহুল্য এই পদটি ইন্দিরাজীরই সৃষ্টি, এবং ইন্দিরাজীর পরে রাজীব যখন সভাপতি হলেন তখন পণ্ডিতজী কার্যনির্বাহী সভাপতি হয়েও মূলতঃ কার্যহীন সভাপতিতে পরিগত হয়ে গেলেন। এর ওপর গত ১৯ জানুয়ারী পাঞ্জাব ফেরৎ ডায়নামিক ঠাকুর অর্জুন সিংকে কংগ্রেসের সহ সভাপতি (এই পদটি আবার রাজীবের স্বকপোলকল্পিত) নিয়োগ করার পর কমলাপতিজী আর কংগ্রেসে তাঁর পদটির গুরুত্ব কি বা পদটি কেন এ সম্বন্ধে কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। শ্রীপত মিশ্র উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে অপসৃত হবার পর কমলাপতিজী আশা করেছিলেন যে ছেলে লোকপতি অদূর ভবিষ্যতেই পদটি পাবে। কিন্তু অরুণ নেহেরুর পৃষ্ঠপোষকতায় পদটি পেলেন গোরখপুরের ঠাকুর বীরবাহাদুর সিং। কমলাপতিজী দীর্ঘ ৬০ বছর থেকে জীবনের শেষ প্রান্তে উপলব্ধি করলেন দেশের শাসনব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ক্রমেই কমে আসছে। অরুণ সিং বা লালা ফোতেদারেরাই রাজীব জমানায় সম্মুখভূমিতে। ইতিমধ্যে প্রণব মুখার্জি, শ্রীপত মিশ্র, গুণ্ডু রাও, মাধব সিং সোলাঙ্কি, বিদ্যাচরণ শুক্লর মত কংগ্রেস নেতারা উপলব্ধি করতে লাগলেন যে কংগ্রেসের দীর্ঘদিন সেবা করেও তারা রাজীব জমানায় উপেক্ষিত হয়ে চলেছেন। রাজীব ইন্দিরা অনুগৃহীতদের পরিবর্তে কংগ্রেসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন সব লোকেদের আনছেন, যারা জনতা আমলে ইন্দিরাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন বা বিরোধীতা করেছিলেন। কে.সি. পন্থ, বলিরাম ভগৎ, আবদুল গফুর, মার্গারেট আলভা, প্রিয়-রঞ্জন দাশমুন্সীর মত লোকেরা কংগ্রেসের প্রধান পদগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। গত ছ'মাসে পশ্চিমবাংলা, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলিতে এবং জেলা কংগ্রেস কমিটিতে এমন সব লোকেরা উচ্চতর পদাধিকারী হয়েছেন যারা দুর্দিনে কেউই কংগ্রেসের পাশে ছিলেন না। প্রণববাবুর চোখে পড়েছে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর মত লোক, যিনি কয়েকবছর আগেও প্রকাশ্যে কংগ্রেস বিরোধিতা করেছেন, তাকে করা হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। তাকে ঘিরে আছেন সৌগত রায়, প্রদীপ ভট্টাচার্যের মত লোকেরা। সুব্রত মুখার্জি যিনি মুখ্যতঃ প্রণববাবুর কাছের লোক বলেই গণ্য হতেন, তিনিও মাখনলাল ফোতেদারের আশ্বাসবাণী পেয়ে দাসমুন্সীর সঙ্গে তার বহুদিনের ঝগড়া মিটিয়ে প্রণববাবুর বিরোধীতা করে প্রকাশ্যেই বিবৃতি দিলেন। অপরদিকে প্রণববাবুর মনে একটি লালিত আশা ছিল, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী হওয়া, কিন্তু সম্প্রতি রাজীব সরকার যেভাবে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে তার ব্রাত্য অবস্থা থেকে তুলে এনে নতুন ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন তাতে প্রণববাবুর এই আশাটিও সুদূর পরাহত হয়ে গেছে। আর সবচেয়ে অসুবিধার ব্যাপার হল কংগ্রেসের সব নিয়োগই হয় 'হাইকমাণ্ড'-এর আদেশে, সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধতা প্রণববাবুর একার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মুসলিম মহিলা বিল নিয়ে প্রণববাবুর ব্যক্তিগত চিঠি, তারপর কমলাপতিজীর নেতৃত্বে সম্মিলিত চিঠিও কিন্তু কংগ্রেস হাইকমাণ্ডে কোন তৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিল না। আসল ঘটনা ঘটতে তখনও কিছুটা দেরি।

সাম্প্রতিক কালে দেশের শিল্পসংস্থাগুলিতে রেইড-এর ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে, উদার বাণিজ্যিক অর্থনীতিতেও কিছুটা রাশ টানা হয়েছে। ফলে শিল্পসংস্থাগুলি সম্ভবতঃ প্রণব মুখার্জিকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে, তিনি কংগ্রেসের অনেক গোপন তথ্য জানেন, এই ভাবমূর্তিটিকে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন কেন্দ্রিয় নেতৃত্বকে বিব্রত করার জন্য। কিন্তু ২৬ এপ্রিল প্রণববাবুর পরিবারের ওপর বিভিন্ন আক্রমণের নায়ক সুবিমল রায় চৌধুরী গ্রেফতার হওয়ার পর প্রকাশ হয়ে পড়ল যে সুবিমল রায় চৌধুরী প্রণববাবুর পূর্বপরিচিত, একরকম ঘনিষ্ঠই। পুলিশি জেরার উত্তরে সুবিমলবাবু জানালেন প্রণববাবুর স্ত্রী শুভ্রাদেবীই তাকে এ কাজে প্ররোচিত করেছিলেন। সুবিমলবাবুর দু'জন সহযোগী সুখদেব
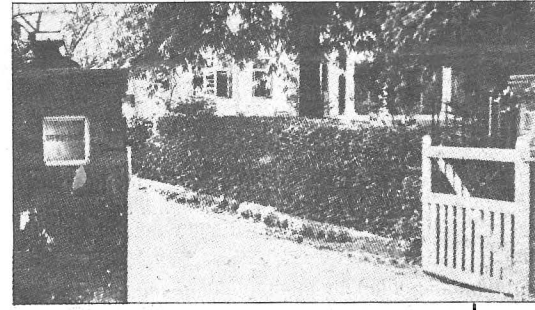
৯ জনপথ, কমলাপতির বাড়ি, যেখানে বিক্ষুব্ধরা সমবেত হয়েছিলেন

ও অশোক নায়ার যারা এই ধরনের কাজগুলি করছিল তারা পুলিশকে জানাল, সবসময়েই তারা এমনভাবে দুর্ঘটনাগুলি ঘটাত যাতে প্রণববাবু বা তার পরিবারের সদস্যরা যেন অক্ষত থাকেন। কংগ্রেসী হাইকমাণ্ডের কাছে ছবিটা স্পষ্ট হয়ে এল এবং ২৭ এপ্রিল প্রণববাবু কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

বহিষ্কৃত প্রণববাবু যে পশ্চিমবাংলায় কিছুটা আলোড়ন তুলতে পেরেছেন তার পেছনে প্রণববাবুর রাজনৈতিক শক্তি যতটা আছে তার চেয়ে বেশি আছে বাঙালী সেন্টিমেন্ট। বলাবাহুল্য ইন্দিরা আমলে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন গনি খান চৌধুরী, পশ্চিমবাংলায় তার বিভিন্ন কেন্দ্রিয় উদ্যোগ—স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকার জন্য। প্রণববাবু সে সময় অর্থমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও মোটেই জনপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু বাঙালী মানসে বরাবরই পশ্চিমবাংলার প্রতি কেন্দ্রের অবহেলা ও বঞ্চনার একটা ছবি আঁকা রয়ে গেছে। জ্যোতি বসুর আপামর জনপ্রিয়তার পেছনেও মুখ্যতঃ মূলধন এটাই। কেন্দ্রিয় মন্ত্রীসভায় ত্রিগুণা সেন থেকে শুরু করে প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র বা অশোক সেন পর্যন্ত, বাঙালিদের জন্য যেন আইনমন্ত্রক আর শিক্ষামন্ত্রকের মত দুটো নাতিগুরুত্বপূর্ণ দপ্তরই ছিল বাঁধা। সেক্ষেত্রে প্রণববাবুই একমাত্র পেয়েছিলেন বাণিজ্য দপ্তর ও অর্থদপ্তরের মত দুটি শক্তিশালী মন্ত্রীপদ। রাজীব জমানায় প্রণববাবুর এই ক্রমাবনমন ও বহিষ্কার তাই বাঙালি সেন্টিমেন্টে ঝড় তুলতে বাধ্য। এখন পর্যন্ত আনন্দমোহন বিশ্বাস, সমর মুখার্জি এবং সুবিমল ব্যানার্জি এই তিন জন বিধানসভা সদস্য প্রণববাবুকে সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি দলত্যাগ বিরোধী বিল পাশ হয়ে যাওয়ার পর সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা ভেবে কেউ আর ঝুঁকি নিতে রাজি হবেন বলে মনে হয় না। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি প্রণব সমর্থকদের ওপর কড়া নজর রেখে চলেছে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তও নিচ্ছেন। এদিকে কমলাপতি ত্রিপাঠীর ছেলে লোকপতি জানিয়েছেন হাইকমাণ্ডের সঙ্গে কমলাপতিজীর একটা মিটমাটও হয়ে গেছে। আর সাসপেণ্ড হওয়া তিনজন কংগ্রেসী নেতাকেও কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেওয়া হতে পারে যে কোনও সময়ে। অতএব অভিমন্যুর মতই প্রণববাবু এখন রণক্ষেত্রে একা।

ছবি : রবি বাটরা, স্বদেশ, গিরীশ শ্রীবাস্তব

ভারতের বৃহৎ শিলপগোষ্ঠীগুলির গতিপ্রকৃতি
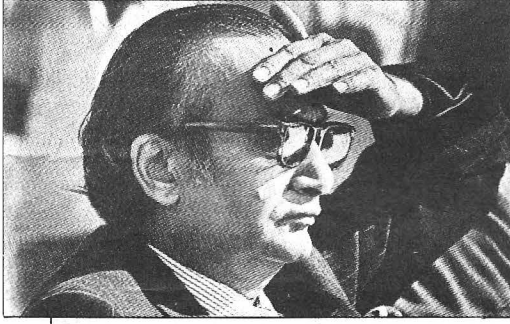
কে.কে. বিড়লা ছবি : অনিল কে: শর্মা

যে কোনও পরিস্থিতিতেই আসুক,ইন্দিরা গান্ধীই আসুন কিংবা রাজীবই আসুন, দেশে বড়ো মাপের ব্যবসার কিন্তু কোন বিকল্প নেই। ভারতের বৃহৎ ব্যবসায়ক্ষেত্র কিন্তু সত্যই বড়, কারণ এদের অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে মোট বিক্রি যোগ করলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় কয়েক হাজার কোটি টাকার। আর লাভ ? সেও প্রায় কয়েক শো কোটি টাকার। অর্থনৈতিক চরম উৎকন্ঠা, বা নিরন্তর ব্যবসা সংক্রান্ত বাধানিষেধ কিছুই আজ বড় ব্যবসায়ীদের উন্নতিতে বাধা দিতে পারছে না।

গত মাসে লোকসভায় ঘোষিত তথ্য অনুযায়ী ভারতের প্রধান কুড়িটি শিল্প গোষ্ঠীর স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পনেরো হাজার সাতশ পঞ্চাশ কোটি টাকা। কুড়ি বছর আগে প্রথম বার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এসে বেসরকারী ক্ষেত্রের এই দানবীয় উন্নয়নকে প্রতিহত করতে চেয়ে যখন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করলেন তখন এই শিল্প গোষ্ঠীগুলির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল মাত্র তেরোশ তিরিশ কোটি টাকা। বর্তমান সম্পত্তির মাত্র এক দশমাংশ। উল্লেখ করবার মত ব্যাপার হল বেসরকারী ক্ষেত্রের উন্নতির গতির অর্দ্ধেকও জাতীয় ক্ষেত্রে অর্জিত হয়নি। সম্ভবত: এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সরকারী মুখপাত্ররা টাটা এবং বিড়লা গোষ্ঠীর মুণ্ডপাত করে থাকেন।

ফের একবার বিড়লা গোষ্ঠী টাটা গোষ্ঠীকে টপ্‌কে সম্পত্তির তালিকায় এক নম্বরে এসে গেছেন। দু'নম্বরে অবশ্যই টাটা। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্পত্তির পরিমাণে তফাৎ অবশ্য খুব বেশি নেই। মাত্র দু'শো কোটি টাকা। কিন্তু এই দুই গোষ্ঠীর যুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়ে যায় প্রথম কুড়িটি গোষ্ঠীর মোট সম্পত্তির যোগ ফলের চল্লিশ শতাংশ। যদিও অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির অবস্থানগত বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু গত কুড়ি বছরে উল্লিখিত ব্যাপারে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৬৪ সালের

কে. এন. মোদি ছবি : ক্রিয়েটিভ আই

পর এই তালিকা থেকে চারটি গোষ্ঠীকে বেরিয়ে যেতে হয়েছে। সেগুলি হল সিন্ধিয়া, কিলিক নিক্‌শন, কস্তুরভাই লালভাই এবং প্যারী। তাদের জায়গাগুলো পূরণ করেছে যথাক্রমে রিলায়েন্স, আই.টি.সি (কলকাতা), টি.ভি.এস (মাদ্রাজ) এবং হিন্দুস্থান লিভার। পরবর্তীকালে তালিকায় কোম্পানী গুলির অবস্থানের ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটেছে। মোদি, মফৎলাল, বাজাজ, লারসেন এ্যান্ড টুব্রো গ্রুপগুলি তালিকার উপরে উঠেছে, আবার বাঙ্গুর, শ্রীরাম, ওয়ালচাঁদ, এবং এ.সি. সি. (সিমেন্ট) গ্রুপ নীচে নেমে গেছে। অন্যান্যদের মধ্যে থাপার, আই.সি.আই, মাহিন্দ্র এবং কির্লোস্কার গ্রুপ এখন তাদের অবস্থান বজায় রাখবার জন্য দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ছে।

ধীরু ভাই আম্বানির রিলায়েন্স শিল্পগোষ্ঠী বর্তমান শিল্পের আকাশে এই মুহূর্তে এক উজ্জ্বল জ্যেতিষ্ক। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত নামটা অপরিচিত ঠেকত। কিন্তু ১৯৭৯ সালে হঠাৎ এই গোষ্ঠী পাদপ্রদীপের আলোয় আসে। দু'বছর পরে এরাই উঠে আসে উপরোক্ত তালিকার ১১ নম্বরে। ১৯৮৩ সালে আরো উপরে একেবারে সাত নম্বরে। বর্তমানে এদের অবস্থানক্রম তালিকার ছ'নম্বরে। সম্ভবত: ১৯৮৭ সালের শেষ নাগাদ এই গোষ্ঠীটি বর্তমানের তৃতীয় স্থানাধিকারী সিংহানিয়াদের হটিয়ে দিতে পারবে। মাত্র দশ বছরের মধ্যে নবীন কোন শিল্পগোষ্ঠীর এ জাতীয় উঠে আসাটা প্রায় রূপকথার পর্যায়ে পড়ে। কারণ তালিকার অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি হয়ত প্রায় শতাধিক বছরের প্রাচীন কিংবা তার চেয়েও পুরনো। টাটা শিল্পগোষ্ঠী প্রথম শিল্প স্থাপন করেন ১৮৬৮ সালে। আর বিড়লারা ১৯৩৯ সালে একটি জুটমিল স্থাপন করে ব্যবসার পত্তন ঘটান।

দেশের বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলিকে খুব সহজ ভাবেই চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি গুজরাতি-পার্শী গোষ্ঠী, যাদের তালিকায় আছে প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে পাঁচটি গোষ্ঠী। সেগুলি হলো : টাটা, মফৎলাল, রিলায়েন্স, এ্যাসোশিয়েটেড সিমেন্ট এবং সারাভাই। মূলত: এদের ব্যবসার ভিত্তিভূমি হলো বম্বে কিংবা আমেদাবাদ। দ্বিতীয় বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে মারোয়াড়ি সম্প্রদায়। প্রথম কুড়ি জনে এদের মোট সদস্য পাঁচ। এই গোষ্ঠী বিড়লা, সিংহানিয়া, মোদি, বাঙ্গুর, এবং বাজাজকে নিয়ে গঠিত। এই দুটি গোষ্ঠী শক্তির দিক থেকে মোটামুটি সমান। মোট সম্পত্তির ৩৬ শতাংশ এই দুই গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করে। তৃতীয় গোষ্ঠীটি মূলত বিদেশী, এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে পড়ে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালস, আই.টি.সি. এবং হিন্দুস্থান লিভার। বাকী সাতটি বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোন বৃহৎ গোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত নয়, যদিও তারা প্রধানত: গুজরাতি-পার্শী গোষ্ঠীর দেখান পথ ধরেই চলে।

'ফেডারেশান অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স এ্যান্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ' বা সংক্ষেপে 'ফিকি'-তে বর্তমান বিড়লার নেতৃত্বাধীন মারোয়াড়ি গোষ্ঠীর প্রাধান্য বজায় আছে। এই মুহূর্তে তাঁরা এক সময়ে যাঁরা 'ফিকিকে' নিয়ন্ত্রণ করতেন সেই বম্বের প্রতিষ্ঠান গুলিকে হঠিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রাথমিক ভাবে মারোয়াড়ি শিল্পগোষ্ঠীগুলি ভারতীয় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের উত্তরপূর্ব অক্ষ বরাবর তাদের প্রাধান্য বজায় রেখেছে। বাকি যারা আছেন, তারা মূলতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম অক্ষের। 'ফিকি'র নেতৃত্বে সম্প্রতি যে গোলমাল চলছে মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এই ফেডারেশন ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মোট অর্থের প্রায় অর্দ্ধেকের নিয়ন্ত্রণকারী বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির উচ্চাকাঙ্খার এবং গতিশীলতার সঙ্গে তার সীমায়তি দিয়ে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। ভবিষ্যতে হয়তো কোনদিন দেশে তিনটি প্রধান বিজনেস ফেডারেশান দেখা যাবে, একটির নিয়ন্ত্রক হবে বিড়লারা, অন্যটি পশ্চিম ভারতে টাটা গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত এবং বাকি যেটি ইতিমধ্যে হয়েই আছে, 'এ্যাসোশিয়েটেড চেম্বারস অফ কমার্স' অথবা 'এ্যাসোচাম' যা মূলতঃ বিদেশী সংস্থাগুলির প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা। কেবলমাত্র এইভাবেই ভারতীয় ব্যবসায়ক্ষেত্রের সামগ্রিক ছবিটিতে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে।

বোঝা শক্ত কেন মাঝে মধ্যে কোন কোন গোষ্ঠী উন্নতি করে এবং অন্যরা নিচে নেমে যায়। ব্যাপারটি যে শুধু বড় গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই নয়, আলাদা আলাদা কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য একটা জিনিস পরিস্কার, সমস্ত বড় কোম্পানীই যে একদিন আরো বড়ো হবে এমন কোন কথা নেই। কোন কোন কোম্পানী বাহ্যিক অবসন্নতার জন্যেই বিবর্ণ হয়ে যায়, কোন কোন কোম্পানী কোনক্রমে টিঁকে থাকে। অপরপক্ষে কয়েকটি কোম্পানির উন্নতির ফল দাঁড়ায় সন্তোষজনক, তারা চড়চড় করে উন্নতি করে। বর্তমানে যে কোম্পানীগুলি শ্রেষ্ঠ কুড়িজনের মধ্যে আছে, তাদের মধ্যে দশটি মাত্র কুড়ি বছর আগে এই দলে ছিল। তিনটি কোম্পানী গুজরাত স্টেট ফার্টিলাইজার, জে.কে. সিন্থেটিকস এবং সাউর্দান পেট্রো-কেমিক্যালস-এর হয় অস্তিত্বই ছিল না অথবা তারা এতই নগণ্য ছিল যে নজরেই পড়ত না। অপরদিকে পূর্বতন দশটি কোম্পানী শিল্পের মানচিত্র থেকে হয় লুপ্ত হয়ে গেছে, নয় তাদের বড় কোম্পানীর দ্বারা অথবা সরকারের দ্বারা সেগুলি অধিগৃহীত হয়েছে। 'ইন্ডিয়ান আয়রণ' এক সময় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহৎ কারখানা হিসেবে পরিগণিত হতো। টাটা স্টীল যা এখনো প্রথম সারিতে আছে, তার পরেই ছিল এর স্থান। এখন 'ইন্ডিয়ান আয়রণ'কে সরকার জাতীয়করণ করেছেন এবং বর্তমানে তা 'স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার' একটি অংশ। নানা ধরনের কমিশন-এর ধাক্কায় এবং প্রধান উদ্যোগী ধর্মতেজার বাদ পড়ে যাওয়ায় জয়ন্তী শিপিং রুগ্ন হয়ে গিয়ে পরে তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তৈল শোধনাগারগুলিও সরকার কর্তৃক অধিকৃত হয়ে এখন অন্য নাম নিয়েছে। শুধু মাত্র গোয়েঙ্কা এবং পিরামলরাই অন্যান্যদের হজম করে উন্নতি করছে এটা ঠিক না। এমন কি সরকারও কোম্পানীগুলিকে গিলে ফেলার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত।

মারোয়াড়িদের ব্যবসার কি তবে অবনতি হচ্ছে? সাধারণভাবে গোষ্ঠীগত হিসেবে তারা খুব খারাপ ফলাফল করছে না। কিন্তু একক ভাবে এই কোম্পানীগুলি প্রতিদ্বন্দ্বীতার ক্ষেত্রে উন্নতির গতি অব্যাহত রাখতে পারছে না। শ্রেষ্ঠ কুড়িটি কোম্পানীর মধ্যে মাত্র চারটি কোম্পানীর মালিকানা মারোয়াড়িদের। তাদের মধ্যে তিনটি আবার শুধু বিড়লা গোষ্ঠীর আওতাতেই পড়ে (সেঞ্চুরি স্পিনিং, গোয়ালিয়র রেয়ন এবং বিড়লা জুট) এবং বাকি যেটি থাকছে সেটির মালিকানা হ'ল সিংহানিয়ার (জে.কে সিন্থেটিক্স)। একটা সময় ছিল যখন প্রথম কুড়িজনের তালিকায় এই গোষ্ঠীর কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ছয়। গত পাঁচ অথবা ছয় বছরে বিড়লারা বোধহয় নতুন কোম্পানী তৈরি করেন নি (অবশ্য বিড়লা-ইয়ামাহা বাদ দিয়ে, যেটি আসলে একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ)। মোদিদের কিন্তু বেশ কয়েকটি নতুন কোম্পানী চালু হয়েছে। মোদি সিমেন্ট এবং মোদি জেরক্স হল তাদের মধ্যে অন্যতম। এই নতুন কোম্পানীর

জে.আর.ডি. টাটা ও রুশি মোদি

চালু হওয়াই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তাদের ১৯৬৪ সালের ক্রম তালিকায় প্রায় শেষ স্থান থেকে ১৯৮৪ সালে তালিকায় ৭ নম্বরে উঠে আসার কারণ। তেমনি জৈনদের মত কেউ কেউ হয়ত এ ক্ষেত্রে ক্রমাগত পিছিয়েই পড়ছে।

বৃহৎ একচেটিয়া কোম্পানী গোষ্ঠীর ভিত সত্যিই যারা কাঁপিয়ে দিয়েছে, তারা হল লারসেন এ্যান্ড ট্যুবরো এবং এস্কর্টস। প্রত্যেকেই তারা নিজস্ব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। অশোক লেল্যাণ্ড, এবং বম্বে ডাইং-এর মত কোম্পানীগুলি অবশ্যই তাদের আজকের অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে না, যদি কারিগরি ক্ষমতার দিক থেকে তারা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, কারিগরি দক্ষতার ব্যাপারটাই সবথেকে জরুরী। ধীরু ভাই আম্বানির আসল মূলধন কিন্তু উৎপাদনে কি ধরনের কারিগরি দক্ষতা কাজে লাগান তিনি, সেটাই। একেবারে প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়া একটি রুগ্ন শিল্প দিয়ে শুরু করে তিনি তাঁর গোষ্ঠীকে (যদিও আসলে তা ছিল একটি মাত্র কোম্পানী) কয়েক বছরের মধ্যে তুলে নিয়ে যান সাফল্যের চূড়ায়। টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রিলায়েন্সের মধ্যে সম্পত্তির ব্যবধান এখন তিনশ কোটি টাকারও কম। এই মুহূর্তের মোটর গাড়ী ইণ্ডাস্ট্রীর অবস্থা থেকে বলা যায়, এই ব্যবধান তারা এক বছরের মধ্যেই ঘুচিয়ে ফেলতে সক্ষম হবে। এটা বাস্তবিকই সম্ভব হবে। কারণ আম্বানির কোম্পানী এখন টাটা স্টিলের একেবারে পিছনেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে।

তাহলে সব মিলিয়ে ভবিষ্যতের চিত্রটা কি হবে? আগামী ২০ বছরে এইসব গোষ্ঠীগুলির চেহারাই বা কেমন হবে? যে চার ভাই বিশাল বিড়লা সাম্রাজ্যের পত্তন করেন, তাঁরা আর কেউ বেঁচে নেই। পুরো সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব এখন পরের প্রজন্ম, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রজন্মের হাতে। প্রথম সারির একশটি কোম্পানীর মধ্যে অন্ততঃ পনেরটি কোম্পানী এখন বিড়লাদের কবজায়। অন্ততঃ অৰ্দ্ধেক কোম্পানী দেখা শোনা করেন প্রতিষ্ঠাতা বিড়লার নাতিরা। কনিষ্ঠতম আদিত্য বিড়লা দুটি কোম্পানীর প্রধান। একটি হল হিন্দুস্তান অ্যালুমিনিয়াম। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যেটির নেতৃত্ব দেন ঘনশ্যাম দাস বিড়লা নিজেই। দ্বিতীয়টি হল গোয়ালিয়র রেয়ন, যা সমগ্র গোষ্ঠীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কোম্পানী। তাঁর বাবা বসন্ত কুমার দেখাশোনা করেন বিড়লাদের বৃহত্তম কোম্পানী সেঞ্চুরী রেয়ন। অন্যান্য তরুণতর বিড়লাদের মধ্যে অন্যতমরা হলেন সুদর্শনকুমার, অশোক এবং চন্দ্রকান্ত। যদিও তাদের ভাইপো আদিত্যর উপরই কোম্পানীর আশাভরসা বেশী। নবীন প্রজন্মের বিড়লারা পুরনো প্রজন্মের থেকে অনেক বেশী শিক্ষিত। পুরনো বিড়লারা স্কুলে যেতেন না, বাড়িতেই শিক্ষা নিতেন। নতুন বিড়লাদের শুরু থেকেই অনেক বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

টাটাদের ব্যাপারটা অবশ্য একটু আলাদা। প্রথমত বিড়লাদের মতো তাদের মধ্যে অত তরুণ পরিচালক নেই। দ্বিতীয়ত টাটা গোষ্ঠীর মধ্যে বরাবরই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে পার্শীদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইদানীং অবশ্য পার্শী সম্প্রদায়ের বাইরে কিছু লোকও গুরুত্বপূর্ণ ম্যানেজারের পদে এসেছেন। যেমন মুলগাওকার এবং তালাওলিকর, এঁরা টেলকোর দায়িত্বে ছিলেন। দরবারী শেঠ নেতৃত্ব দেন চা এবং কেমিকেলস-এর। চিনাপ্পা দেখাশোনা করতেন শক্তি উৎপাদনকারী কারখানাগুলিকে। অবশ্য এই টাটা গোষ্ঠী বিড়লাদের থেকে বেশী কেন্দ্রীভূত। টাটা সাম্রাজ্যের ব্যবসায়িক তত্ত্বও অন্যান্যদের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী এবং সম্ভবতঃ এসব কারণেই দেশের নামী এবং পেশাগতভাবে সফল ম্যানেজারদের আকর্ষণ করে দেশের অন্যান্য গোষ্ঠীর থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে টাটাদের কৃতিত্ব সর্বাধিক। প্রায় প্রত্যেক গোষ্ঠীই গত ২০ বছরে প্রায় দশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও লারসেন অ্যান্ড ট্যুবরোর মত কয়েকটি কোম্পানী খুবই ছোট অবস্থা থেকে খুবই দ্রুত বেড়ে উঠেছে। বর্তমান গতিতে বেড়ে উঠলে ২০০৪ সালের মধ্যে বিড়লা গোষ্ঠী মোটামুটি নিজেদের সম্পত্তিকে আরও দশগুণ বাড়াতে পারবে। তখন এই সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াবে মোটামুটি ৩৫,০০০ কোটি টাকার মত। যা কয়েক বছর আগেকার কেন্দ্রীয় বাজেট যা হত, প্রায় তার সমান।

একইভাবে ঐ সময়ে, টাটার সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াবে ৩০,০০০ কোটি টাকায়। প্রথম কুড়িটি গোষ্ঠীর মোট সম্পত্তির যোগফল টাকার অঙ্কে দাঁড়াবে ১৫০,০০০ কোটি টাকার মত এক বিশাল অঙ্কে। যদিও ভবিষ্যতে অনেক বাধাবিঘ্নের পাহাড় আছে, তবুও ব্যাপারটা এরকম না দাঁড়ানোর কোন নিশ্চিত কারণ নেই। ইওরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানীগুলি তাদের সম্পত্তি এবং বিক্রয়ের হিসাব এখন করে বিলিয়নে, মিলিয়নে নয়। আমাদের দেশের কোম্পানীগুলির জন্যেও শিগগীরই কোন নতুন মাপকাঠি ঠিক করতে হবে, কারণ কয়েক বছরের মধ্যেই শিল্প বাজারে কোটি টাকা হয়ে দাঁড়াবে খুবই একটা ছোট ব্যাপার।

জয় দুবাসী

অমৃতকুম্ভ ঃ অমৃতযাত্রা

বর্ণনা : রাধাপ্রসাদ ঘোষাল ছবি : অনিল কুমার শর্মা

রাতের আলোকমালায় হরিদ্বার

অমৃততীর্থ অমৃতকুম্ভ : হরিদ্বার
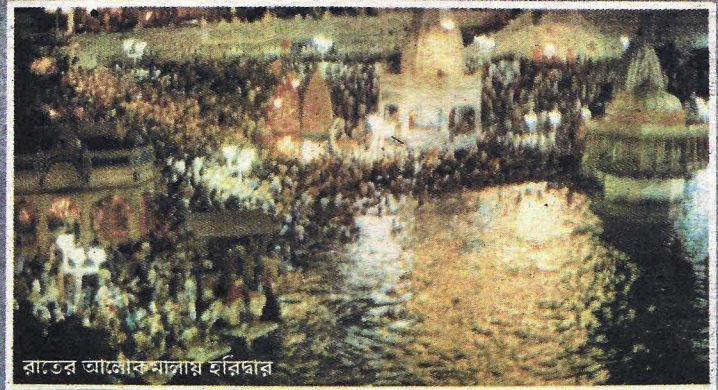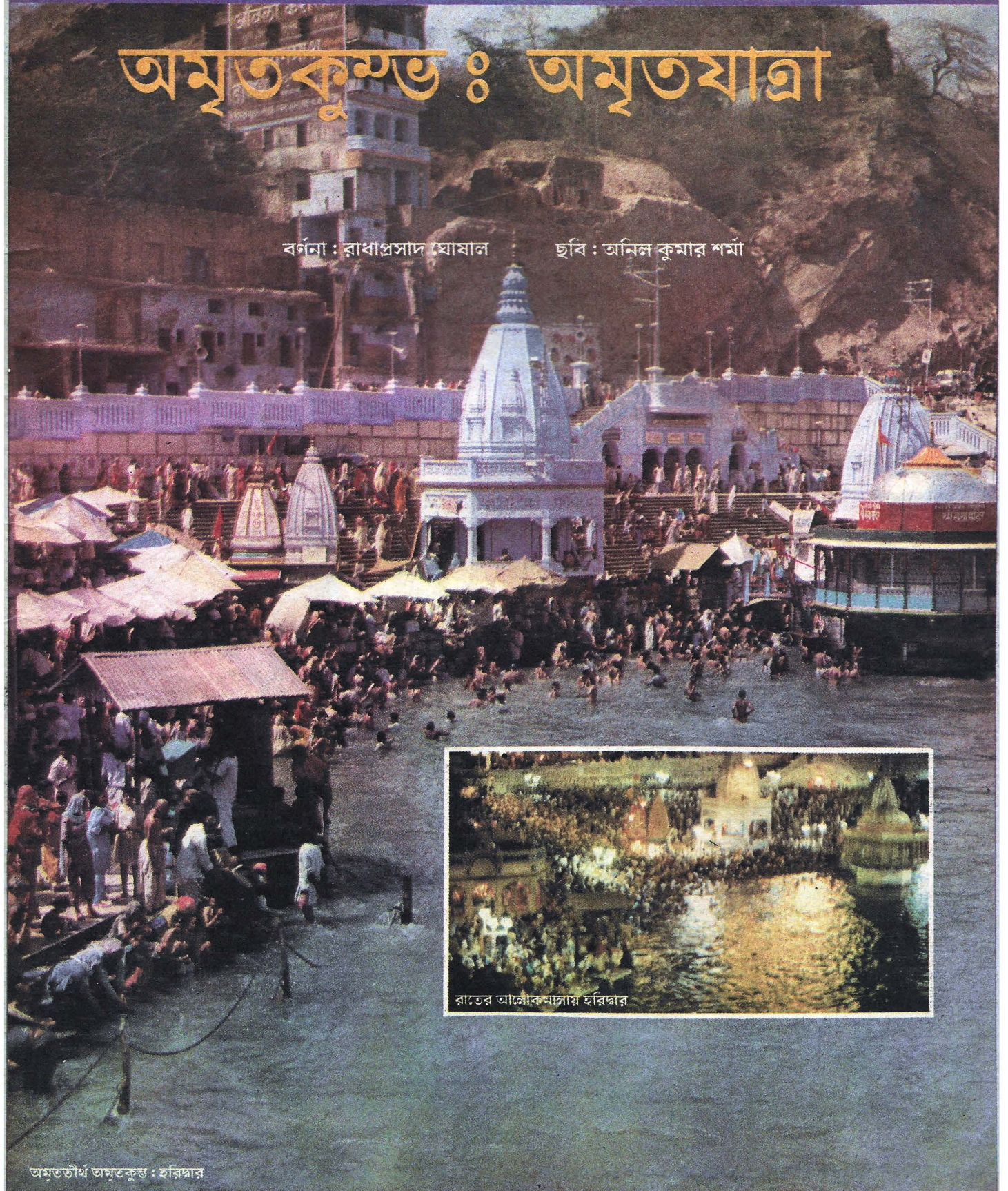
শুভদিনের প্রার্থনা : নাগা সন্ন্যাসীদের পুজোপাট

হিমালয়ের বুক ফেটে নেমে এসেছে কলুষনাশিনী গঙ্গা। স্নান করলে সর্ব গ্লানি নাশ হয়। মুক্তি হয় মানব জন্মের। সেই ধারা এসে দুই ভাগে এগিয়ে গেছে হরিদ্বারে। কাজলীরনের নিচে চণ্ডী পাহাড়ের সানুদেশে নীলধারা ফাল্গুনী রূপ ধরে এগিয়ে গেছে কনখলের দিকে। আর বাঁধ টেনে নকল নদীর মতো বয়ে গেছে আরেকটি স্রোত। হর-কি-পৌড়িকে ঘিরে ওই নকল স্রোতেই লোকজন টুপ টাপ ডুব দেয়। এই অবগাহনে ছুটে আসে ভারতবর্ষ। পূর্ণকুম্ভে উথলে ওঠে অমৃত। মহাযোগে স্নান করলে নাকি এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার চৈত্র সংক্রান্তি গঙ্গাস্নানের সমান পুণ্য। মোক্ষ চাই মানুষের। মুক্তি চাই। তাই এই মোক্ষদ্বারে আসা। মানুষ এসেছে মহামুক্তির সন্ধানে।

সে এক অনির্বার আকর্ষণে ছুটে আসা। হাওয়ার টানে, বাতাসের বেগে, নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে মানুষের তীর্থযাত্রা। ভিড় ঠেলে বিষ্ণুঘাটের কাছে এগিয়ে এলে মেঘের দিকে চোখ পড়ে। শিবালিক পাহাড় উদাসীন বিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় ঝাপালো পাঁকুড় গাছের তলায় সাধু, গৃহী পাশাপাশি বসে ভাত ফুটিয়ে খাচ্ছে।

ভিড় ঠেলা যায় না। গঙ্গাখালের ঘাটে ঘাটে স্নানের হিড়িক পড়েছে। হিমালয়ের পাদদেশে এই হিম শীতল পৃথিবীর অলীক রহস্য মানুষকে টানে। আমাকেও টেনেছে। তার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। সোনালী চুলের গোছা হাওয়ায় উড়িয়ে সে হেসে উঠল খিলখিল করে। নরম আমের মত পিঠ, রক্তাভ। স্যান্ডো গেঞ্জি পরেছে। ঠোঁটের নিচে তিল। নদীর ওপর পানকৌড়ির মত চরছিল। বয়স চলে গেছে জীবনের টানে। ধূসর বালির মত চোখ। গেরুয়া পোশাকে পা থেকে গেঞ্জি পর্যন্ত ছাওয়া, অপূর্ব। ভারতীয় ধর্ম দর্শন ওর ভাল লেগেছে। ওকে ডাক দিয়েছে। এসেছে কুম্ভ দর্শনে। ওর নাম সান্টি।

ট্রেনে আসার সময় আসানসোলে উঠেছিল। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী। হরিদাসী গ্রামের মেয়ে। তুলসী কাঠের মালা। কপালে রসকলির টান, চন্দনের ইঙ্গিতে অন্যদিকে ছুটে যেতে চায়। মেঝেতে বসে জটলা করছিল। তার মহাজীবনটি কেমন সুখে দুঃখে কেটেছে। বাপ-মা-ভাই-দাদা সংসারে কে কার ! গাইল, দুখের দিনে সেজন বিনে ক্ষ্যাপা পর কি আপন হবে রে–

ঠিক তারই মতো গলায় তুলসী কাঠের মালা গেরুয়া পোশাকের নিচে ঢেকে গেছে। মৃদু হেসে বলল, বিলিভ মি, মাই ফেথ ইজ মাই গড।

ভিড়ে হারিয়ে গেল। যার মুখের মধুর বচন শুনে তোমার হৃদয় ডাক দিয়েছে সে তোমাকে ফাঁকি দেবেই। আর ধরা দেবে না। হাঁটতে হাঁটতে আমি এগিয়ে এসেছি রোড়িবেলওয়ালা। এখানে বেলগাছ আর নুড়ি পাথরের জঙ্গল ছিল একদিন। এখন মানুষ আর মানুষ। কত জনার কত রূপ, চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

ঘরগেরস্থ সংসার ফেলে তীর্থস্থানে এসে মানুষ আর একটি সংসার পেতেছে। পেতে দেওয়া মাদুরে এসে যারা বসেছে তাদের জাতের ঠিক ঠিকানা নেই। সাধু আর শয়তান যুগল মিলনে বাঁধা। রাঁধছে, বাড়ছে, খাচ্ছে। তারি সঙ্গে ভজন পূজন। আর সন্ন্যাসীরা ছড়িয়ে আছে সাত আটটি আখড়ায়, কেউ নাঙ্গা কেউ নিরঞ্জনি আখড়ায় বসে আছে গৈরিক জীবনের মাহাত্ম্য নিয়ে, কেউ বা আনন্দ বনে আর্যাবর্ত যুগের মতো তপোবন গড়ে যোগ সাধনা করছেন। পাশে কুলকুল বয়ে যায় অমৃতবাহিনী। গঙ্গা এখানে নদী নয়, দেবী। জননী।

আমার জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। যত্র জীব তত্র শিব। যত মত তত পথ। অথচ এরা সবাই ছুটে বেড়াচ্ছেন একই কস্তুরীর সন্ধানে মাতাল হয়ে। কত সঙ্গের অঙ্গ করে খুঁজে পাওয়া দায়। ওই ফিলাডেলফিয়ার মেয়ে সান্টি। সান্টি মানে 'পিস'–শান্তি। আগে নাম ছিল মারিটা। ভারতের গৈরিক চিন্তা বুকের ভেতর ঢুকে তোলপাড় করে। তারপরেই বিদেশনী নাম নেয় শান্তি। ওঁ ভূ শান্তি–পৃথিবীর শান্তি হোক।

বয়স ৪০। শরীর ঢলে গেলেও যৌবনের শেষ আবির মুখে চোখে টকটক করে। একটু পরেই সন্ধ্যে নামবে। এখন গোধূলি, শান্তির মতো ঠান্ডা আলো ছড়িয়ে আছে শরীরে। কলেজে পড়তে পড়তেই বৈরাগ্য এলো। গার্হস্থ ছেড়ে কয়েক মাইল ঘুরে ফিরে পরশু রাতে এসে উঠেছেন লছমনঝোলার স্বর্গধামে। বাবা কালিকমলিওয়ালি আশ্রম। সকাল হতেই হৃষিকেশে চলে এসেছেন কুষ্ঠ রোগীদের সেবা করার জন্য। তারপর বাসযোগে হরিদ্বার।

শাহদুর কিনে খাচ্ছিল বিদেশিনী। পাহাড়ি এলাকার এই এক ফল। লম্বা কড়াইশুঁটির মত ভেতরে রস টালমাটাল। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে পোখরাজ

এই অবগাহনে ছুটে আসে ভারতবর্ষ

অমৃতস্নানের উদ্দেশে যাত্রা : নাগা সন্ন্যাসীরা
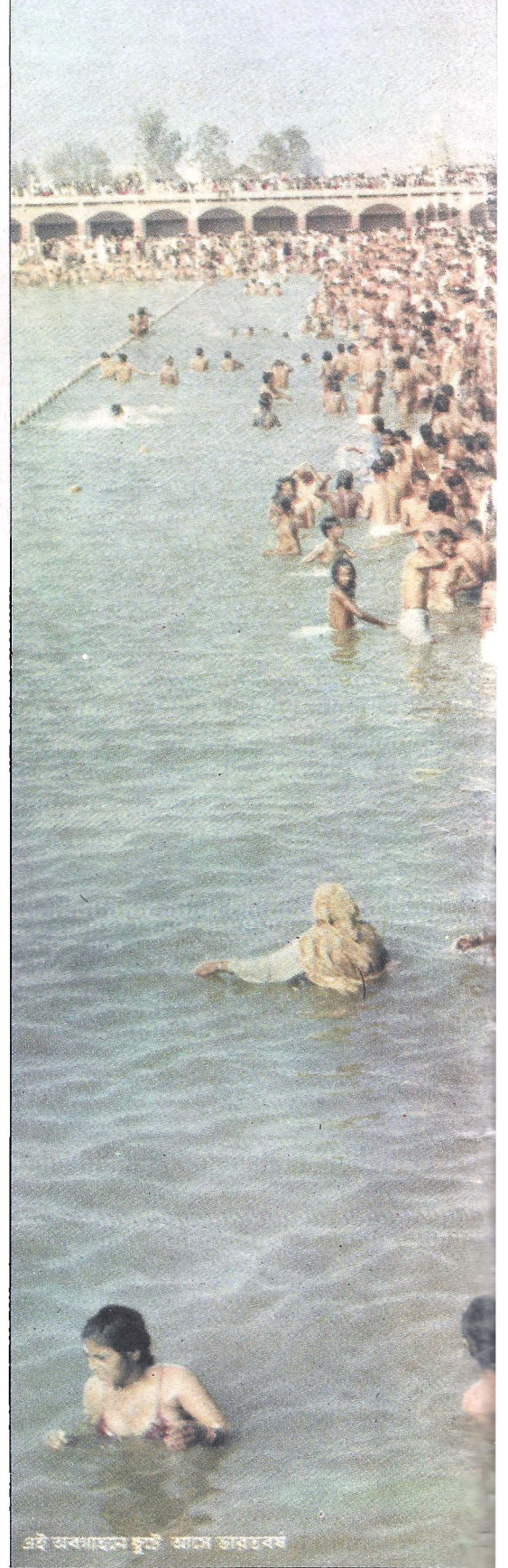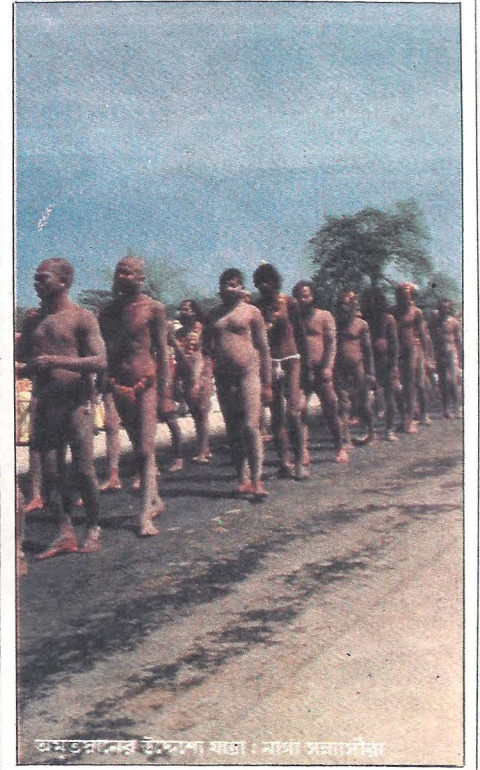
দানা বিকশিত করে বলল, প্লিজ সেয়ার—

পুলিশ তাড়া করেছে। ওর কাছে পাসপোর্ট নেই। তাই এই পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো। এক জায়গায় পরপর দু রাত্রিবাস নয়। শুধু ছুটে বেড়ানো। কিসের টানে এই স্নানের ঘাটে ছুটে আসা। 'পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশি গতে গুরৌ। গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগা কুম্ভ নাম তদোত্তম।' বৃহস্পতি যখন কুম্ভরাশিতে আর সূর্য যখন মেষ রাশিতে থাকে তখন হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হয়। উথলে ওঠে অমৃত। তারই টানে মন উচাটন।

যে দিন সুনীল সাগর জলধি হইতে জাগিয়া উঠিল ভারতবর্ষ—কবির কবিতায় পড়েছি। আর আজ ১৪ এপ্রিল সকাল থেকেই স্বদেশ যেন উপচে পড়ছে গঙ্গার ধারার মতো। জল আর যৌবন কেমন একজন আর একজনকে টানে। বাংলা বিহার উড়িষ্যা, রাজস্থান গুজরাট পাঞ্জাব—সব। সব জায়গা থেকে মানুষ ছুটে এসেছে, গড়েছে বিস্তীর্ণ অচলায়তন, ভারততীর্থ মহাকুম্ভ। রাত্রি দু'টো ছ'য় মিনিটে একবার ডুবতে পারলেই মুক্তি, মহামুক্তি।

রামনামী আখড়ার মাহেশ বুড়োর সঙ্গে কথা বলে মনটি আমার ভরে গেল। মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরের লোক! ঘোর সংসারী। সংসারে থেকে ভজন পূজন করে। সাত্ত্বিক ভোজন করে। তিনশ জনের একদল আদিবাসী তীর্থ করতে এসেছিল। উঠেছে চণ্ডীদ্বীপে। হাত পুড়িয়ে খায় আর মহাজীবনের গল্প করে।

মাথায় ময়ূরের পালকের মতো চুল নেই। মুণ্ডিত মস্তক। শরীরে, মুখে লক্ষ লক্ষ রাম নাম লেখা উলকি কাটা। ওরা ভাত খাচ্ছিল। সাদা আতপ চালের ভাত। দই ডাল আ ফুলুরি দিয়ে রাঁধা 'কারি'। আর সবজি সেদ্ধ। কেউ আটার রুটি। রুটির নাম বলে এরা ফুলকা-রাম।

কিসের টানে এসেছে জিজ্ঞেস করায় মাহেশ হাসল, আদিবাসী মানুষটি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মতো বলল, হামারা শরীর সিফ হামারা নেহি। ইয়ে তো ব্রহ্মকা শরীর

হ্যায়। দুনিয়াকো সবকো শরীর একই হ্যায়। আউর হাম সব লোক ব্রহ্মকো খণ্ডবিখণ্ড রূপ হ্যায়। ইস-লিয়ে হামারা পূজা ওহি শক্তি কে লিয়ে উপাসনা হ্যায়। রাম নাম সৎ হ্যায়, সাচ হ্যায়। তীর্থক্ষেত্র হি সাধন পূজন কি যথার্থ ভূমি। ঈশ্বর কো সেবা করনে কে লিয়ে হাম হিয়া পর আয়া হুঁ। জয় রামজী কি–

ওদের সাথে বসে আমি ফলার করলাম। তৃপ্তির ঢেক উঠে আকাশে মিলিয়ে গেল।

গঙ্গাখালের ওপর সান বাধানো শেড। গাছের তলায় যারা সংসার পেতেছে তাদের ভেজা কাপড় রোদে শুকচ্ছে তারকাঁটায় বাঁধা বেড়া প্রাচীরে। ওদের মাঝেই আবার আবিষ্কার করে ফেললাম সেই শান্তিকে।

চিনতে পেরেছে। এত ভিড়েও আমার কথা সে মনে রেখেছে। এই ভাবেই একবার এখানে একবার ওখানে গিয়ে বসছে। আলাপ চারিতার ফাঁকে মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠছে ক'দিনের সম্পর্ক। তাই মধুর, তাই বাঙময়, এটিই তো সত্য। দুদিনের পৃথিবীতে এসেছ কাকে তুমি আপন বলে দাবী কর। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রা। সবই তো তোমার। দেখ, দখল নিতে যেও না।

গভীর রাতে উলুধ্বনি দিয়ে হৈ হৈ এগিয়ে গেল মানুষ। ব্রহ্মকুণ্ড পোকায় পোকায় থিকথিক করছে। পোকা নয় মানুষ। গঙ্গারতি উথলেছে। এইবার স্নান কর। সার্থক হবে এ জন্ম, পরজন্ম, ত্রিকালদর্শন। নব-জন্ম পাবে।

ভিড় ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে চারটে বাজে। স্নান সেরে বিড়লা ঘড়ির নিচে দাঁড়াতেই আবার হৈ হৈ, গেল গেল। পরে বুঝলাম, হর-কি-পৌড়ি থেকে অল্প দূরে পন্হদ্বীপে হাজার হাজার মানুষের পায়ের চাপে চিড়ে হয়ে গেছে শতাধিক মানুষ।

এই গঙ্গাদ্বার। হর-কি-পৌড়ি অর্থাৎ হরের ঘাট। শিব মহাজীবনের হাত দুটি বাড়িয়ে আছেন, এসো, বুকে এসো। এই মোক্ষ দ্বার। একবার ঢুকতে পারলে মানব জন্মের মুক্তি। মন খারাপ করে পান্হশালায় ফেরার পথে মনে হলো হয়তো এই বিশ্বাসের জোরেই

হর-কি-পৌড়িতে পুণ্যস্নান
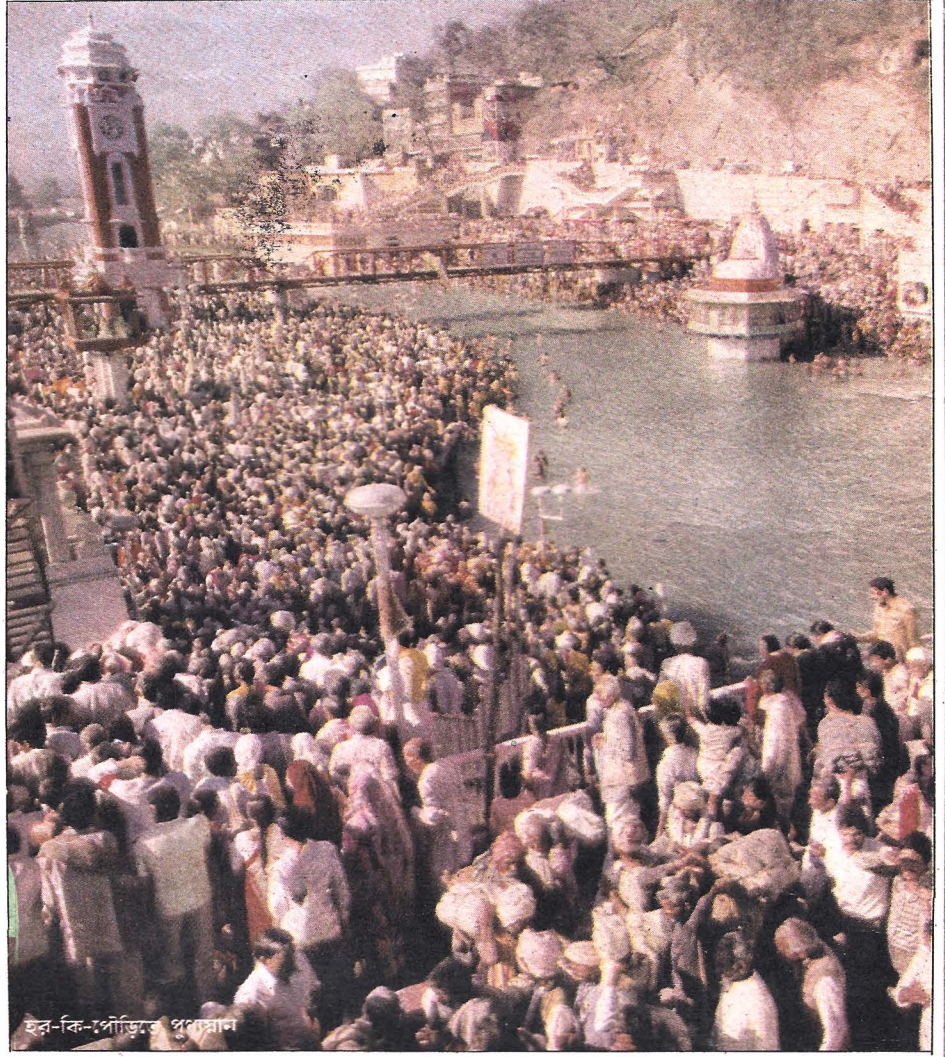
তারা এমন নিষ্ঠুর মৃত্যুকেও মুক্তির দ্বার হিসেবে গণ্য করে।

হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন এ বিশ্ব থেকে। তাঁদের যাত্রা পথ শান্তির হোক। অমৃতমূলময়ঃ।

কত মানুষ, কত ভাষা, কত শব্দ উচ্ছ্বাস। আছে বালক, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়। আছে গৃহী, সন্ন্যাসী, নুলো, অন্ধ। বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের রূপোর চুলে হাজার বছরের রূপকথা গঙ্গায় হাসতে হাসতে ভেসে যায়। মাধুকরী ভিক্ষুকের চোখে মহামানবের দিকদিগন্তহীন মহা-সাগর হৈ হৈ করে। তারই মাঝে জীবন আর মৃত্যু একজন আরেক জনের কাঁধে হাত রেখে কেমন নির্ভীক হেঁটে যায়!

সারারাত চোখ ছুটেছে নিজের খেয়ালে। ভোরের দিকে পান্হশালায় ফিরে একটু গড়িয়ে নিলাম। ঘুম এসে গেলে একেবারে সকাল। ঝকঝকে কাঁসার থালার মত সূর্য আকাশে গনগন করছে। নদী অববাহি-কায় বালি, যত তাপে তত ঠাণ্ডা হয়। তাই ভোরের সেই শীত এখন মরে গিয়ে পিঠে বিন বিন করে। ঘাম দেয়। মুখ ধুয়ে চায়ের খুরিতে ঠোঁট রাখতে যাব এমন সময় রণভেরীর মতো বেজে উঠল বাজনা। মাইকে বাজল গান, গঙ্গা তেরি পানি অমৃত– দৌড়ে রাস্তায় এসে দেখি রোড়িবেলওয়ালার পিচরাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে সাহি যাত্রা। সন্ন্যাসীদের উদয়াচল। এইবার ওদের স্নান যাত্রা।

ভিন্ন ভিন্ন আখড়ার সাধুরা। ভিন্ন ভিন্ন তাদের পোশাক। রূপ। সবার আগে দৃষ্টি কাড়ে নাগা সন্ন্যা-সীরা। লাইন করে উলঙ্গ আদিম সভ্যতার ধারাটিকে পিঠে তুলে এগিয়ে চলেছে মহাজীবনের দিকে। পর বিকেলে এদের আমি দেখতে গিয়েছিলাম জুনা আখড়ায়।

প্রত্যেকের হাতেই গাঁজার কলকে। গল গল ধোঁয়া বেরুচ্ছে। অন্ধকার আখড়ায় নাগারা জীবন্ত দস্যুর মতো নির্মম চোখে তাকিয়ে। দেখলেই ভয় আসে। হোমকুণ্ড জ্বলছে চোখের সামনে। রূপোর কলকেয় গাঁজা সেবন। মেলায় এদের খাতিরই সবচেয়ে বেশি। আজ দেদার ভস্ম মাখা পাঁশুটে নগ্ন দেহগুলিই চুলে গাঁদা ফুলের হলুদ মালা গুঁজে লাঠি তলোয়ার চিমটে ত্রিশূল ঘোরাতে ঘোরাতে এগোচ্ছিল।

এই যে অমৃত যাত্রা এর শেষ নেই। জীবনের মহাযাত্রার কথা যখন ভাবতে বসি, তখন চোখের সামনে মহাকুম্ভের খেলা। লোকজন যে যার ঘরে ফিরে যাচ্ছে। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে অমৃত। আমি ফিরে এসেছি। আমার অমৃত, আমার স্মৃতি। তাই আমাকে অমর করুক্।
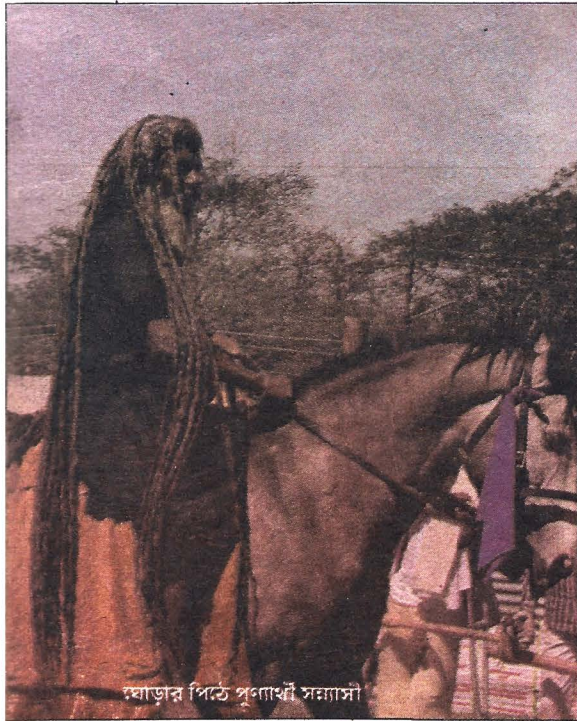
ঘোড়ার পিঠে পুণ্যার্থী সন্ন্যাসী

সঙ্গ আসঙ্গ লিপ্সায় নাভ্রাতিলোভা

বিজয়িনী মার্টিনা : ২২ বছর বয়সে উইম্বলডনে

ফেডারেশন কাপে খেলতে এবার তার পূর্বতন স্বদেশ চেকোস্লোভাকিয়ায় যাচ্ছেন মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। আমেরিকান নাগরিক হবার পর, এই প্রথম তার চেকোস্লোভাকিয়া সফর। টেনিস কোর্টে এবার তিনি তার পূর্বতন স্বদেশের বিরুদ্ধে বর্তমান স্বদেশের হয়ে খেলবেন। এই রচনায় নাভ্রাতিলোভা ফিরে তাকিয়েছেন তার টেনিস কোর্টের বাইরের জীবনে—চেকোস্লোভাকিয়ায় তার শৈশব, প্রথম পুরুষসঙ্গের অভিজ্ঞতা, বিপরীত যৌনাকর্ষণকে ছাড়িয়ে তার জীবনে সমকামীতার উন্মেষ। তবু এই সবকিছুকেই ছাড়িয়ে গেছে টেনিসের প্রতি মার্টিনার অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ ভালোবাসা।

আমেরিকায় আমি যখন প্রথম টেনিস খেলা শুরু করি, ঠিক তখনই আবিষ্কার করি পিৎসা, হ্যামবার্গার, স্টিক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, প্যানকেক। অনেকেই বলতো, মার্টিনা পাহাড়প্রমাণ খেতে পারে। এতসব জমকালো খাবার খাওয়ার ফল হলো, কটিদেশ আর মুখে মেদ জমতে শুরু করলো। রুশ খেলোয়াড় ওলগা মোরোঝোভা আমার দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো। আমার কেমন যেন অস্বস্তি হত। সেই ১৭ বছর বয়সে, নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, আমি একজন পূর্ণাঙ্গ নারী।

আমার প্রথম ডেটিং-এর অভিজ্ঞতা হয় হাই-

কোচ জর্জ পারমার সঙ্গে মার্টিনা
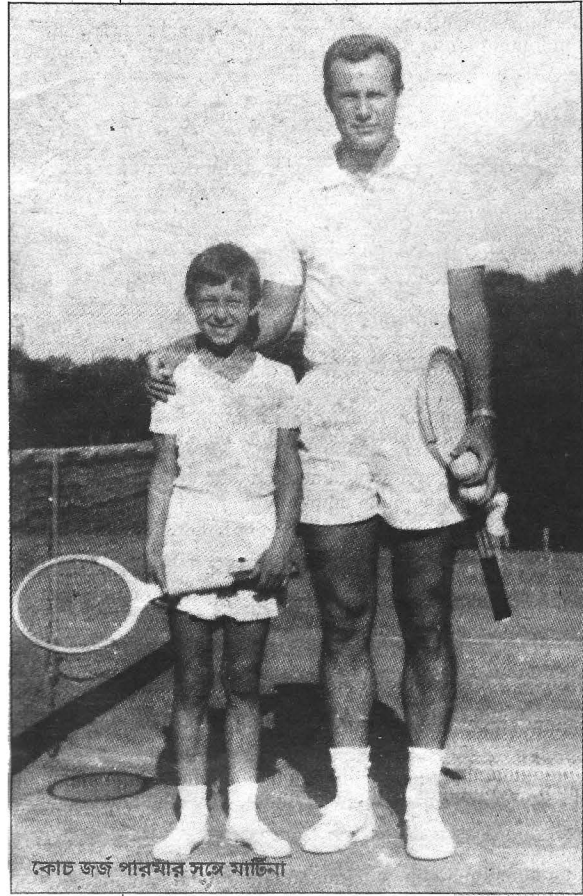
আমি যখন বড় হয়ে উঠেছিলাম, তখনই যৌনতা সম্পর্কে দুটো ধারণা আমি পেয়েছিলাম। একদিকে আমার মায়ের পুরোনো ধারণা যে, বিয়ে করার আগে পর্যন্ত আমার অপাপবিদ্ধা কুমারী থাকা উচিত। অপরদিকে আমার বাবা প্রায়শই বলতেন, বিয়ের আগেই নিশ্চিতভাবে জেনে নেওয়া উচিত যে, বিছানায় শোবার মত যোগ্যতা তোমার আছে কি না।

স্কুলের দিনগুলোতে। একটি ছেলের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য মেলামেশা করেছিলাম। আসলে খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল সেটা, একটা পার্টিতে হাত ধরাধরি করে একটু হৈহল্লোড় করা। কিন্তু ১৯৭৩ সালে, আমার সতের বছর বয়সে, প্রাগের রাস্তাঘাটে জীবনকে আমি অন্যভাবে দেখতে পেলাম—আমার মত বয়সের ছেলে মেয়েরা পরস্পরের জোড়া খুঁজে নিচ্ছে। আমি তখন মনে মনে চাইছিলাম কোন ছেলেবন্ধুকে পেতে।

পেয়েও গেলাম একজনকে। আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিল সে। স্থাপত্যবিদ্যার ছাত্র। আমরা একসঙ্গে টেনিস খেলতাম। এরপর আমি যখন স্টেট্‌স থেকে ফিরলাম, সে আমার প্রতি যেন বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হল। আমি নিজের মনোবল ফিরে পেলাম, নিজেকে আরও বেশী করে নারী বলে মনে হতে লাগলো, আর আমার মধ্যে কেমন একটা নারীসুলভ কোমলতাও জেগে উঠছিল সে সময়।

আমার গাল দুটো ছিল বেশ ফোলাফোলা, কিন্তু তাতে আমার ভালোই লাগতো, কেননা এতে করে আর আমাকে ছেলের মত দেখাচ্ছিল না। আমি বেশ মোটাও হয়েছিলাম, পুরনো পোষাকগুলো আর পরতে পারতাম না।

আমরা দুজনে সেইসব দিনগুলোতে প্রাগে চলে যেতাম—সেখানে থিয়েটার, কনসার্ট বা অপেরা দেখতে যেতাম—কখনো প্রাগের পুরনো অঞ্চল দিয়ে দুজনে এলোমেলোভাবে হাঁটতাম, দোকানের শো-উইনডোগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে। দুজনে মিলে কোনও বারে ঢুকতাম, সেখানে হয়ত তখন বাজছে মার্কিনী সুর।

আর্কিটেকটের ছাত্র হবার দরুন সে একটা সরকারী চাকরীও পেয়ে গিয়েছিল। দুর্গ সংরক্ষণ প্রকল্পে। আমি ওর সঙ্গে যখন ওর অফিসে যেতাম, তখন নিজেকে বেশ গর্বিত মনে হত। অফিসে ওর কর্মকুশলতা আর দৃঢ়তার ভঙ্গী দেখে আমার মনে হয়েছিল যৌনতার বিষয়েও ও নিশ্চয়ই এইরকম দৃঢ় ও সবল। ওর সঙ্গ আমার খুব ভালো লাগতো। দিনে দিনে আমরা আরো ঘনিষ্ঠ হচ্ছিলাম, এরপরই একদিন প্রাগে ওর অ্যাপার্টমেন্টে ও আমাকে আমন্ত্রণ জানাল।

আমি যখন বড় হয়ে উঠছিলাম, তখনই যৌনতা সম্পর্কে দুটো ধারণা আমি পেয়েছিলাম। একদিকে আমার মায়ের পুরোনো কালের ধারণা যে, বিয়ে করার আগে পর্যন্ত আমার অপাপবিদ্ধা কুমারী থাকা উচিত। অপরদিকে আমার বাবা প্রায়শই বলতেন, বিয়ের আগেই নিশ্চিতভাবে জেনে নেওয়া উচিত যে, বিছানায় শোবার মত যোগ্যতা তোমার আছে কি না। বাবা বলতেন, "বিয়ের ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট ব্যাপার, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই যার তার সঙ্গে শুতে পারো না, যদি না তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে থাকে তোমার।" তিনি অবশ্য বলতেন যে ২১ বছরের আগে এরকম কিছু করা অবশ্যই ঠিক নয়।

আমি তখন বিয়ের কথা ভাবছিলাম না ঠিকই, কিন্তু বিয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ওই শারীরিক মিলনের দিকটা আমাকে আকর্ষণ করত। ২১ বছর বয়স হতে তখনও আরো চার বছর দেরি—অতদিন কে অপেক্ষা করতে পারে বলুন ?

প্রথম দিকে আমার সেই প্রেমিকপ্রবরের অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়ার ব্যাপারে আমি মনস্থির করতে পারছিলাম না। কেননা সেই প্রথম বার। এ নিয়ে আমি আকাশপাতাল ভাবছিলাম। তারপর একদিন সপ্তাহান্তের ছুটির দিন, ওর বাবা-মা সেদিন বাড়িতে ছিলেন না, আমি ওর অ্যাপার্টমেন্টে গেলাম।

আমার জীবনের সেই প্রথম যৌন মিলন। যাওয়ার সময় ভালো লাগার সঙ্গে মিশেছিল একধরনের আতঙ্কবোধও। আমি ভাবছিলাম, ও নিশ্চয়ই আগে অন্য মেয়েদের সঙ্গেও মিলিত হয়েছে—নিশ্চয়ই ও জানে এসব ব্যাপার। কিন্তু

চারবছর বয়সে মায়ের সঙ্গে

যখন ব্যাপারটা সত্যিই শুরু হল, তখন দেখলাম, আগে যেমন একটা রঙীন ছবি ভেবেছিলাম, তেমন কিছুই নয়। আমি আসলে জানতে চেয়েছিলাম, অনুভব করতে চেয়েছিলাম, ব্যাপারটা কেমন লাগে। সেটা হয়ে যাবার পর, হতাশ হলাম, মনে হল–সত্যিই কি এটার কোনও প্রয়োজন ছিল ?

এরপরই একদিন বাবাকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কয়েকটা উল্টোপাল্টা কথা জিগ্যেস করে বসলাম। তিনি বললেন, "একুশ বছর বয়স হলে তবেই তুমি আমার কাছে এধরনের প্রশ্নগুলো জিগ্যেস কোরো।" মা অবশ্য ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন যে আমার কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে ! এরপর মা-বাবা দুজনেই শান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন ঘটনাটা। বাবা শুধু বলেছিলেন, "এরকম আর কখনও কোরো না।" এটা বাবা-মায়েরা বলবেনই, কিন্তু বছর কয়েক বাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে যখন তাঁরা দেখলেন যে আমি একটি মেয়ের সঙ্গে দিন কাটাই, বিশেষ করে শারীরিকভাবে, তখন ওঁরা সেটাকে যেন মেনে নিতে পারেন নি।

সেদিনের ঐ ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি আমার বয়-ফ্রেণ্ডকে কিছু জানাইনি। আমার মনে হয়েছিল, এতে ওর কিছু করার নেই, এটা একান্ত ভাবেই আমার সমস্যা। আসলে আমি ওকে এমন কিছু বলতে চাইছিলাম না যে, "আমি গর্ভবতী, চলো আমরা বিয়ে করি।"

আসলে যে ব্যাপারটায় আমি সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হয়েছিলাম, তা হলো আমার টেনিস কেরিয়ার সম্পর্কে। কেননা ঐ সময়ে টেনিস ছিল আমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

টেনিসের প্রতি আমার এই নিবিড় ভালোবাসা এরও বেশ কয়েকবছর আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যখন আমার বয়েস ১৪-র কাছাকাছি।

হয়েছিল কি, একদিন পাহাড়ের ঢালু পথে আমি স্কি করছিলাম। স্কি করতে আমার দারুণ ভালো লাগত, এক এক সময় গতির সীমা ছাড়িয়ে যেতে এত আনন্দ হয়–কিন্তু সেদিন হঠাৎই, স্কি করতে করতে আমার মনে হল, যদি এইমুহূর্তে পড়ে গিয়ে আমার পা ভেঙে যায়, তাহলে কি হবে ? তাহলে তো আমার টেনিস কেরিয়ারটাই শেষ হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি গতি কমিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর থেকে আমি খুব ধীর গতিতে স্কি করি।

যাই হোক, আমার সেই যৌন অভিজ্ঞতার ব্যাপারটাই বলি। চেকোস্লোভাকিয়ায় গর্ভপাতের ব্যাপারে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কোনভাবেই উচ্ছ্বসিত হইনি, কেননা আমার মনে হয় প্রত্যেক নারীর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার নিজস্ব অধিকার আছে। প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে সমস্যাটা এসেছিল কুমারী-মাতা হওয়ার ক্ষেত্রে নয়, অন্যদিক দিয়ে। সমস্যাটা আমার কাছে এভাবে এসেছিল যে আমি গর্ভপাত করাবো না স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসব করব এবং সেক্ষেত্রে আমার টেনিস কেরিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত তো হবেই।

আমি সবসময়েই ভেবেছি যে একমাত্র আমিই আমার অধিকর্তা হবো চেকোস্লোভাকিয়ায় এ ভাবনা যার মাথায় গজায়, তাকে অনেক বাধা ডিঙোতে হয়। আমি আমার বিয়ের কথাও ভাবতাম। সন্তান কামনাও ছিল আমার-তবু তা সতেরো বছর বয়সে আমি চাইনি। সৌভাগ্যবশতঃ কয়েকদিন পরেই আমার মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হলো। এবং দেখা গেল, নাঃ চিন্তার কিছু নেই, সব ঠিক আছে।

কয়েকমাস বাদে আমি আমেরিকায় গেলাম এবং আমার এক বন্ধুকে পুরো ঘটনাটা বললাম। সে আমাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের কিছু ট্যাবলেট দিয়েছিল। কিন্তু তখন কোনও পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে মার্কিনী স্টাইলে আকছার যৌনমিলনের কোন তীব্র লিপ্সা আর আমার মধ্যে ছিল না। কয়েকদিন খেলাম, তারপর, ওগুলো খাওয়া বন্ধ করে দিলাম।

ক্রিস লয়েড ও মার্টিনা

আমি সবসময়েই ভেবেছি যে একমাত্র আমিই আমার অধিকর্তা হবো। চেকোস্লোভাকিয়ায় এ ভাবনা যার মাথায় গজায় তাকে অনেক বাধা ডিঙোতে হয়। আমি আমার বিয়ের কথাও ভাবতাম। সন্তান কামনাও ছিল আমার, তবু তা সতেরো বছর বয়সে আমি চাইনি।

এই মৈত্রী : জুডি নেলসন ও মার্টিনা

পরে আমার সেই ছেলেবন্ধুটির সঙ্গে বারকয়েক দেখা হয়েছিল। কিন্তু তখন আমি আমার ক্যারিয়ার নিয়ে এত ব্যস্ত, আর সেও তার নিজের ক্ষেত্রে, সম্পর্কটা আর জোড়া লাগল না। ওর এখন বিয়ে হয়ে গেছে। শুনেছি, চারটে বাচ্চাও নাকি আছে। আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম ঠিকই তবে অনেকটা ভাইয়ের মত যেন, আসলে তখন আমার অপেক্ষা করা উচিত ছিল, যাকে আমি প্রেমিকার মত ভালোবাসতে পারব তার জন্য। আমার বাবা সেই একুশ বছরের ব্যাপারটা ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু একুশ বছর কেন ? কেন আঠারো বা পঁচিশ নয় ?

যেকোন বিষয়ের উপর বয়সের সীমাটা খুব হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু এখন বুঝি, আমি যদি একটু পরিণত হতাম, আরো বেশি আবেগগতভাবে জড়িত হতে পারতাম প্রেমের ক্ষেত্রে, তাহলেই ভালো হত। কেন না যে কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ দুটো জিনিস খুব বড় ব্যাপার। আমার প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে আমি এইসব অনেককিছুই শিখেছিলাম।

যৌনজীবনের আর একটা দিক সম্পর্কে আমি আগে কিন্তু খুব বেশি ভাবিনি। জীবনের সেই সময়টাতেই স্কুলের কয়েকজন শিক্ষিকার প্রতি আমি আকৃষ্ট হতে শুরু করলাম। একটা অদ্ভুত টান অনুভব করতাম তাদের প্রতি। বিশেষ ভাবে আমার একজন অঙ্কের শিক্ষিকার প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল খুব বেশি। তিনি ছিলেন আমার মায়ের বন্ধু, ভালো অ্যাথলিট এবং সদাশয়া শিক্ষিকা। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতাম, তাঁর পিছনে পিছনে হাঁটতাম, সব কিছু ভুলে তাঁর খেলা দেখতাম, আর হাঁ করে কথা শুনতাম।

এগারো, বারো বা তেরো বছরের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষক বা শিক্ষিকার প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক। তাই তখন আমার এই ধরনের আকর্ষণকে অদ্ভুত কিছু ভাবিনি। তবে এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল, আমার নিজের বয়সের মেয়েদের প্রতি আমি কোন আকর্ষণই অনুভব করতাম না। আমার যত আকর্ষণ ছিল বেশি বয়সের মহিলাদের প্রতি।

আমার মানসিক গঠনে আমার বাবা-মার বিবাহবিচ্ছেদ কতটা প্রভাবিত করেছিল জানি না। আমার বাবা-মার যখন ডিভোর্স হয়, তখন আমার বয়েস বছর তিনেক হবে। মা বিয়ের আগে যেখানে থাকতেন, সেই বাড়িতে আমরা উঠে গিয়েছিলাম, আমাদের জানালা দিয়ে সরাসরি তাকালে একটা টেনিস কোর্ট দেখা যেত। ওটা ছিল আমার মা'র পারিবারিক এস্টেটের শেষ নিদর্শন। আমার বাবা মাঝেমধ্যে আসতেন, কিন্তু আমার যখন আটবছর বয়েস, তখন তিনি আসা একেবারেই বন্ধ করে দিলেন। তখন সে ব্যাপারে আমার কিছুই মনে হয়নি, কেননা একজন নতুন বাবা পেয়েছিলাম। তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন, আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন, টেনিস শেখাতেন, এবং তিনি আমাকে এত ভালোবাসতেন যে আমার প্রকৃত বাবার অভাব আমি কোনদিনই অনুভব করিনি।

আমার আসল বাবার মৃত্যুর খবর বেশ কিছুদিন পরে আমি জানতে পারি। আমি মাঝে মাঝে মাকে নানা প্রশ্ন জিগ্যেস করতাম। কথাপ্রসঙ্গে মা একদিন বললেন, "তোমার বাবা বছর কয়েক আগে মারা গেছেন। পেট অপারেশন হওয়ার সময় উনি মারা যান।"

বাবার মৃত্যু সম্পর্কে সত্য ঘটনাটা আমি জানতে পেরেছিলাম যখন আমার ২৩ বছর বয়স। তখন আমার বাবা-মা কয়েকমাসের জন্য আমার কাছে আমেরিকায় এসেছিলেন। লেখিকা রিটা মে ব্রাউনের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা শুনে ভীষণ বিচলিত হয়েছিলেন এবং তখনই ওঁরা সত্যি ঘটনা জানান আমাকে। তাঁরা ভেবেছিলেন আমার চরিত্রের এই যে একটা দোষ সেটা আমার ভবিষ্যতকে নষ্ট করে দেবে।

"তুমি অসুস্থ," আমার দ্বিতীয় বাবা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে মা'ও বলে বসলেন, "তুমি এত আবেগপ্রবণ! তোমার পরিণতিও হবে তোমার বাবার মতই।"

তারপর ওঁরা আমাকে সব কথা খুলে বলেছিলেন। আমার বাবা নাকি ছিলেন ভীষণ আবেগপ্রবণ মানুষ, কখনোই তার মেজাজ স্বাভাবিক থাকতো না। মানসিক এই বৈকল্যই তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল। অন্য এক মহিলাকে ভালোবেসে আমার বাবা ডিভোর্স করেছিলেন, তারপর তার পেট অপারেশন হয়েছিল। তাকে দেখতে হাসপাতালে এসে যখন ঐ মহিলা আমার বাবাকে জানিয়েছিলেন যে অন্য পুরুষের সঙ্গে তিনি চলে যাচ্ছেন, বাবা তা সহ্য করতে পারেননি, হাসপাতালেই আত্মহত্যা করেছিলেন। আমার মা-বাবা ভেবেছিলেন, আমিও হয়তো এমন কিছু করে বসবো। আমি শুধু ওঁদের বলেছিলাম, "এরকম কোন পরিকল্পনা আমার নেই।" তবে আমার মনে হয় মানুষকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে একধরনের হতাশ দৃষ্টিভঙ্গী আমি আমার আসল বাবার কাছ থেকে পেয়েছি।

আমিও আঘাত পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু তাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধুত্ববিচ্ছেদ ঘটেনি—আর আমার জীবনের কয়েকটা হতাশ দিকের জন্য, আমি কখনোই আত্মহত্যা করতে চাই না। বেশ বুড়ো বয়সেই আমি মরতে চাই। সেই সময়ের মধ্যে আমি কোন কলেজ ডিগ্রি পেতে চাই। আর কিছু টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হতে চাই, আর চাই একটা সন্তান।

একটু পেছন দিকে ফেরা যাক, আগে যা বলেছিলাম তার খেই ধরে। চেকোস্লোভাকিয়াতে কেউ আমাকে ছেলেদের সঙ্গে কখনই আইস-হকি, ফুটবল এইসব খেলতেও বাধা দেয়নি। কিন্তু আমেরিকায় ব্যাপারটাই যেন অন্যরকম। আমেরিকার লোকেদের ধারণা, যে মেয়ে খেলাধুলোয় ভাল, যৌনজীবনে তার পক্ষে সুখী হওয়া দূর অস্ত।

আসলে প্রচলিতভাবে নারী হওয়া মানেই তো পুরুষকে আনন্দ দেওয়ার ধারণাটা চলে আসে। তাই একজন নারীকে অ্যাথলিট ভাবলে তথাকথিত নারীত্ব ও তার সৌকুমার্যের অভাব থেকে যায়। কিন্তু ইদানীং লক্ষ্য করছি নারীত্বের প্রচলিত ধারণাটা বদলাচ্ছে। দর্শকরা একজন মহিলার খেলা দেখবে বলেই আসে, তাকে এখন আর সুন্দরী হওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে, কেউ যদি ভালো অ্যাথলিট হয়, সে একই সঙ্গে সম্পূর্ণ নারীও তো হতে পারে।

আমি অনেক মহিলাকে দেখেছি, যারা নিজের ইচ্ছামত কাজ করে। নিজেদের সম্পর্কে তারা

ন্যান্সি ও মার্টিনা

নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অর্থাৎ কিভাবে এবং কোথায় তারা বেঁচে থাকতে চায়, কিভাবে তারা সাজতে চায়, কি সিনেমা তারা দেখবে—এসব তারা নিজের ইচ্ছানুযায়ী ঠিক করে। তাদের জীবন পুরুষের নিয়ন্ত্রণে চলে না। এইরকম মহিলাদের সঙ্গে আমি অনেক খোলামেলা বোধ করতাম। এইরকম মহিলারা সকলেই অবশ্য আর্থিক ক্ষেত্রে স্বয়ংনির্ভর। কিন্তু এই ধরনের সব মহিলারাই তো আর সমকামী নন। ব্যাপারটা কি অত সহজ সিদ্ধান্তের! যাই হোক, আমি ক্রমশঃ বুঝতে পারছিলাম সামাজিক, আবেগগত, বৌদ্ধিক বা যৌনতা, যে ক্ষেত্রেই হোক, মহিলাদের প্রতিই আমার আকর্ষণ সর্বাধিক।

আগেই বলেছি, ছেলেবেলাতেই কয়েকজন শিক্ষিকার সঙ্গ আমার ভালো লাগতো, তাদের সম্পর্কে সবকিছু আমি জানতে চাইতাম। তাদের নারীজীবনের বিভিন্ন গোপন দিক আমাকে আকর্ষণ করতো। পুরুষদের সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য ছিল খুবই কম।

এই মার্কিন দেশে কিন্তু সমকামী হওয়াটা আমার কাছে কখনোই অদ্ভুত কিছু মনে হয়নি। চেকোস্লোভাকিয়ায় ব্যাপারটা অবশ্য অন্যরকম। সমকামী হওয়ার জন্য কাউকে সেখানে স্যানিটোরিয়ামে রেখে দিতে পারে পাগল ব'লে। কিন্তু আমেরিকায় তো এটা কোন অপরাধই নয়। এমনকি আমি যখন সমকামীতা সম্বন্ধে ভেবেছি, তখনও কোনভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইনি, নিজেকে অদ্ভুত কিছু মনেও হয়নি আমার। অন্যদিকে ১৭ বছর বয়সে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আমার সেই প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা, পুরুষদের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আমাকে নিরুৎসাহ করেছিল।

আমার এই দ্বিতীয় যৌনজীবন শুরু হয়েছিল একজন বয়স্কা মহিলার অনুপ্রেরণাতেই। আমেরিকায়ই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। প্রথমদিকে আমার মধ্যে এক ধরনের লজ্জাভাব ছিল, যার ফলে তিনি আমার প্রতি যেসব ইঙ্গিত করতেন, তা বুঝতে হয়ত একটু সময় লেগেছিল। শেষে একদিন সেই মহিলা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আর ঠিক এখান থেকেই ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেল। সেই অবস্থায়, মহিলার সঙ্গসুখে আমি ভীষণ হাল্কা আর সুখী বোধ করেছিলাম। তারপর সম্পর্কটা আরও নিবিড় হল। একদিন সকালে, কি যে হল, আমি অদ্ভুতভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম মহিলার প্রতি। তাকে আমি এমনভাবে ভালোবেসে ফেলেছিলাম, যেরকমটা ঠিক গল্পের বইতেই ঘটে থাকে সচরাচর।

ঐ সময়ে যদিও খুব কম লোকই জানত আমার এই দ্বিতীয় যৌন-জীবনের ব্যাপারটা, তবু আমার কখনো মনে হয়নি যে এতে করে আমার ইমেজের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দেবে। সারা বিশ্বে তখন আমি মহিলা টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে সাফল্যের পথে এগোচ্ছি, তাই আমি কখনো কল্পনাই করিনি যে আমার যৌনতার বিষয়টা কারুর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে। কেননা এ ব্যাপারটা তো একেবারেই আমার নিজস্ব। অন্যদিকে আমার কোন ধারণাও ছিল না, বিখ্যাত হতে কেমন লাগে।

আসলে আমি চেয়েছি কোন রেস্তোরাঁয় বসে থাকার সময়, প্রিয় কাউকে আমার বাহুঘেরে জড়িয়ে ধরবো এবং সেটাই তো আমার ব্যক্তিগত জীবন, যা নিয়ে কোনরকম চেঁচামেচি হওয়াটা অসঙ্গত। অথচ দেখেছি প্রতিবারই ব্যাপারগুলো কিভাবে যেন জনসমাজের গুঞ্জনে পরিণত হয়ে যায়।

আমেরিকায় আমার এই ধরনের প্রথম সম্পর্ক থেকেই আমি একান্তে থাকতে চেয়েছি, কিন্তু আমি যা নই, সেইরকম কোন ভান করা আমার কাছে ভীষণ অসহ্য। একবার কেউ বলেছিল "সমাজ এ-ব্যাপারগুলো মেনে নিতে পারে না।" আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "আরে, আমরাও তো সমাজ, নাকি।"

প্রথম সেই সম্পর্ক ছ'মাসের মত টিঁকেছিল। তারপর ঐ মহিলার সিদ্ধান্তেই ব্যাপারটা ভেঙে যায়। অদ্ভুতভাবে আমিও ভেঙে পড়ছিলাম। আমরা যখন একসঙ্গে থাকতাম, তখন আমার মনে হতো, দুজনে মিলে কোন দ্বীপে চলে যাই, সেখানে সারাজীবন সুখে থাকবো। কিন্তু সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাবার পরও আমার সেই দ্বীপে চলে যেতে ইচ্ছে হতো, মনে হতো, সারাজীবন সেখানে লুকিয়েই থাকবো।

আঘাতটা আমি কাটিয়ে উঠেছিলাম। যদিও এর জন্য বেশ কয়েকটা টুর্নামেন্ট আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে, কেননা মানসিক একটা ক্লান্তি নিয়ে সেই টুর্নামেন্টগুলোতে আমি খেলেছিলাম।

গত বছরগুলিতে খেলাধুলোর জগতে মেয়েদের সমকামীতা সম্পর্কে খোশগল্প ভীষণভাবে ছড়িয়েছে। আমি এমন খবরও শুনেছি যে, কমবয়েসী মেয়ে খেলোয়াড়দের মায়েরা নাকি ভীষণ ভীত হয়ে পড়েছেন এবং লকার রুম পর্যন্ত তারা মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। এটা কিন্তু একধরনের বাড়াবাড়ি।

একমাত্র মা, যাকে আমি লকার রুমে দেখেছিলাম, তিনি হচ্ছেন মিসেস অস্টিন আর তখন ট্রেসি তার অন্তর্বাস পরে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিল। এটা জানা দরকার যে, কোন মেয়ে যদি সমকামী হয়, তবে ব্যাপারটা কখনোই লকার রুমে ঘটে না। কারণ বেশির ভাগ লকার রুমেই লকারগুলো খোলা থাকে এবং আমরা অনেকে পরস্পরের সামনেই পোষাক বদল করি। কখনো কখনো সেই খোলামেলা জায়গাতেই তো প্রশিক্ষকরা আমাদের ম্যাসেজ করে দেন। লকারে কখনোই মেয়েদের যৌন ইচ্ছাটা বদলে যায় না। আর খেলাধুলোর জগতে মেয়ে সমকামীদের সংখ্যা অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় মোটেই বেশি নয়। পুরুষদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সত্যি। আসলে সমকামীতার ব্যাপারে পুরুষরা অনেক উচ্ছৃঙ্খল। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে একটা শালীনতাবোধ থাকেই।

আমার আমেরিকান নাগরিকতার প্রসঙ্গে আসি। আমেরিকান নাগরিকতা পাওয়ার জন্য আমি উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম। তাঁরা এব্যাপারে আমাকে লস এঞ্জেলসে দরখাস্ত করতে বলেছিলেন, কেননা সেখানে নাগরিকতা পাওয়ার আইনকানুনের দিকটা একটু ঢিলেঢালা। তো এ ব্যাপারে যে শুনানির মুখোমুখি আমাকে হতে হয়েছিল, সেখানে প্রথমেই আমাকে ইংরেজিতে একটি সরল বাক্য লিখতে বলা হয়। আমি লিখেছিলাম: 'দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া বেশ সুন্দর।' ওরা খুশী হয়েছিলেন। একজন মহিলা অফিসার আমাকে জিগ্যেস করছিলেন, আমার নামে কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কিনা বা আমি ড্রাগ অ্যাডিক্ট কিনা। আমি সংক্ষেপে বললাম, 'না:।' তারপরেই আমার যৌনতা সম্পর্কে জিগ্যেস করেছিলেন ওরা। আমার উত্তর ছিল, "আমি উভকামী।" এরপর সপ্তাহ পাঁচেক কেটে গেল। তারপর একদিন আমার উকিল এসে জানালেন, আমি নাগরিকতা পেয়ে গেছি। দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম আমি। মনে হয়েছিল, এও আমার স্বদেশ।

আমি সবসময়েই ভেবেছি যে নিজের দায়িত্ব নিতে আমি সক্ষম। অন্যদিকে যতই বয়স বাড়ছে আমার, ততই মৃত্যু সম্পর্কে এক ভাবনা পেয়ে বসছে। একা হতে বড় ভয় করে আমার। অথচ এখন তো আমি একা একাই থাকি হোটেলে বা নিউইয়র্কে আমার অ্যাপার্টমেন্টে। লোকজন আমাকে মাঝে মাঝেই জিগ্যেস করে, কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবার পর আমি কি করবো। সত্যিই একথা চিন্তা করে আগে আমি মুষড়ে পড়তাম, যখন ভাগ্য আমার খারাপ যাচ্ছিল, কিন্তু এখন এরকম কোন ভাবনাকে আমি পাত্তা দিই না। বছর কয়েক আগে আমি "মার্টিনা ইয়ুথ ফাউণ্ডেসন" তৈরি করেছিলাম। এই সংস্থা থেকে অনাথ আশ্রম বা গরীব ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে। টেনিস খেলা যখন আমি বন্ধ করবো, তখন এই ফাউণ্ডেসনের জন্যই আরো অনেক বেশি সময় উৎসর্গ করবো আমি।

এখন আমার বয়স ২৯; ৪০ বছর পর্যন্ত তো টেনিস খেলবই। হয়ত পরে শুধু অভ্যেস রক্ষার জন্য খেলব। কিন্তু সবচেয়ে বড়কথা উইম্বলডনে খেলা। উইম্বলডনে খেলতে আমার সবসময়েই ভালো লাগে, আর আমি সেখানে সবচেয়ে ভালো মেজাজে থাকবার চেষ্টা করি। কেননা উইম্বলডন তো বিশ্বের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট। আমি যখন ছোট্ট ছিলাম, তখন থেকেই আমার বাবা মা স্বপ্ন দেখতেন আমি একদিন উইম্বলডনে খেলব। ন বছর বয়সে আমি উইম্বলডন বিজয়ী বিলি জিন কিংকে টেলিভিসনে দেখেছিলাম। আর তখন থেকেই ভাবতাম, একদিন আমিও উইম্বলডনে জিতব। তাই টেনিসকোর্টে বিরুদ্ধ পক্ষকে আমার সবসময়েই ভালো লেগেছে। কেননা যে কোন ক্ষেত্রে বিরোধীর অস্তিত্ব ছাড়া তো আমরা জয়ী হতেই পারি না।

কায়াকল্প

‘কায়াকল্প’ শব্দটি একটি আশ্চর্য সাপের সঙ্গে জড়িত। এই সাপের কামড়ে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল—নব্বুই বছরের জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ তাঁর হৃত যৌবন ফিরে পেয়েছিলেন। কায়াকল্পের পদ্ধতি বিষয়ে অনেক পুরোনো পুঁথিও রয়েছে। লেখক পণ্ডিত ত্রিলোকীনাথ ‘আজম’ তাঁর চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এখানে ঘটনাটি বিবৃত করেছেন। তিনি বিশেষভাবে খ্যাত নাড়ি বিশেষজ্ঞ হিসেবে। যোধপুর, জয়পুর, ইদর, দ্বারভাঙ্গার রাজপরিবারগুলির তিনি চিকিৎসক ছিলেন। পাতিয়ালার ভূপেন্দ্র টিবিয়া কলেজের তিনি ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। অন্যদিকে সর্বভারত টিবিয়া কংগ্রেসের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। য়ুনানি চিকিৎসা বিষয়ে তার অনেকগুলি মূল্যবান বই রয়েছে। দিল্লি স্টেটস্ বোর্ড অফ্ মেডিসিনের তিনি একজন মনোনীত সদস্য।

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য

শুধুমাত্র সাপের কামড়েই কি নব্বুই বছরের জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ তার হৃত যৌবন ফিরে পেতে পারেন? অবিশ্বাস্য হলেও এমনটাই ঘটেছিল হিমাচল প্রদেশে।

১৯২৫ সালের কথা। আমি তখন সিমলায় দেশজ পদ্ধতিতে চিকিৎসা চালাই। পাহাড়িয়া বস্তির লোকজন তখন চিকিৎসার জন্য আমার কাছে প্রায়ই আসতেন। আমার পৃষ্ঠপোষক একুশজন দেশীয় রাজাদের মধ্যে রামপুর বুশারের মহারাজা স্যার পদম্ সিং তো আমার চিকিৎসার ব্যাপারে এতোই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে আমাকে তাঁর দরবারের চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। এই সময় থেকেই আমি মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবনের বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করি। তিব্বতের লামাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ আমাকে এই যৌবন পুনর্নবীকরণ বা সাধারণভাবে যা কায়াকল্প নামে পরিচিত সেই বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে প্রেরণা যোগায়। ঘটনাচক্রে সেই একই সময় আমার দিল্লির এক ডাক্তার বন্ধু রাজবৈদ্য আনন্দস্বামীও লুপ্ত যৌবন ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে অনুসন্ধান করছিলেন।

রাজবৈদ্যের ডাক্তারখানা ছিল কনট সার্কাসের মাদ্রাজ হোটেল ব্লকে। আমার সাময়িক দিল্লি প্রবাসে আমি সাধারণতঃ ঐ ডাক্তারখানার উপরের একটি ফ্ল্যাটে থাকতাম। সারা দিনের বেশিরভাগ সময়টাই তখন আমি ঐ ডাক্তারখানাতেই কাটাতাম। আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল কায়াকল্প। এই কায়াকল্পের পদ্ধতি বিষয়ক সেই পুনর্যৌবন লাভের পরশমণি লাভের জন্য আমরা পুরোনো অনেক ডাক্তারী পুঁথি পড়লাম।

১৯৩৯ সালের শীতকালে আকস্মিকভাবে আমরা এক অসাধারণ গুণী ব্যক্তির খোঁজ পেলাম, যিনি কায়াকল্পের ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রায় দেড়মাস যাবৎ আমরা তাঁকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে দেখাশোনা করি। তাঁর প্রতি অখণ্ড মনোযোগ এবং সেবা দেখে তিনি যারপরনাই খুশি হয়ে কায়াকল্প বিষয়ে তাঁর যা কিছু জ্ঞান তা আমাদের দিয়ে দিতে রাজী হয়ে যান।

নতুন যৌবন ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তাঁর যে পদ্ধতি ছিল, তা মূলতঃ জলপাইফলের উপর ভিত্তি করে। তাঁর মতে একটি বৃদ্ধ অলিভ গাছের গুঁড়িতে ফুটো করে তাতে জলপাইফল এনে ভরে দিতে হবে। এরপর সেই গাছে যে ফল হবে সেই ফলই কায়াকল্পের জন্য ব্যবহারের আদর্শ হিসেবে

বিবেচিত হবে। তিনি আমাদেরকে এই পদ্ধতি সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার সন্দেহাকুল মন এতে পুরোপুরি তৃপ্ত হয় নি।

একটি সার্থক পরীক্ষা:

অন্যবারের মতো আমি সেবারও শীতের ঠিক শেষে সিমলা যাত্রা করলাম। যখন আমি কয়েক মাস পরে আবার দিল্লিতে এলাম, জানতে পারলাম রাজবৈদ্য সেই অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিটির সঙ্গে বেনারস গেছেন। খোঁজখবর করে কিছুদিন পরে জানতে পারি তাঁরা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের উপরে এই কায়াকল্প পদ্ধতির প্রয়োগ করবেন। এর আগে তাঁরা তাঁদের এই অবিশ্বাস্য পরীক্ষাটি মহাত্মা গান্ধীর উপর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহাত্মাজী এধরনের একটি পরীক্ষার জন্যে গিনিপিগ হতে অস্বীকার করেন। মালব্যজীর উপর তাঁদের এই পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারটি তৎকালীন সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

এরপর মালব্যজীর যুবক ভাইপো কবি কৃষ্ণকান্ত মালব্য যখন কবিতা সম্পর্কিত এক সাহিত্য বাসরে সিমলায় আসেন, তখন তাঁকে আমি মালব্যজীর উপর যে কায়াকল্প পদ্ধতি চালানো হয় সে সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি আমাকে বলেন, "পরীক্ষাটিতে সত্যিই অবিশ্বাস্য ফলাফল হয়েছিল। মালব্যজীর নতুন দাঁত বের হতে শুরু করেছিল তাঁর রূপোলীচুলও কালো হতে শুরু হয়েছিল।" এই শুনে আমি রাজবৈদ্যের পদ্ধতির সার্থকতা সম্পর্কে পুনরায় নিশ্চিত হলাম। তাঁকে একটি অভিনন্দন বার্তাও পাঠিয়ে দিলাম।

এরপর আবার যখন আমি দিল্লি এলাম, তখন জানতে পারলাম মালব্যজীও সেখানেই আছেন। ফিরোজশাহ রোডে যেখানে তিনি ছিলেন, আমি সেখানে গেলাম। কৃষ্ণকান্ত আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মালব্যজী আমাকে বললেন যে, প্রথমে তিনি পুরোপুরিই যেন যৌবন ফিরে পাচ্ছিলেন। তাঁর জীবনীশক্তির বিকাশ ঘটছিল দারুণ রকম। কিন্তু পরে এমনভাবে উন্নতি বাধা পেলো যে তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন, এমনকি ঠিকঠাক নড়াচড়াও করতে পারতেন না। এ বিষয়টি এভাবে প্রকাশ হওয়ায় কায়াকল্প সম্পর্কে আমার বিশ্বাসে দারুণ রকম চিড় ধরলো।

মহারাজের আহ্বান:

এরপর এমন কিছু ঘটনা ঘটলো যাতে কায়াকল্প সম্পর্কে আমার চিড় খাওয়া আগ্রহ দারুণ রকম বেড়ে গেল। সেসময়ে একদিন রামপুর বুশারের মহারাজের কাছ থেকে জরুরী তার পেলাম, তাঁর দরবারে হাজির হতে। সেই সময় সিমলা এবং রামপুর বুশারের মধ্যে মোটর চলাচলের যোগ্য কোন রাস্তাই ছিল না। তিনদিনের পুরো যাত্রাটাই আমাকে ঘোড়ার পিঠে কাটাতে হলো।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় আমি শতদ্রু'র অপর পারে নায়োলা গ্রামে পৌঁছুলাম। এখানকার স্থানীয় ব্যবসায়ী আমার বন্ধু গোপালদাস আগরওয়ালা আমাকে তাঁর বাড়ীতে রাত্রিবাসের জন্য অনুরোধ করতে এসেছিলেন। আমাদের কথাবার্তার ফাঁকে তিনি আমাকে জানালেন যে বাউন্টা নামের এক নব্বুই বছরের কৃষকের মৃতদেহ এখন ঐ গ্রামের এক সাধুর জিম্মায় আছে। সাধু নাকি বলছেন বাউন্টাকে তিনি বাঁচিয়ে তুলবেন। বাঁচানোই শুধু নয়, তার হারানো যৌবনও তিনি ফিরিয়ে দেবেন।

গোপালদাস আমাকে সেই সাধুর কাছে নিয়ে গেলেন। আমি একজন চিকিৎসক জেনে সাধু তক্ষুনি আমাকে সেই কৃষকের মৃতদেহ দেখবার অনুমতি দিলেন। পরীক্ষা করে বুঝলাম অন্ততঃ তিরিশ ঘন্টা আগে তার মৃত্যু হয়েছে। আরো পচন এবং ক্ষয় থেকে বাঁচাতে আমি সেই সাধুকে মৃতদেহটি ফেরৎ দিতে বললাম। কিন্তু তিনি তাঁর বিশ্বাসে অনড় হয়ে থাকলেন।
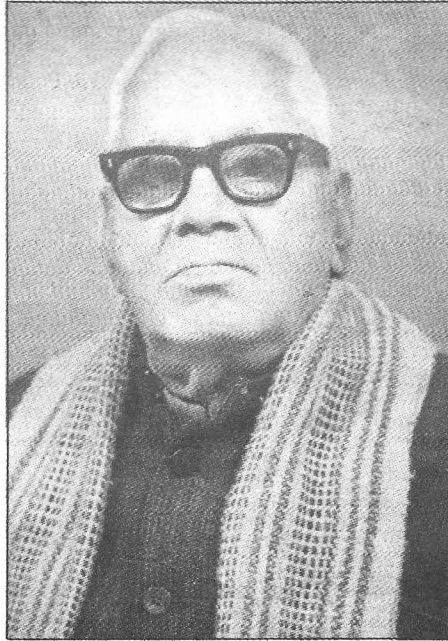
পণ্ডিত ত্রিলোকীনাথ 'আজম'

প্রায় চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে সাধু বললেন, "ঠিক আটদিন পরে আসুন, নিজের চোখেই দেখবেন আশ্চর্য ঘটনা। এসে দেখবেন এই মৃত পচাগলা শরীর শুধু যে বেঁচে ফিরে এসেছে তাই নয়, তার কোঁচকানো, ফাটা চামড়া, ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত এবং রূপোলী চুলও নেই। তিনি এক উজ্জীবিত মানুষ হয়ে উঠবেন। কারণ তাকে যে সাপ কামড়েছে তার নাম কায়াকল্প। ঠিক আট দিনের মাথায় আসুন, নিজেই দেখতে পাবেন।" তারপর তিনি একটি গভীর গর্তে গোবরের মধ্যে মৃত শরীরটি রাখলেন।

অসম্ভবও সম্ভব হয়:

পরের দিন আমি রামপুর বুশারে পৌঁছে মহারাজা পদম সিংকে ঘটনাটা বললাম। মহারাজা আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন যে এ ধরনের সাপের অস্তিত্ব তার অঞ্চলে কানের্থি জঙ্গলে আছে। তিনি আমাকে আরও বললেন যে প্রায় চল্লিশ বছর আগে সাপের কামড়ে মৃত একজন মানুষ একইরকমভাবে পুনর্জীবিত হয়েছিলেন। এইকথা শুনে সাধুর কাজকর্ম সম্পর্কে আমার সব সন্দেহ ধীরে ধীরে কৌতূহলে পরিণত হলো।

আট দিনের দিন আমি নায়োলায় ফিরে এসে দেখলাম সেই গর্তের চর্তুদিকে বিপুল জনতা গভীর আগ্রহের সঙ্গে সেই বৃদ্ধের পুনর্জীবনের আশায় অপেক্ষা করছেন। সাধু সেই বিশাল জনতার দিকে চেয়ে একটা আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে সেই গোবর ভর্তি গর্ত থেকে শরীরটি বার করলেন। এরপর শতদ্রুর জল দিয়ে ভাল করে শরীরটা ধুলেন। তারপর তিনি চামড়া এবং চুল ছাড়িয়ে নিলেন। এইসব করে তিনি সেই মাংসস্তূপকে ভালো করে বস্ত্র দিয়ে জড়িয়ে দিলেন।

এরপর সাধু হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে ডাকলেন এবং সেই নরম মাংস স্তূপকে লক্ষ করতে বল্লেন। আমি সেই বৃদ্ধ মানুষটির চোখে জীবনের চিহ্ন দেখে চমকে উঠলাম। তাঁর ঠোঁট এবং নাসারন্ধ্র খুব গভীর ভাবে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করে আমি সেখানে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম খুঁজে পেলাম। আমি তার নাড়ীর স্পন্দনও খুঁজে পেলাম। সেই নাড়ী একেবারে সঠিক তালে চলছে। আমি সাধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, গোবর ব্যবহার করে সত্যিই এইভাবে স্বর্পাঘাতে মৃত মানুষকে বাঁচানো যায় কিনা? তিনি বল্লেন, "শুধু মাত্র কায়াকল্প সাপের কামড়েই এমন হয়।"

আমি সিমলা ফিরে এলাম কিন্তু এই আশ্চর্য রহস্যময় ঘটনাটি তারপর বেশ কিছুদিন আমার মনের মধ্যে বিরাট জায়গা জুড়ে রেখেছিল।

একমাস পর আবার আমি রামপুর বুশার গেলাম। আমার যাতায়াতের পথে গোপালদাস আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করে পুনর্জীবন প্রাপ্ত সেই বাউন্টার কথা জিজ্ঞেস করলাম। সে আমাকে বাউন্টার গ্রামে নিয়ে গিয়ে কর্ষণরত এক বলিষ্ঠ যুবককে দেখালেন। হেসে তিনি বল্লেন, "এই হল বাউন্টা" আমি বাউন্টার সঙ্গে কথা বলে এবং দেখে বুঝলাম তিনি মানসিক এবং শারিরীক ভাবে পুরোপুরি সুস্থ। তাঁর পুত্র এবং নাতি-নাতনিদের তাঁর থেকে বেশী বৃদ্ধ দেখাচ্ছিলো।

সাপের খোঁজে:

গোপালদাস আমায় জানাল যে, সাধু এখনও কায়াকল্প সাপের খোঁজে আছেন, কিন্তু খুঁজে বার করতে পারেন নি। এই ঘটনার কয়েকবছর পর আমি দিল্লিতে পাকাপাকি ভাবে বাস করার জন্য আসি এবং রামপুর বুশারে যাবার কোন সুযোগ পাই নি। ভগবানই একমাত্র জানেন, সাধু তার ঈপ্সিত কায়াকল্প সাপ খুঁজে পেয়েছেন কিনা অথবা এখনও জীবিত না মৃত? কিন্তু এই ঘটনার পর কায়াকল্প বিষয়ে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে। আমি নিশ্চিত, যদি কেউ এই বিষয়ে সত্যিই মনোযোগের সঙ্গে গবেষণা করেন, তবে তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবেই।

চৈত্রমাসের বিকেল, তিলজলা বস্তির 'বেঙ্গল সার্ভিস সোসাইটি'র হাসপাতালে রোগীর ভিড় উপচে পড়ছে। ডাক্তাররা ব্যস্ত হয়ে একেকজন রোগীকে দেখছেন। এইসব রোগীদের পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করানর সামর্থ নেই, তাই দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে এইখানে। প্রতিদিন আশি জন রোগী দেখার নিয়ম। ব্যস্ত ডাক্তার চক্রবর্তী একটানা সাতচল্লিশজন রোগী দেখে ক্লান্ত। আটচল্লিশ নম্বর পেশেন্টের অবস্থা সিরিয়স, স্কুটার দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছে লোক। মাথা দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। ডঃ চক্রবর্তী কপালের ঘাম মুছে দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন আহত লোকটির কাছে। ঠিক তক্ষুনি ডাক্তারের ঘরে
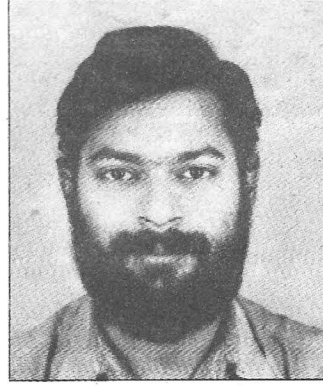
ডাক্তার সুব্রত চক্রবর্তী

'তার দরকার নেই, আমরা বলছি এটাই আমাদের পরিচয়।'

'আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে? কি অভিযোগ? আমি কি কোন অপরাধ করেছি? যদি করে থাকি, তাহলে আমাকে গ্রেপ্তার করার আগে আপনাদের তো আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা জানাতে হবে

ডঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথাবার্তার সময় অপেক্ষমান রোগীরা এসে রিভলবার হাতে লোকগুলিকে ঘিরে দাঁড়াল।

বিছানায় শুয়ে স্কুটার দুর্ঘটনায় আহত রক্তাপ্লুত লোকটি তখন ছটফট করছে যন্ত্রণায়। ডঃ চক্রবর্তী বললেন, 'আপনারা পুলিশ হোন, অর

পি জি হাসপাতালে নকশাল ডাক্তার?

আচমকা গোয়েন্দা পুলিশ তুলে নিয়ে গেল ডাঃ সুব্রত চক্রবর্তীকে। সত্যিই কি তিনি নকশাল খতম বাহিনীর সমর্থক? কেন জুনিয়ার ডাক্তার ফেডারেশন আজ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন? বাম সরকারের সঙ্গে এদের বিরোধ কি? জুনিয়ার ডাক্তারদের নিয়ে এক চলমান বিতর্কের প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয়েছে 'আলোকপাত'-এর প্রতিনিধি দীপঙ্কর রায়ের এই অন্তর্তদন্তে।

কয়েকজন লোক ঢুকে পড়ল হুড়মুড় করে। তাদের হাতে উদ্যত রিভলবার।

ডঃ চক্রবর্তী অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। স্বভাবসুলভ বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন 'কে আপনারা? কাকে খোঁজ করছেন?'

'ডঃ সুব্রত চক্রবর্তীকে খুঁজছি।'

'আমিই সুব্রত, বলুন কি বলবেন?'

'আমাদের সঙ্গে চলুন, বাইরে জিপ অপেক্ষা করছে।'

'কিন্তু আপনারা কারা? আমি এই আহত রোগীকে ছেড়ে আপনাদের সঙ্গে কোথায় যাব?'

'আমরা পুলিশ, সি.আই.ডি.র লোক। আপনাকে আর রোগী দেখতে হবে না। আমাদের সঙ্গে চলুন।'

আপনারা যে পুলিশ তার কোন প্রমাণ আছে? পরিচয়পত্র দেখান।'

ডাকাত হোন, আমাকে আমার ডিউটি করতে দিন, এই মরণাপন্ন রোগীকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না, আমাকে মেরে ফেললেও না আপনারা বসুন, এই রোগীটিকে ওষুধ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে তারপর কথা বলব।'

দু'জন লোক এবার এগিয়ে এল। ডঃ চক্রবর্তীর বুকের ওপর রিভলবার তুলে ধরে তারা ধমকের সুরে বলল, 'আপনার সঙ্গে বিতর্ক করার সময় আমাদের নেই, রোগী টোগীর কথা ছাড়ুন এক্ষুনি চলুন আমাদের সঙ্গে।

কথাগুলি বলে তারা ডঃ চক্রবর্তীর হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। ডঃ চক্রবর্তী উপস্থিত রোগীদের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বললেন, 'আমার এ অবস্থায় কিছু করার নেই, এরা কারা, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানি না, যদি বেঁচে ফিরি, তাহলে আপনাদের সকলের

ডাক্তার সুব্রত চক্রবর্তীর মুক্তির দাবীতে সারা বাংলা জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশনের সদস্যরা আলিপুর কোর্টে বিক্ষোভ জানাচ্ছেন ছবি: দেব কুমার
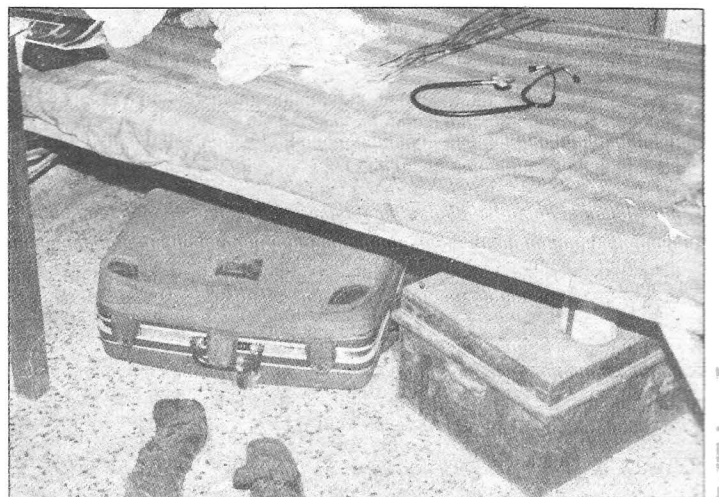
পি. জি. হাসপাতালের হাউসস্টাফ কোয়ার্টারে সুব্রত চক্রবর্তীর ঘর, গ্রেপ্তার হবার পর তছনছ অবস্থায় ছবি: প্রদীপ গুপ্ত

চিকিৎসা আমি করব ।'

ডঃ চক্রবর্তীকে গাড়িতে তুলে অপরিচিত সশস্ত্র লোকগুলি সোজা গাড়ি চালিয়ে দিল টালিগঞ্জের দিকে ।

টালিগঞ্জের ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর উল্টোদিকে 'রিট্রিট' নামে বাড়িটার ভেতর ঢুকে গেল গাড়িটা। এটাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অফিস ।

লোকগুলো ডঃ চক্রবর্তীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল থানা লকাপের দিকে ।

লকাপের ভিতর সুব্রতকে ঢুকিয়ে দিয়ে একজন ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'আমার নাম, হরিসাধন ভট্টাচার্য । তোমার মত ছেলেকে শায়েস্তা করতে হয় কিভাবে আমি জানি ।'

সুব্রত কিছু বুঝতে না পেরে নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দা অফিসার হরিসাধনবাবুর দিকে ।

হরিসাধন লকাপের ভেতর তাকিয়ে দেখলেন আরও সাত আটজন আসামী রয়েছে । তাদের বললেন, 'তোরা এই ডাক্তারকে দলাই-মলাই কর।'

হরিসাধন কথাটা বলে উপরে চলে যেতেই সাত আটজন কয়েদী ঝাঁপিয়ে পড়ল সুব্রতর উপর। চালাতে লাগল অকথ্য অত্যাচার । রাত আটটা থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত চলল শারীরিক নির্যাতন। অবসন্ন হয়ে এল সুব্রতর শরীর । মেঝেতে পড়ে গেলেন তিনি ।

হঠাৎ শেষরাতে দু'জন রক্ষী লকাপের ভিতর ঢুকে আবার টেনে তুলল সুব্রতকে। সি.আই.ডি. অফিসার রজত মজুমদার টেবিলের উপর পা তুলে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে ছিলেন। রক্ষীরা সুব্রতকে এনে দাঁড় করিয়ে দিতেই রজতবাবু বললেন,'এ্যাম সরি ডাক্তার, আমি আপনার মুখের সামনে থেকে পা'টা নামিয়ে নিতে পারছি না । এ্যাম টায়ার্ড । য়ু ক্যান মিট' ।

বিপর্যস্ত সুব্রত এসবের অর্থ বুঝতে পারছিলেন না । তিনি রজতবাবুর উল্টো দিকের চেয়ারে বসলেন । রজতবাবু সুব্রতর মুখের দিকে পা তুলে বসে আছেন । কয়েক মিনিট এইভাবে নীরবে কেটে গেল । একটু পরে রজতবাবু বললেন, 'বল, ডাক্তার, তুমি কি বলবে ।'

সুব্রত বললেন, 'আপনারা অনুগ্রহ করে বলুন কি শুনতে চান, আমি সহযোগিতা করব ।'

রজতবাবু গড় গড় করে মুখস্ত বলার মত কয়েকজনের নাম বলে গেলেন । তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এদের তুমি চেন ডাক্তার ?'

সুব্রতর মনে হল ওই তালিকার দু-তিনটে নাম তিনি জানেন । এত লোক শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে তার কোয়ার্টারে আসা যাওয়া করে যে তাঁকে হোস্টেল স্টুয়ার্টের কাছে চাবি রেখে যেতে হয়। কোন সময় সুব্রত ঘরে না থাকলে সেইসব লোকেরা স্টুয়ার্টের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে সুব্রতর ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করে । তারা যে সকলে অসুস্থ রোগী এমন নয়, নানারকম সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গেও অনেকে জড়িত । বিশেষত সুব্রত সারাবাংলা জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশনের কলকাতা শাখার অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি। তাই ফেডারেশনের কাজকর্মের জন্যে অনেক ডাক্তার সহকর্মীও আসে অনেক দূর মফঃস্বল থেকে । যদিও ফেডারেশনের অনেক সদস্যকেও গোয়েন্দাপুলিস নকশাল সমর্থক বলে মনে করে । রজতবাবুর দেওয়া নামগুলোর মধ্যে দু' তিনটে নাম যেন একটু পরিচিত মনে হল সুব্রতর। কিন্তু তারা যে কারা ঠিক মনে করতে পারলেন না তিনি । তবু রজতবাবুর কথার উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, দু'তিনজনের নাম পরিচিত ।'

রজত মজুমদার বললেন, 'তাদের আসল নাম কি ?'

'জানি না ।'

'ঠিকানা ?'

'তাও জানি না ।'

'তাহলে নামটা পরিচিত হল কি করে ?'

'ওরা মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত ।'

'কি জন্যে ?'

'শরীর চেক আপ করাতে ।'

রজতবাবু এবার ড্রয়ার খুলে কয়েক কপি 'দেশব্রতী' পত্রিকা বের করে টেবিলে রেখে বললেন, 'এই পত্রিকাগুলো কোথা থেকে ছাপা হয় ?'

'জানি না ।'

এরপর আর কোন কথা হল না । রজতবাবু রক্ষীকে ডেকে বললেন, 'একে লকাপে নিয়ে যাও ।'

পরিদিন ডাঃ সুব্রত চক্রবর্তীকে পুলিশের জিপে তুলে 'ভবানীভবনে' নিয়ে আসা হল ।

ভবানীভবনে সি.আই.ডি অফিসে একটা ঘরে সুব্রতকে বসিয়ে তাকে ঘিরে পাঁচ ছ'জন পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করতে লাগলেন । সুব্রত এসবের কোন মানে খুঁজে পাচ্ছিলেন না । অধিকাংশই নকশালপন্থা সম্পর্কিত প্রশ্ন । তাঁর মনে হল তিনি যেন স্বয়ং চারু মজুমদার বা ওই ধরনের কোন নকশাল নেতা, ডাক্তার সুব্রত চক্রবর্তী তিনি নন ।

সুব্রতর কাছে কিছু জানতে না পেরে রেগে যাচ্ছিলেন রজত মজুমদার । এইদিন কোর্টে নিয়ে যাবার কথা । সাড়ে বারটা বাজে । রজতবাবু সুব্রতকে একটা জিপে তুলে আলিপুর পুলিশ কোর্টের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে বেলা দুটো নাগাদ আদালতে গিয়ে বলে এলেন, সুব্রতর পক্ষে কোন আইনজীবী নেই, সুতরাং তাকে পুলিশ হেফাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হোক ।

এস.ডি.জে.এম., জে.এন.রায় সুব্রতকে দশ দিনের মধ্যে পুলিশ হেফাজতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন ।

চব্বিশ তারিখ তিলজলার হাসপাতাল থেকে ডাক্তার সুব্রত চক্রবর্তীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে এই খবরটা এস.এস.কে.এম. হাসপাতালে বাতাসে ভেসে এল । হাসপাতালে অপেক্ষমান কয়েকজন রোগী এসে এস.এস.কে.এম.এর হাউস স্টাফ কোয়ার্টারে খবরটা জানিয়ে গেল ।

পরের দিন সুব্রতর ঘনিষ্ট বন্ধু হাউস স্টাফ কুশল মিশ্র, সুমিত দে, অসীম জীবন বসু, সঞ্জীব নন্দী, নিলয় সিন্‌হা আর দেবপ্রিয় মল্লিক আলিপুর পুলিশকোর্টে এসে সুব্রতর সন্ধান করলেন । জানতে পারলেন জে.এন. রায় সুব্রতকে পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে । তাঁরা ফিরে এলেন তাঁদের কোয়ার্টারে ।

ছাব্বিশ তারিখ রাত্রে এস.এস.কে.এম হাসপাতালের হাউস স্টাফ কোয়ার্টারে সকলে ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ ডাক্তার কুশল মিত্র দরজা খুলে বাইরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে পড়ল করিডোরে কয়েকটা ছায়ামূর্তি যেন পায়চারি করছে। আর ১১২ নম্বর ঘরের তালা খোলার চেষ্টা করছে দু'জন লোক ।

১১২ নম্বর ঘরে থাকতেন ডাক্তার অমিত গুহ । সে রাতে তিনি ঘরের চাবিটা স্টুয়ার্টের কাছে জমা রেখে বাড়ি গিয়েছিলেন । বন্ধ ঘরের তালা খোলার চেষ্টা করছে কয়েকজন অপরিচিত লোক ।

ডাক্তার মিত্র বলে উঠলেন, 'কে ? কে ওখানে ?'

ডাকাডাকিতে আরও কয়েকজন ডাক্তার নিজেদের ঘরের দরোজা খুলে বেরিয়ে এলেন । করিডোরে আলো জ্বলে উঠল মুহূর্তের মধ্যে ।

উপস্থিত ছায়ামূর্তিগুলো বলল, 'আমরা পুলিশ সি.আই.ডি. । ১১২ নম্বর ঘর সার্চ করব ।'

ডঃ মিত্র বললেন, 'আপনাদের আইডেনটিটি কার্ড দেখি, সার্চ ওয়ারেন্ট দেখি ।'

লোকগুলো বলল, 'আমরা সিঃআই.ডি। আমাদের কোন পরিচয়পত্র লাগে না, সার্চ ওয়ারেন্ট লাগে না ।'

কথা বলতে বলতেই তারা ১১২ নম্বর ঘর খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। কুশল মিত্র ছুটে গেলেন। বন্ধু অসীমজীবন, সুমিত, নিলয়, সঞ্জীবকে ডেকে আনলেন । কিন্তু ততক্ষণে সার্চ শেষ । চলে গেছে লোকগুলি । তাঁরা ঘরে ঢুকে দেখলেন গোটা ঘর তছনছ হয়ে গেছে । হারিয়ে গেছে কতগুলো মূল্যবান ডাক্তারি বই ।

কুশল আর অসীমজীবন ছুটে গিয়ে স্টুয়ার্টকে জানালেন সব কথা । তিনি বলেন, 'আমি কাউকে চাবি দিইনি' । তখন তারা সেই রাত্রেই হাসপাতালের সুপারকে সব ঘটনা জানালেন । সুপার বললেন, 'আপনারা আগামীকাল দুপুরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন ।'

পরদিন সাতাশে মার্চ কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হাউস স্টাফ ইন্টারগীজ ডাক্তাররা পুলিশের এই জুলুমের প্রতিবাদে ধর্মঘট ডাকল । এস.এস.কে.এম. হাসপাতালের হাউস স্টাফেরা সুপারকে লিখিত মেমোরাণ্ডাম দিলেন, মেমোরাণ্ডামে বলা হল—১। রাতে হাউসস্টাফ কোয়ার্টারে কারা এসেছিল তাদের খুঁজে বের করতে হবে । ২। যদি তারা পুলিশ হয়, তাহলে বেআইনি অনুপ্রবেশের জন্যে তাদের শাস্তি দিতে হবে, ৩। ১১২ নম্বর ঘরে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান বইগুলি ফেরত দিতে হবে, ৪। ডাঃ সুব্রত চক্রবর্তী কোথায় আছেন অবিলম্বে

জানাতে হবে।

কিন্তু এতসব করেও সারাদিনে সুব্রতর কোন খোঁজ পেলেন না ডাক্তাররা। সেইদিনই রাত্রে জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশনের জেনারেল বডির মিটিং ডেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন, এ ব্যাপারে দ্রুত কোন বিহিত না হলে ২৯ তারিখ এস.এস.কে.এম. হাসপাতালেও একদিনের ধর্মঘট করা হবে।

সাতাশ তারিখেই সুব্রতর বন্ধু ডাক্তার দেবপ্রিয় মল্লিক আলিপুর পুলিশ কোর্টে আইনজীবী তমাল কান্তি মুখার্জির শরণাপন্ন হয়ে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে এসেছিলেন। তমাল কান্তি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সহকারী আইনজীবীদের সাহায্যে ব্যাপারটি অনুসন্ধান করে জেনে গেলেন এস.ডি.জে.এম. জে.এন. রায়ের ঘরে সুব্রতর মামলা উঠেছিল পঁচিশ তারিখ। তিনি জে.এন.রায়কে জানালেন 'আমি সুব্রতর জামিনের জন্যে আবেদন করতে চাই।'

অনুমতি মিলল, উনত্রিশ তারিখ সুব্রতর জামিনের জন্যে আবেদন করা যাবে।

হাউস স্টাফরা তখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশের হাতে কুৎসিত ভাবে ডাক্তার নিগ্রহের প্রতিবাদে ক্রমশ: জুনিয়র ডাক্তাররা সংগঠিত হচ্ছেন। যে কোন দিন সারা পশ্চিম বাংলায় সমস্ত সরকারি হাসপাতাল অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে। চাপের মুখে পড়ে সাতাশ তারিখে ডি.আই.জি:-সি.আই.ডি: মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপারকে জানালেন উনত্রিশ তারিখে সুব্রতর সঙ্গে ডাক্তারদেরকে দেখা করতে দেওয়া হবে। টালিগঞ্জ রিট্রিটে লকাপে তাকে রাখা হয়েছে।

এই প্রথম সরকারিভাবে জানান হল সুব্রতকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আইনজীবী তমালকান্তি সেদিনেই তাঁর দু'জন সহকারী কৌঁসুলি রাধাকান্ত মুখার্জি এবং বিশ্বজিৎ বসুকে পাঠালেন টালিগঞ্জ রিট্রিটে সুব্রতকে দিয়ে ওকালতনামায় সই করিয়ে আনবার জন্যে

কিন্তু এস.এস.সি.আই.ডি. রজত মজুমদার আইনজীবীদের জানালেন, 'নো বডি সুড বি এ্যালাউড টু টক অর টেক ইন্সট্রাকশন ফ্রম দি পিটিশনার, ইভন এ লইয়ার।' রজত মজুমদার নিজেই ওকালতনামা নিয়ে গিয়ে সুব্রতকে দিয়ে সই করিয়ে আনলেন। কিন্তু আইনজীবীরা দেখলেন, সুব্রতর সই পুলিশ অফিসার এ্যাটেস্টেট না করেই ফেরত দিয়ে দিলেন।

উনত্রিশ তারিখে সুব্রতর কয়েকজন বন্ধু পাঁচদিন পর সুব্রতকে দেখতে গেলেন। তখন সুব্রতর স্বাস্থ্য এবং মনোবল ভেঙে পড়েছে।

উনত্রিশ তারিখ তমালবাবু বেলা দুটো নাগাদ সুব্রতর জামিনের আবেদন করলেন। আবেদনে তিনি আটটি কারণে সুব্রতকে জামিন দেবার আবেদন জানালেন। প্রথমত—সুব্রত চক্রবর্তী একজন সম্মানিত ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত—তিলজলা থেকে তাঁকে বেআইনী ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। তৃতীয়ত—সুব্রতর বিরুদ্ধে পুলিশ সেকশন ২২১ এ, ২০৯, ১২০ বি, ১২১, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩০২, ৩০৪, ৩২৬ ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৯(১০), সেকশন ৩৪ এর ২৫।২৭ অস্ত্র আইন সেকশন ২৭।৩৫০ প্রেস আইন প্রভৃতি অভিযোগ ছাড়াও কুচবিহার জেলে বন্দি ট্যারামাস্টার প্রভৃতি আসামীকে '৮৫ সালে পালাতে সাহায্য করা ও আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ করে। কিন্তু জেল থেকে নকশাল আসামী পালিয়ে যাওয়ার পর সাতমাস ধরে সুব্রত ডাক্তারি করেছে। তখন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেনি কেন? চতুর্থত—এই মামলার অন্যান্য আসামী জামিনে মুক্ত। পঞ্চমত—যাদবপুর থানা কেস নম্বর ৫(৮) মামলায় এফ.আই.আর.এ সুব্রতর নাম নেই। ষষ্ঠত—পুলিশ নির্দোষ ব্যক্তিকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। সপ্তমত—যেহেতু স্থায়ী ঠিকানা আছে, তাই তার পালাবার সম্ভাবনা নেই। অষ্টমত—পুলিশি তদন্ত প্রায় শেষ, এমতাবস্থায় আসামী সুব্রতকে আর হাজতে রাখার দরকার নেই।

জে.এন.রায় তমালবাবুর বক্তব্য শুনে সুব্রত চক্রবর্তীর জামিন না মঞ্জুর করলেন। তমালবাবুও জেলা জজ অবনীভূষণ সিন্হার কোর্টে আবেদন করলেন এবং হাজার টাকার জামিনে সুব্রতকে মুক্তি দিলেন এপ্রিল মাসের সাত তারিখ। সেদিন সরকার পক্ষ তমালবাবুর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেন নি। কেননা জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশন থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে এইদিনও সুব্রতর জামিন না হলে সারা বাংলা জুনিয়র ডাক্তাররা হাসপাতালে ধর্মঘট করবেন। ফলে তমালবাবু সহজেই সুব্রতর জামিন করাতে সক্ষম হলেন। এই মামলায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোন আসামীকে চার্জশীট দিতে পারে নি। মামলার পরবর্তী দিন ধার্য হয়েছে ২৩.৪.৮৬ তারিখে।

প্রকৃত পক্ষে ডাক্তার সুব্রত চক্রবর্তীকে গোয়েন্দা পুলিশ নকশাল পন্থীদের দ্বিতীয় কেন্দ্রিয় কমিটির সমর্থক বলে সন্দেহ করে। এই দ্বিতীয় কেন্দ্রিয় কমিটিই ১৯৮৩ সালে নদীয়ায় পাল্টা বিপ্লবী সরকার তৈরি করে এবং এরা এখনও খতম লাইনে বিশ্বাসী। কলকাতায় এই কমিটির কাজকর্ম করার অভিযোগ অনেক ডাক্তারের উপরে আছে।

সারা রাজ্য জুড়ে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন ডা: সুব্রত চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম বেলেঘাটার বিধান রায় পোলিও হাসপাতালে।

তিন তলার উপরে একটি বড় ঘরে আরও দু'জন সহ ডাক্তারের সঙ্গে থাকেন সুব্রতবাবু। পশ্চিম দিনাজপুরে পানিশালাহাট গ্রামের অধিবাসী প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক শ্রী রমণীকান্ত চক্রবর্তী এবং বাসনা চক্রবর্তীর পুত্র ডাক্তার সুব্রত চক্রবর্তী। সুব্রতরা চার ভাই-সুব্রত, সুদীপ্ত, সুচিন্ত এবং সুকান্ত, দু'বোন সুস্মিতা ও সুচিস্মিতা চক্রবর্তী। বোনদের কারুর বিয়ে হয়নি।

সুব্রতবাবু ঘরে ছিলেন না। এলেন সাড়ে দশটায়। আমাকে দেখে মিষ্টি হেসে বললেন, 'আমার অপারেশন থিয়েটারে একটা অপারেশন আছে, আর মা-বাবা খবরের কাগজ পড়ে নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা করছেন, আমি আজই একটু বাড়ি যাব, আপনাকে বেশিক্ষণ সময় দিতে পারব না, দু:খিত। তাছাড়া আমাদের ফেডারেশনের কাছে আমি দায়বদ্ধ যে ব্যক্তিগতভাবে আমারা কারুকে ইন্টারভ্যু দেব না। আর এটা সাবজুডিস ম্যাটার, আমার কোন স্টেটমেন্ট দেওয়াটা ঠিক নয়।

তারপর কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'আমি বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে বিশ্বাস করি। ভারতের কোন রাজনৈতিক দলকেই সমর্থন করি না, তবে প্রত্যেকটি দলেরই কিছু না কিছু ভাল কাজ থাকে, সেগুলোকে সমর্থন করি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'নকশাল মুভমেন্ট আপনি সমর্থন করেন?'

যে কোন মুভমেন্ট যদি কোন সিস্টেমকে পাল্টানর জন্য ভাল কিছু করতে চায়, সেটা যদি

পি.জি. হাসপাতালের সম্মুখভাগ — ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী

ভুল পথেও হয়, তবু সেটা যারা করেছে তাদের ডেডিকেশন আমি সমর্থন করি। নকশালরা যা করতে চেয়েছিল, সেটা যে ভাল কিছু, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, রাজীব গান্ধী', মোরারজী, ইন্দিরা, জ্যোতি বসু, অটলবিহারী, চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, চরণ সিং, জগজীবন রাম প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কাকে আপনি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করেন ?

সুব্রতর তৎক্ষণাৎ উত্তর, 'চারু মজুমদারের ডেডিকেশনের অভাব ছিল না। এই ডেডিকেশন আপনার তালিকায় বাকিদের কারুরই নেই।

প্রশ্ন করলাম, 'সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে অথবা বন্দুকের নলে কোন পদ্ধতিতে রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সম্ভব বলে আপনি মনে করেন ?'

'সংসদীয় পথে কোনদিনই সামাজিক পরিবর্তন আসেনি।'

'কখনও কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিতে হলে আপনি কোন পথ বেছে নেবেন ?'

'সেটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। আমার বর্তমান শ্রেণীগত অবস্থান যা, তাতে এসব কথা ভাবার প্রশ্নই ওঠে না।'

'পুলিশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে ?'

'না। পুলিশ আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ করেছে তাই জানি না। সুতরাং আমারও কোন অভিযোগ নেই।'

'বিয়ে করেছেন বা কাউকে ভালবাসেন ?'

'বিয়ে করিনি, তবে একটি মেয়েকে ভালবাসি। তার নামটা গোপন থাক। আসলে এটা সাবজুডিস ম্যাটার, আপনাকে যা যা বললাম, এগুলো যেন ছাপবেন না। সেটা মনে হয় বেআইনী হবে। এটা ঠিক কোন স্টেটমেন্ট বা সাক্ষাৎকার নয়, এমনি কথার পিঠে কথা বললাম মাত্র।

ডাক্তার সুব্রত চক্রবর্তী মামলার একটা গুরুত্বপূর্ণ পুরনো ইতিহাস আছে। ৩.৮.৮৫ তারিখে পুলিশ গণেশ কাষ্ঠ ও অন্যান্য পয়ত্রিশ জন আসামীর বিরুদ্ধে যাদবপুর থানার অন্তর্গত একটি খুনের মামলার এফ.আই. আর. দাখিল করে, যাদবপুর পি.এস. কেস নম্বর ৫ (৮) ৮৫ সেকশন ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭ আই.পি. সি. অনুসারে। পুলিশ সেদিনই ফরোয়ার্ডিং দেয়, অর্থাৎ একদিনেই কেসের ডেভলপমেন্ট বুঝে ফেলে ১২০ বি, ১২১, ১২১এ, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩০৪, ১০৯, ৩০২, ৩০৭, ৩২৬ আই.পি.সি. এবং ২৫।২৭ অস্ত্র আইন, এবং ৯।১০ ইন্ডিয়ান এক্সপ্লসিভস এ্যাক্ট ও ৩৫।২৭ প্রেস অবজেকশনেবল্ ম্যাটার এ্যাক্ট ৩৫০।২৭ ধারায় অভিযোগ দায়ের করে।

এই এফ-আই-আর এ গণেশ কাষ্ঠ কে, কোথায় থাকেন, কিছুই বলা হয়নি, এবং বাকি পঁয়ত্রিশজন আসামীকে ও পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে নি। এরপর পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং মাত্র ন'দিন পরে ১২.৮.৮৫ তারিখে পুলিশ ভোলানাথ শীট, অমিয় সরকার, অসীম সরকার, শ্যামল চক্রবর্তী, অনুপ গাঙ্গুলী, রানা গাঙ্গুলী, মানব বিশ্বাস, বুলু ব্যানার্জী ও শংকর দাসকে বজবজ অঞ্চলে একটি বাড়িতে গোপনে মিটিং করার অভিযোগে ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধির ৪২ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করে। বজবজ থানা জি.ডি. এন্ট্রি নম্বর ৫৯৭। কিন্তু এই ন'জনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগকারী ও স্পষ্ট অভিযোগ না থাকায় ১৩.৮.৮৫ তারিখে এস.ডি.জে.এম. আলিপুর জে.এন. রায় সকলকে বেকসুর খালাস করে দেন। তখন পুলিশ যাদবপুরের ওই ৫(৮)৮৫ থেকে অপরাধীদের আদালতের মধ্যে সেদিনই আবার গ্রেপ্তার করে। তখনি আবার তাঁরা জামিনে মুক্ত হয়।

বস্তুত এই যাদবপুর থানায় ৫ (৮) ৮৫ খুনের মামলাটি এতই রহস্যময় যে এতে মৃত ব্যক্তির নাম, হত্যার ঘটনাস্থল কিছুই উল্লিখিত নেই, অথচ পুলিশ এই মামলায় একের পর এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেই চলেছে। জে.এন. রায়ের আদালতে সকলে জামিন পেয়ে যাওয়ার পর পুলিশ পরের মাসেই ৩.৯.৮৫ তারিখে আবার একুশ জনকে কোর্টে হাজির করে ওই একই যাদবপুর পি.এস. ৫ (৮) ৮৫ কেসে। এবারে আসামীদের মধ্যে ছিলেন অনিন্দিতা চক্রবর্তী নামে বালুরঘাটের এক স্কুল শিক্ষিকা এবং শিবানী চক্রবর্তী নামে এক কলেজ ছাত্রী। তাদের সকলেই নাকি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, হত্যা, বেআইনী মিছিল, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি ইত্যাদি করে বেড়াচ্ছিল। অর্থাৎ বালুরঘাটের স্কুলের দিদিমণি এসে যাদবপুরে খুন করে চলে যাচ্ছে। জে.এন. রায় এদেরকেও জামিন দিয়ে দেন এবং মন্তব্য করেন, 'ইট ডাজ নট অ্যাপিয়ার টু মি, দ্যাট দেয়ার ইজ এনি এভিডেন্স এগেইন্সট দি পার্সনস্ ইনভলবিং দি অফিসার্স এ্যালেইজ্‌ড্ ইন দি কেস।' এদের জামিন হয়ে যাওয়ার পর সেই দিনই পুলিশ ওই একই কেসে জে.এন. রায়ের ঘরেই আরও সতেরো আঠারো জনকে হাজির করে। তাদের মধ্যে ছিলেন শান্তিপুরের এক পুরোহিত দীপংকর চ্যাটার্জী, তাঁত চালক সুর্যকান্ত রায় কর্মকার, বহরমপুর কালেকটরেটের কর্মী শশাংক ঘোষাল, কৃষ্ণনগরের ছোট ব্যবসায়ী অজিত রায়, কৃষ্ণনগরের বেকার যুবক সুবোধ রায়। কিন্তু পুলিশের দুর্ভাগ্য, এই সতেরো আঠারো জনকেও শ্রী জে.এন. রায় ২৩.৯.৮৫ তারিখে জামিন দিয়ে দিলেন।

যে যাদবপুর ৫ (৮) ৮৫ মামলায় পুলিশ আটচল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল তাদের কারুর নাম এফ.আই.আর. এ ছিল না। এফ.আই.আর. এ যে ছত্রিশ জনের নাম ছিল, পুলিশ আজ পর্যন্ত তাদের কারুকেই গ্রেপ্তার করতে পারে নি।

এবং পুলিশ এরপর হতাশ হয়ে উনপঞ্চাশ নম্বর ডাক্তার সুব্রত চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে এই রহস্যময় খুনের মামলায়। সুব্রতর নামও এফ.আই.আর. এ নেই। সুব্রত এস.এস.কে.এম. হাসপাতালে ১১১ নম্বর ঘরে থাকত। কিন্তু ২৬ মার্চ রাত্রে পুলিশ ভুল করে হাউস স্টাফ কোয়ার্টারে ১১২ নম্বর ঘরে রেড করে। ফলে কোন সীজারলিস্টও পুলিশ সুব্রতর বিরুদ্ধে দিতে পারে নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যাদবপুর পি.এস. ৫(৮)৮৫ মামলায় উনপঞ্চাশ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, এফ. আই.আর.এ আছে আরও ছত্রিশজন আসামীর নাম। মোট পঁচাশি জন মিলে তাহলে যাদবপুরে এক নাম না জানা ভূতকে খুন করতে গিয়েছিল। কাকে খুন করেছে, কোথায় খুন করেছে, কিভাবে খুন করেছে পুলিশ নিজেও জানে না, কেননা এফ.আই. আর.এ মৃত সম্পর্কে কোন তথ্যই নেই। বস্তুত সুব্রতর আইনজীবী তমাল মুখার্জি জানালেন, পুলিশ এফ.আই.আর. টাকে এমন দশা করেছে যাতে কেউ তা থেকে কিছুই পাঠোদ্ধার করতে পারবে না পর্যন্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ওই খুনের মামলায় আপনি আমি তো বটেই হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সন্ন্যাসীরাও যে কোনদিন গ্রেপ্তার হতে পারে, অতএব সাধু সাবধান।

জুনিয়ার ডাক্তার বলতে বোঝায় এম.বি.বি. এস. পাস করে ডাক্তারি শাস্ত্রে যাঁরা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছেন। বিরাশি সালে জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশন তৈরি হয়। সারা বাংলার জুনিয়র ডাক্তাররা এই ফেডারেশনের সদস্য। এছাড়া বিভিন্ন হাসপাতালে ফেডারেশনের এক একটি লোকাল বডি রয়েছে, সেগুলিকে বলা হয় এসোসিয়েশন। ডাঃ সুব্রত চক্রবর্তী সারা বাংলা ফেডারেশনের কলকাতা শাখার সহ সম্পাদক। এই

জুনিয়ার ডাক্তার বলতে বোঝায় এম. বি. বি. এস পাস করে ডাক্তারি শাস্ত্রে যাঁরা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছেন। বিরাশি সালে জুনিয়ার ডাক্তার ফেডারেশন তৈরি হয়। সারা বাংলার জুনিয়ার ডাক্তাররা এই ফেডারেশনের সদস্য। এছাড়া বিভিন্ন হাসপাতালে ফেডারেশনের এক একটি লোকাল বডি রয়েছে, সেগুলিকে বলা হয় এসোসিয়েশন।

সুব্রত চক্রবর্তীর পক্ষের কৌশুলি তমাল মুখার্জি

ফেডারেশনের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক নেই বলে কর্মকর্তাদের বিবৃতি। তবে রাজ্য বাম সরকারের সঙ্গে এদের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়।

১৯৮৩ সালে ফেডারেশন কয়েকটি দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। দাবীগুলি সাধারণ মানুষের ভালোর জন্যেই করা হয়েছিল। যেমন হাসপাতালে জীবনদায়ী ওষুধের সরবরাহ, হাসপাতালে চব্বিশঘন্টা একস্‌-রে, রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি পরীক্ষার সুব্যবস্থা ইত্যাদি। আগে জুনিয়র ডাক্তররা স্টাইপেন্ড পেতেন চার পাঁচশ টাকা, এখন পান সাড়ে চারশ থেকে সাড়ে ছ'শো টাকা। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের একজন দারোয়ান পর্যন্ত এর থেকে বেশি অর্থ উপার্জন করে। সুতরাং তাঁরা তাঁদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধিরও দাবী জানিয়েছিলেন। গ্রামে হেল্থ সেন্টার বাড়ানো, এবং জুনিয়র ডাক্তারদের সেখানে পাঠানোর দাবীও ছিল। এছাড়াও দাবীগুলির মধ্যে ছিল জীবনদায়ী ওষুধের দাম কমানো, ইত্যাদি। এই দাবীতে ধর্মঘটও হয়। সরকার তখন নীতিগতভাবে এসব দাবী সমর্থন করলেও আজ পর্যন্ত এসব বিষয়ের কোন সমাধান হয়নি। পরিবর্তে সরকার ছলে-বলে-কৌশলে ফেডারশনের ঐক্য ভাঙতে চেষ্টা করেছেন। সেই আন্দোলনের যে কয়েকজন জুনিয়র ডাক্তার অংশগ্রহণ করেন নি তাদের পরবর্তীকালে সরকারি ডাক্তার পদে বহাল করে ঐক্যবদ্ধ ডাক্তার সংগঠনকে ভেঙে তাদের মনোবল দুর্বল করতে চেয়েছেন সরকার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মেডিকেল কোর্সের কোন পরীক্ষায় এক চান্সে পাস না করা ছাত্র কুন্তল বিশ্বাস যিনি আজও তাঁর হাউস স্টাফশিপ্ শেষ করেন নি, পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সও কমপ্লিট করেন নি, সেই অনভিজ্ঞ যুবককে এস.এস.কে.এম হাসপাতালের শিশু বিভাগে সরকারি ডাক্তার করে দেওয়া হয়েছে। তিনি কিছুদিন অ্যাকটিং আর.এম.ও পর্যন্ত হয়েছিলেন।

সরকারের এইসব কাজের প্রতিবাদ জানাতে থাকেন ফেডারেশন। এস.এস.কে.এম হাসপাতালে উডবার্ন ওয়ার্ডে সাড়ে বারো নম্বর ঘরে মন্ত্রী মহোদয়দের থাকার ব্যবস্থা। ঘরটি পাঁচতারা হোটেলের স্যুটকে হার মানায়। তার ঠিক নিচে সাধারণ রোগীর জন্য বরাদ্দ নোংরা বিছানায় রাস্তার কুকুর উঠে পড়ে। এই বৈষম্যের কথাও ফেডারেশন ফাঁস করতে চান। এমন কি মন্ত্রীরা হাসপাতালে এলে বোতলের পর বোতল ঠাণ্ডা পানীয় আসে জনসাধারণের পয়সায়। বাগড়ি মার্কেটের কমল সরকার বেবিফুডের সীল ভেঙে ভেজাল দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে কিভাবে? মন্ত্রীরা কিভাবে সরকারি লেটার প্যাডে চিঠি লিখে সুপারকে অনুরোধ করেন দলের ছেলেদের ভর্তি করে নেওয়ার জন্যে—এইসব ব্যাপার জুনিয়র ডাক্তাররা চেয়েছিলেন জনসাধারণকে জানিয়ে দিয়ে জনদরদী সরকারের মুখোশ খুলে দিতে। অতএব ফেডারেশনের অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে তাতে আর অবাক হওয়ার কি
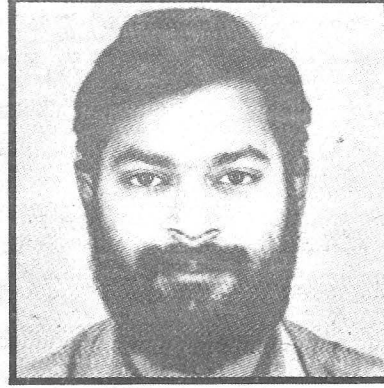
১৯৮৩ সালে ফেডারেশন কয়েকটি দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। দাবীগুলি সাধারণ মানুষের ভালোর জন্যেই করা হয়েছিল। যেমন হাসপাতালে জীবনদায়ী ওষুধের সরবরাহ, হাসপাতালে চব্বিশঘন্টা এক্‌স-রে, রক্তপরীক্ষা ইত্যাদি পরীক্ষার সুব্যবস্থা ইত্যাদি।

আছে?

কলকাতা পুলিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক অভিজ্ঞ অফিসারের সঙ্গে সুব্রতর গ্রেপ্তারের বিষয়ে কথা বলছিলাম। এই অফিসারটি সাত দশকের গোড়ায় নকশাল বিদ্রোহ দমনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করলাম, এস.বি. রিপোর্টের ভিত্তিতেই নিশ্চয়ই সুব্রতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

'হ্যাঁ।'

'ওর সম্পর্কে আপনাদের রিপোর্ট কি রকম?'

'এটা টপ সিক্রেট, তবে এটুকু বলা যায় আমাদের রিপোর্ট সাধারণত ভুল হয় না। কুচবিহার জেল ভেঙে যে সব নকশাল আসামীরা পালিয়েছিল তাদের তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। এটা আমাদের সোর্স খবর দিয়েছে।'

'কুচবিহার জেল ভাঙার ব্যাপার তো বহুদিন আগের ব্যাপার, এতদিন ওকে গ্রেপ্তার করা হয়নি কেন? উনি তো পলাতক ছিলেন না, সর্বসম্মুখে ডাক্তারি করতেন।'

'একজন ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করতে হলে আমাদের অনেক ভাবনা চিন্তা করতে হয়। অনেক অনুসন্ধান করতে হয়, তাতে তো সময় লাগবেই। আর এটা সি আই ডি-র ব্যাপার। ওরা জানে।

সি আই ডি অফিসার বসেছিলেন পাশেই। প্রশ্ন করতে বললেন, 'দেখুন কোন কাগজে স্টেটমেন্ট দেওয়া এ ব্যাপারে একেবারেই নিষিদ্ধ। আমাদের উপর যেরকম নির্দেশ আসে, সেই অনুযায়ী কাজ করতে হয়।'

'নির্দেশগুলো কোথা থেকে আসে? রাইটার্স বিল্ডিং?'

'অনেক সময় সেরকম হয় বৈকি।'

'এক্ষেত্রে কে নির্দেশ দিয়েছিলেন?'

'মাফ করবেন, বলতে পারব না। তবে কোন পুলিশ অফিসার নির্দেশ দেন নি এটা বলতে পারি।'

সুব্রতর পক্ষের কৌঁশুলি তমালকান্তি মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'পুলিশ কি কোন বেআইনী কাজ করেছে

তমালকান্তি উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'ডেফিনিটলি। কাউকে গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা না দেখাক, গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে বাধ্য। পুলিশ সুব্রতকে পুলিশ হেফাজতে রাখার জন্যে, গ্রেপ্তারের জন্যে গ্রেপ্তারের কারণ, কোথায় তাকে রাখা হচ্ছে এসব কিছুই বলেনি। যাতে সুব্রতর তরফে কোন উকিল না দাঁড়াতে পারে। ওকালতনামায় বলা হয়নি সুব্রত একজন ডাক্তার। ওকালতনামায় সুব্রতর স্বাক্ষর পুলিশ অ্যাটেস্টেট করেনি। উকিলের সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি। এসবই তো বেআইনী কাজ। পুলিশ এখন আমার উপরে পর্যন্ত এত চটে আছে, যে আমি কোন কেস হাতে নিলে পুলিশ আমার মক্কেলকে আরও বেশি করে হ্যারাস করছে। এরকম হলে তো ওকালতি ব্যবসা উঠে যাবে। দেশের গণতন্ত্রও বিপন্ন হবে। এফ আই আর এ নাম নেই, নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই, মামলার ডিটেলস্ কিছু নেই, একের পর এক লোককে পুলিশ হ্যারাস করছে, এটা একটা দেশ হল?'

তমালবাবুকে প্রশ্ন করলাম, 'এই মামলায় সুব্রতকে বেকসুর খালাস করে আনতে পারবেন?'

'জানি না। সেটা আগাম বলা যায় না।'

'আপনার তরফে নির্দিষ্ট কোন যুক্তি আছে, যার দ্বারা আপনি ওকে আদালতে ডিফেন্ড করতে পারবেন?''

'পুলিশের হাতে অভিযোগ নেই। আমার কাছেও তেমন কাগজপত্র নেই। সব এ ও নিয়ে চলে গেছে। আর পুলিশও তো এখনও চার্জশীট দেয় নি।'

'কবে দিতে পারে কোন ধারণা আছে?'

'না।'

আলপনা গোস্বামীকে নিয়ে জ্যোতি বসুর সংসারে অশান্তি !

জ্যোতি বসু, চন্দন বসু ও ডলি বসু : সুখস্মৃতি !

মুখ্যমন্ত্রী–পুত্র চন্দন বসু এখন জড়িয়ে গেছেন ফিলমস্টার আলপনা গোস্বামী বিতর্কে ? মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রবধূ শ্রীমতী ডলি কেন নামলেন টি.ভি.র রুপালী পর্দায় ? জর্জ বেকারের সঙ্গে ডলি দেবীর অভিনয় কি প্রাণবন্ত ? জর্জকে ছেড়ে আলপনা চন্দনের সঙ্গে মাখামাখি বাড়ালেন কেন ? সে কি শুধু ব্যবসা নাকি আরও কিছু ? ব্যবসার পিচ্ছিল পথে পা বাড়িয়ে চন্দন কি মুখ্যমন্ত্রীর পাবলিক ইমেজ নষ্ট করছেন ? হাবিব আহসান ও বিকাশ চক্রবর্তীর যুগ্ম তদন্ত রিপোর্ট।

ফেব্রুয়ারি মাস, ১৯৮৪ । দমদম বিমান বন্দরের সাংবাদিকরা হঠাৎ সাদা রঙের মারুতি গাড়িটি ঢুকতে দেখেই একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। আরে, এ যে চিফ মিনি-স্টারের গাড়ি । জ্যোতিবাবু কোথায় চললেন ? আগে তো কিছুই জানা যায় নি। তাঁদের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই প্রবীণ জ্যোতিবাবু গাড়ি থেকে নেমে এলেন যুবকের মত ত্বরিৎ পায়ে। পরনে সেই চিরাচরিত পাটভাঙা ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি, চোখে-মুখে সেই ব্যক্তিত্ব জড়ান গম্ভীর হাবভাব। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন কৌতূ-হলী সাংবাদিকরা। রাশভারি জ্যোতিবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অল্পকথায় বললেন–'বোম্বাই যাচ্ছি।'

বোম্বাই ! সাংবাদিকরা অবাক । সরকারি কাজ-সে তো দিল্লিতে। পার্টি মিটিং সেও দিল্লিতে। তাহলে হঠাৎ বোম্বাই কেন ?

কৌতূহল প্রশ্নে রূপান্তরিত হতেই জ্যোতিবাবু চটে গেলেন–'কেন বোম্বাই যাচ্ছি তাও আপনাদের বলতে হবে নাকি ?'

আমার যদি একটার জায়গায় দশটা বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় সেটা অ্যাবসলিউটলি মাই বিজনেস।

সবকথা বলা যায় না। রাজনীতিবিদ্‌রা বলতে চান না। সাংবাদিকরা ফেনিয়ে ফেনিয়ে গুজব ছড়ায়। জ্যোতিবাবুর মত জনপ্রিয় নেতারা তাই সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলেন। অনেক সময় গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চান না। অতএব কিছু না বলেই জ্যোতিবাবু আকাশে উড়লেন।

আকাশে উড়লেন, কিন্তু বাতাস ভারি হতে লাগল। গসিপপ্রিয়, গল্পবাগীশ কলকাতা, রাজনীতির ডামাডোলের উত্তাল মিছিল নগরী কলকাতায় তাঁকে ঘিরে শুরু হল কানাকানি-গুঞ্জন! গুঞ্জন থেকে গুজব ছড়াল মহানগরীর আনাচে কানাচে।

একদিন দুদিন নয়। জ্যোতিবাবু ফিরে এলেন পুরো এক সপ্তাহ পর। আবার সেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি জ্যোতিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, তিনি বোম্বাই গেছিলেন ছুটি কাটাতে।

ছুটি অবশ্য প্রত্যেক মানুষেরই প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের মত সমস্যা সংকুল রাজ্যের বোঝা যাঁর মাথায়, নিশ্চয়ই তাঁর মাঝে মাঝে রিল্যাকসেশন দরকার। তা জ্যোতিবাবু প্রায়ই উত্তরবঙ্গে

সমাজের অসার মূল্যবোধের বিরুদ্ধে?

যান ছুটি কাটাতে। যান দেশের অন্যান্য জায়গায়—এমনকি বিদেশেও। জ্যোতিবাবুর বয়স বেড়েছে। ইদানীং শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। সুতরাং জ্যোতিবাবুর মত প্রবীণ রাজনীতিবিদ বন্দর বোম্বাইয়ে ছুটি কাটাতে যেতেই পারেন।

তবু কথা উঠল। কারণ জ্যোতিবাবু সহজ কথাটি স্পষ্টভাবে বললেন না। মুখ্যমন্ত্রীর ছুটি কাটানর খরচ দেবে রাজ্য সরকার এবং তিনি উঠবেন কোন সরকারি অতিথিশালায়। সে রকমই নিয়ম। কিন্তু জ্যোতিবাবু নিয়ম বদলালেন। তিনি কেন্দ্র, রাজ্য বা মহারাষ্ট্র সরকারের অতিথিশালায় না উঠে আতিথ্য গ্রহণ করলেন স্ট্যাণ্ডারড্ ব্যাটারিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জিতেন সান্ন্যালের ঘরে। হিন্দুস্তান লিভারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশোক গাঙ্গুলি এবং আরও কয়েকজন শিল্পপতির সঙ্গে নিয়মিত লানচ্ ও ডিনার খেতে লাগলেন।

অবশ্য ছিয়াশি সালের জ্যোতিবাবু এসব ব্যাপারে আমল বদলে গেছেন। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে যারা এক নম্বর শ্রেণীশত্রু বলে চিহ্নিত সেই একচেটে পুঁজিপতিরা এখন আর জ্যোতিবাবুদের শত্রু নয়, মিত্রপক্ষ। মার্কসবাদীরা তাঁদের সঙ্গে সমঝোতা চান। হয়ত বা রাজনৈতিক কৌশল—'ওয়ান স্টেপ ফরোয়ার্ড টু স্টেপ ব্যাক।' লক্ষ লক্ষ বেকারের রুটি রোজগারের স্বার্থে, স্থবির পশ্চিমবঙ্গে গতি সঞ্চার করতে জ্যোতিবাবুরা দেশ-বিদেশের পুঁজিপতিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে অন্ধকারে বসেও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বিদ্যুৎ সাপ্লাইয়ের, ট্রেড-ইউনিয়ন সহযোগিতার। বলছেন নানা রকম কনসেশন দেবার কথা। খারাপ কথা নিশ্চয়ই নয়। যৌথ প্রকল্পে রাজ্য সরকারেরই প্রাধান্য থাকবে। এবং তা বাস্তবায়িত হলে শিল্পক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা পশ্চিমবঙ্গ আবার হয়ে উঠবে গতিশীল। অর্থনীতি উঠবে চাঙ্গা হয়ে। রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এসব পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। সঙ্গতভাবেই সি. পি. এমের দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসেও প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। সে কারণেই টাটা বিড়লা গোয়েঙ্কা ডালমিয়াদের সঙ্গে এখন জ্যোতিবাবুর মাখামাখি। সুতরাং বোম্বাই গিয়েও তিনি শিল্পপতিদের সঙ্গে অবাধে মিশতে পারেন বৈকি। স্ট্যাণ্ডারড্ ব্যাটারিজের মালিক

Rilaxon.
The deluxe mattress with comfort built in.
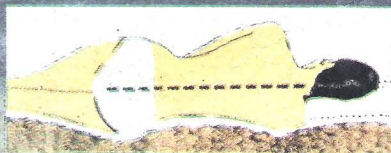
Only the comfortable can promise comfort. Like Rilaxon. Comfort throughout, no matter in what position you sleep. Because each Rilaxon mattress is made from high resilience fibres, researched for comfort.

Coir & Felt Division of
Shree Digvijay Cement Co. Ltd. 14, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001

Sobhagya/RIL/003/85

ডলি বসু : এখন টি-ভি-র পর্দায়

আর পি গোয়েঙ্কা ! বামফ্রন্ট সরকার গোয়েঙ্কাদের সঙ্গে আগেই একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন । তাছাড়া আর পি গোয়েঙ্কা এবার 'ফিকি'রও প্রেসিডেন্ট । সুতরাং রাজ্যের স্বার্থে জ্যোতিবাবুকে নিশ্চয়ই মিশতে হবে । এসব নিয়ে গলাবাজি না করাই ভাল । আর তাতে যদি রাজ্যের মঙ্গল হয় তাহলে তো আরও ভাল কথা ।

কিন্তু জ্যোতিবাবু কি সেজন্যই বোম্বাই গেছিলেন ? যাবার সময় মুখ খুললেন না । ফেরার সময় বললেন ছুটি কাটানর কথা । এত ঢাক্ ঢাক গুড় গুড় কেন ? শিল্পপতিরা কলকাতায় এসে পাঁচ তারা হোটেলেই ওঠেন । রাজ্য সরকারের সঙ্গে সব কথাবার্তাই হয় প্রকাশ্যে । কাগজে সেসব ছাপাও হয় । কিন্তু জ্যোতিবাবু আসল কথা চেপে রাখলেন । তাহলে এই সতর্ক নীরবতার কারণ কি ?

সব কিছুতেই কারণ থাকে । জ্যোতিবাবুর মত কর্মব্যস্ত মানুষই বা কেন বিনা কারণে বোম্বাই যাবেন ? আর কেনই বা ছুটি কাটাতে গিয়ে শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করে নিজেকে করে তুলবেন ভারাক্রান্ত ?

এই 'কেন' নিয়েই গুজবের তুবড়ি উড়ল । ভেসে বেড়াতে লাগল এলোমেলো কথার ঢেউ । হেগড়ের আরক কেলেঙ্কারি, শিবাজী পাতিলের মেয়ের পরীক্ষা কেলেঙ্কারি বা জে বি পট্টনায়কের জামাইয়ের মদ কেলেঙ্কারির মত জ্যোতিবাবুও জড়িয়ে পড়লেন এক বিতর্কের বেড়াজালে । কোলডফিল্ড টাইমস বলছে ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর বোম্বাই সফর ছিল নাকি একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপারে । শিল্পপতি পুত্রের শিল্পবিস্তারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতেই নাকি তাঁর বোম্বাই যাত্রা । অবশ্য দায়িত্বশীল পিতা হিসাবে জ্যোতিবাবু তাও নিশ্চয়ই করতে পারেন । ব্যক্তিগত কাজ করেছেন ছুটি নিয়েই । ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনশের টিকিটও হয়ত কিনেছিলেন নিজের টাকায় । আর মারুতি গাড়িটিও তো রাজ্য সরকারের নয়—পার্টির । জ্যোতিবাবুই সেটি ব্যবহার করেন । সব ঠিকঠাক হলে জ্যোতিবাবু বিধিবহির্ভূত কোন কাজই করেন নি । পোড়খাওয়া জ্যোতিবাবু তা করবেনই বা কেন ? তাহলে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক বা উড়িষ্যার মত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কেলেঙ্কারিতে জড়াবেন কি-ভাবে ? কথা সেখানেই ! আর সে কথা আরও ফেনিয়ে উঠল একজন চিত্রনায়িকার অন্তর্ধানে । জ্যোতিবাবুকে নিয়ে গুজবের বুদবুদ মিলিয়ে যাবার আগেই ৪ এপ্রিল ১৯৮৬ 'যুগান্তর' পত্রিকায় একটি খবর বেরোল 'গুজব' শিরোনামে । যুগান্তরের ভাষা অনুসারে বাংলা ছবির জনপ্রিয় নায়িকা আলপনা গোস্বামী ও নায়ক জর্জ বেকারের বিচ্ছেদ কি আসন্ন ? প্রকাশ—স্বামী জর্জকে ছেড়ে আলপনা গোস্বামী এখন বোম্বে পাড়ি দিয়েছেন ।.... কিন্তু গুজব বলছে নায়িকা আসলে গেছেন আমেরিকা । ওখানে নাকি তাঁর নতুন প্রেমিক থাকেন । বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতেই আলপনার এই বিদেশ পাড়ি । এদিকে বন্ধু ও পরিচিত মহলে এক মন্ত্রীর ব্যবসায়ী পুত্র নাকি পড়েছেন ফ্যাসাদে । কারণ আলপনার সঙ্গে বাংলাদেশি ঐ প্রেমিকাটির

বলা বাহুল্য, যুগান্তরের খবরের লক্ষ্য মন্ত্রী পুত্র নয়। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র চন্দন বসু। ফিল্ম জগতে এ রকম জুড়ি বদলের খবর মোটেই নতুন নয়। তাছাড়া জর্জ বেকারের সঙ্গে তো আলপনায় আনুষ্ঠানিক বিয়েও হয়নি। তাঁরা এমনিই ঘর বেঁধেছিলেন—লিভ টুগেদার। সুতরাং তাদের ঘর ভাঙার বিষয়টি সংবাদপত্রের একটি রসানো খবর হতে পারে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে চন্দনের সম্পর্ক কি ?

আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ঐ মন্ত্রী পুত্রই । স্বামী জর্জ বেকারও কারও কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারছেন না । শোনা যাচ্ছে বোধহয় খুব শিগ্‌গিরই বাড়ি বদল করবেন ।'

বলা বাহুল্য, যুগান্তরের খবরের লক্ষ্য মন্ত্রী-পুত্র নয় । খোদ মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র চন্দন বসু । ফিল্ম জগতে এ রকম জুড়ি বদলের খবর মোটেই নতুন নয় । তাছাড়া জর্জ বেকারের সঙ্গে তো আলপনার আনুষ্ঠানিক বিয়েও হয়নি । তাঁরা এমনিই ঘর বেঁধেছিলেন—লিভ টুগেদার । সুতরাং তাদের ঘর ভাঙার বিষয়টি সংবাদপত্রের একটি রসানো খবর হতে পারে । কিন্তু তার সঙ্গে চন্দনের সম্পর্ক কি ?

কথা উঠল সেখানেই । কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরলো । আরও অনেক কারবারের সঙ্গে চন্দন বসু একটি ইনভেসটমেন্ট কোম্পানিরও পার্টনার । কোম্পানিটির নাম 'স্টার ইনভেসমেন্ট কোম্পানি' । সদর দপ্তর বনডেল রোডে । 'সঞ্চয়িতা' খ্যাত আলপনার নাকি খদ্দের ধরায় জুড়ি নেই। সে কারণেই হয়তো এই পটিয়সী নায়িকাকে হাত করেছেন চন্দনবাবু । তারপর থেকেই দুজনের নাকি খুব নিরালা ও নিভৃতের সম্পর্ক । প্রায় এক দশক ধরেই আলপনাকে চন্দনের সঙ্গে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে খুব ঘনিষ্ঠভাবে—ক্লাবে, পার্টিতে, হোটেলে, রেস্তোরাঁয়—এমন কি বাড়িতে এবং গাড়িতেও ।

জ্যোতিবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র সন্তান চন্দন বসু । বলা বাহুল্য তাঁর প্রথম স্ত্রী অল্পকাল পরেই মারা যান । তাঁর একটি কন্যা সন্তান হয়েছিল । কিন্তু সেও বেশিদিন বাঁচেনি । জ্যোতিবাবু তখন জেলে । দুবারই বিয়ে করেছিলেন—বাবার পছন্দ করা পাত্রীকে । শুধু রাজনীতি ছাড়া আর সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন বাবার বিশেষ অনুগত । প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েশনের পর বাবার কথামতই জ্যোতিবাবু বিলেত যান । কিন্তু পাস করতে পারেন নি । ততদিনে ভি. কে. কৃষ্ণমেনন, ফিরোজ গান্ধী, ভূপেশ গুপ্ত, ইন্দিরা নেহেরু প্রমুখের সঙ্গে জ্যোতিবাবুর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে । বিলেতে বসেই শুরু করেছেন রাজনৈতিক কাজকর্ম । সেখানেই জ্যোতিবাবুর রজনী-পাম দত্তের হাতে কম্যুনিজমে দীক্ষা । বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যও হন । শেষে মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন । মাস ছয়েক প্র্যাকটিসও করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে । কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় ধনীর দুলাল জ্যোতি বসু স্বেচ্ছায় বেছে নেন কঠিন কঠোর রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ । নামমাত্র পারিশ্রমিকে পার্টির হোল টাইমার হন । সেই তখন থেকে এখনো জ্যোতিবাবু দলের সর্বক্ষণের কর্মী ও নেতা । রেলওয়ে নির্বাচনী কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুনকবীরকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে জ্যোতিবাবু বিধানসভায় প্রবেশ করেন স্বাধীনতার আগেই । তখন থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত একটানা বিরোধী দলের নেতা । সারা ভারতেই জ্যোতিবাবুর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অসাধারণ উজ্জ্বল । স্পষ্ট বক্তা, ফালতু কথা বলেন না, মেহনতী মানুষের নেতা । বাবার বন্ধু মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে যুগপৎ স্নেহ ও সমীহ করতেন ।

কঠিন ও কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জ্যোতিবাবু আজ পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার—মুখ্যমন্ত্রী । লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে তিনি বিনা সিকিউরিটিতে বক্তৃতা করতে পারেন । সৎ এবং আদর্শবান নেতা হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র । বিরোধী কংগ্রেস নেতারাও তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বকে মর্যাদা দেন ভেতরে ভেতরে । স্বয়ং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গুরুতর সমস্যায় পড়লে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতেন । রাজীব গান্ধীও তার ব্যতিক্রম নন । ঐতিহাসিক পাঞ্জাব চুক্তির নেপথ্যে ছিল জ্যোতিবাবুর ঐকান্তিক সহযোগিতা । এ ব্যাপারে তিনি বিদেশেও গেছিলেন । সি পি এমের বিরুদ্ধে জনমানসে যতই বিক্ষোভ জমা হোক, জ্যোতিবাবুর জনপ্রিয়তা কমেনি । সম্প্রতি 'ইলাসট্রেটেড উইকলি'র এক সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, কলকাতার অধিকাংশ মানুষ জ্যোতিবাবুকেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পেতে চান ।

বস্তুত এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জ্যোতিবাবুর কোন বিকল্প নেই।

সেই জ্যোতি বসুর একমাত্র সন্তান চন্দন বসু বাবার ঠিক বিপরীত মেরুর মানুষ। কোনদিনই রাজনীতির ধারে কাছে ছিলেন না। জ্যোতি বাবুও তা চাননি। বিলেত ফেরত কমিউনিস্ট জ্যোতিবাবু মনেপ্রাণে একজন বাঙালী। আর পাঁচজন বাঙালী অভিভাবকের মত তিনিও চেয়েছিলেন চন্দন লেখাপড়া শিখে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক। তা চন্দনবাবু এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু লেখাপড়াটা বেশিদূর এগোয়নি। স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়ার। কিন্তু সেন্ট পলস্ থেকে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করলেন দ্বিতীয় বিভাগে। ওই রেজাল্টে তখন জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসা যেত না। অথচ ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা তখন অদম্য। চন্দন বাবাকে ধরলেন সুপারিশের জন্য। বলা বাহুল্য, জ্যোতিবাবু তাকে সুপারিশের বদলে ধমকে দেন। সংগ্রামী বাবার পুত্র চন্দনও দমে যাবার পাত্র নন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তখন রাজ্যের কর্ণধার। জ্যোতিবাবুর এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। চন্দন 'মানু' কাকুকে ধরলেন। মানু কাকুই তাঁকে পাঠিয়ে দেন কাশ্মীরে, ডাক্তার ফারুক আবদুল্লাহর কাছে। ফারুক তখন শ্রীনগর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক।

রাজনীতি না করলেও বাবার নামের সুযোগ সুবিধা চন্দন বরাবরই পেয়ে এসেছেন। ডাক্তারী পড়তে পড়তে চন্দন প্রেমে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিকেয় ওঠে। প্রেমের টানেই ফিরে আসেন কলকাতায়। কলকাতায়–এসে চাকরি পেলেন বেঙ্গল ইমিউনিটি সেন্টারে–জুনিয়র এক-জিকিউটিভ। চাকরি করতে করতেই বিয়ে। স্ত্রীর নাম ডলি। পাঞ্জাবি মেয়ে ডলি। বাবা কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী।

চন্দনের আচরণে জ্যোতিবাবু আহত হয়েছিলেন। পড়াশুনোয় অবহেলা, অসময়ে চাকরির নেশা–সর্বোপরি দুম করে বিয়ে করা কোনটিই তিনি পছন্দ করেন নি। কিন্তু ওই সবেধন চন্দন। কড়া ধাতের মানুষ জ্যোতিবাবুও মানুষের সহজাত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। চন্দনকে ভৎর্সনা করলেও পুত্রবধূ ডলিকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

এরপর বেঙ্গল ইমিউনিটি সেন্টারের চাকরিতেও আর পোষাল না। কোটিপতি শ্বশুরে কারবার দেখে চন্দনের চোখে তখন শিল্পপতি হবার নেশা। ১৯৭৭–এ মোটামুটি হাজার টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে চন্দন ব্যবসায় নামলেন। কিন্তু মূলধন পাবেন কোথ্‌থেকে? জ্যোতিবাবুই তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সুতরাং বিশেষ অসুবিধা হল না। অরাজনৈতিক চন্দন বসু বাবার রাজনৈতিক ইমেজ আবার কাজে লাগালেন বেশ সার্থকভাবেই। জ্যোতিবাবু পুত্রকে এ ব্যাপারে বিশেষ আমল না দিলেও চন্দনকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন দুর্গাপুরের সি পি এম নেতা দিলীপ মজুমদার।

শিল্পনগরী দুর্গাপুরের ডাকসাইটে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং রাজ্য সভার সদস্য দিলীপবাবুর তৎপরতায় চন্দন অনায়াসেই এক বিশাল জায়গা লিজ পেয়ে গেলেন ডি পি এলের সামনে। জায়গাটি দুর্গাপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটির। নিয়ম অনুসারে চন্দনের তা পাওয়ার কথা নয়। তবু পেলেন। এবং শুধু জায়গাই নয়, রাজ্য সরকারের সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনানসিয়াল কর্পোরেশন থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লোনও বের করলেন ফুড এ্যাণ্ড সাপ্লাই দপ্তর থেকে। ময়দার কোটা বরাদ্দ করাতেও অসুবিধা হল না। সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা নিয়েই চন্দন বসু ১৯৭৮ সালে দুর্গাপুরে স্থাপন করলেন ইস্টার্ন বিস্কুট কোম্পানি বা 'এবকো'। কারবার অবশ্য পার্টনারশিপে। চন্দনের স্ত্রী ডলি বসু এবং এন কে সাহু তার অন্যতম অংশীদার।

করিৎকর্মা চন্দন এখানেই থেমে যান নি। একের পর এক কারবার ফেঁদে গেছেন। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে চন্দনের মুখে ফুল চন্দনের অভাব হয় নি। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনানসিয়াল কর্পোরেশনের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাওয়ার পর তিনি

মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র বলে চন্দন বসু ব্যবসা করে ধনী হতে পারবেন না, এমন কোন কথা নেই। বরং শিল্প-বিমুখ বাঙালী সমাজের দিকে তাকিয়ে চন্দনের অধ্যবসায়কে তারিফ জানানো যেতেই পারে। কিন্তু তাঁর কারবার নিয়ে নানা গুরুতর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে, যা বামফ্রন্ট সরকারের 'সৎ ও সুস্থ' প্রশাসনের দাবী অনেকটাই খর্ব করে দেয়। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার এখনো নীরব আর চন্দনবাবুও মুখ খুলছেন না।

৫০ লক্ষ টাকার ফিক্সড্ ডিপোজিট করলেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া গেল একান্ন লক্ষ টাকা-(১) 'এবকো'র জন্য বাইশ লক্ষ (২) ডানকুনি সেকেণ্ড বিস্কুট কারখানার জন্য পনের লক্ষ আর (৩) ডানকুনির কনফেকশনারিজ ইউনিটের জন্য চোদ্দ লক্ষ। মোট একান্ন লক্ষ টাকা।

চন্দনের উত্থানে জ্যোতিবাবুর ভূমিকা যে সক্রিয় এমন ইঙ্গিত দিতে আমরা চাই না। কারণ কংগ্রেসীদের মত কোন কম্যুনিস্ট কাঁচা কাজ করেন না। কিংবা এমনও হতে পারে, জ্যোতিবাবু এসব ব্যাপারে আদৌ জড়িত নন। পুত্রের ব্যবসায়ী মনোভাব তাঁর মনঃপূতও ছিল না। সম্ভবত সে কারণেই কারবারে নামার আগেই চন্দন হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে চলে এসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে থেকে চন্দন ব্যবসায়ী হোক এটা জ্যোতিবাবু চান নি। কিন্তু নিজে জড়িত না হলেও চন্দনের

চন্দন বসু ও স্ত্রী ডলি বসু : পরিবারিক ঠাণ্ডাযুদ্ধ!

প্রতি রাজ্য সরকারের বদান্যতার খবর কি জ্যোতিবাবু রাখেন না? আর সে কৃপার মূলে যে তাঁর রাজনৈতিক ইমেজ সেটিও মুখ্যমন্ত্রীর জানার কথা। তবু জ্যোতিবাবু এ ব্যাপারে কড়া হতে পারেন নি। রাজ্য সরকারের বদান্যতায় চৌত্রিশ বছরের চন্দন বসু ন' বছরের মধ্যেই হয়ে উঠেছেন দুঁদে শিল্পপতি। বিস্কুট এবং কনফেকশনারি কারখানা ছাড়াও চন্দন আটটি অয়েল ট্যাংকারের মালিক। তার ওপর আবার শ্বশুরের 'আমিনচাঁদ প্যারেলাল অব জলন্ধর' কোম্পানির একজন কর্মচারিও বটেন। চন্দনবাবু এখন বাস করেন পার্কস্ট্রীটের কুইনস ম্যানসনের একটি ফ্ল্যাটে।

মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র বলে চন্দন বসু ব্যবসা করে ধনী হতে পারবেন না, এমন কোন কথা নেই। বরং শিল্প-বিমুখ বাঙালী সমাজের দিকে তাকিয়ে চন্দনের অধ্যবসায়কে তারিফ জানানো যেতেই পারে। কিন্তু তাঁর কারবার নিয়ে নানা গুরুতর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে, যা বামফ্রন্ট সরকারের 'সৎ ও সুস্থ' প্রশাসনের দাবী অনেকটাই খর্ব করে দেয়। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার এখনো নীরব আর চন্দনবাবুও মুখ খুলছেন না। অথচ এ সবের সঙ্গে শুধু বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূর্তিই জড়িত নয়, জড়িয়ে আছে জনসাধারণের স্বার্থের প্রশ্নও।

১৯৭৭ সালে জনতা সরকারের চিট্‌ফাণ্ড বিরোধী বিলকে স্বাগত জানিয়ে বামফ্রন্ট সরকার 'সঞ্চয়িতা'র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পিয়ারলেস সংস্থাও তখন থেকে সেই সংকটের মুখোমুখি। বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকারের নীতিই হল চিট ফাণ্ডের বিরোধিতা করা। ডঃ আশোক মিত্র এই আন্দোলনেরই সূত্রপাত করেছিলেন। অথচ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র চন্দন বসু সেই বেআইনি কারবারের সঙ্গে যুক্ত। সঞ্চয়িতা-মার্কা 'স্টার ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি'র তিনি অন্যতম অংশীদার এবং ঠিক তখন থেকে যখন কেন্দ্রে জনতা সরকারের বিলটি পাস হয়ে গেছে। তাহলে এই সাহস চন্দনবাবু

কোথা থেকে পেলেন ? জ্যোতিবাবু কি এসব জানেন না ? তিনি কি পুত্রকে নিরস্ত করেছেন ? তবে চন্দনবাবুর কারবার এখনো চলেছে।

আমাদের দেশের রাজনীতিতে কোন মানুষই বোধহয় অজাতশত্রু নয়। দারুণ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও জ্যোতিবাবুরও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব নেই। তবু জ্যোতি বসু দীর্ঘ দিনের সংগ্রামী ঐতিহ্যে উজ্জ্বল একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া মানুষের আশা আকাংখার মূর্ত প্রতীক। সেই জ্যোতিবাবু কি আজ ন' বছরের প্রশাসনের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন ? বয়সের ভারে তাঁর কঠোর সংগ্রামী চেতনাকে ছেয়ে ফেলছে অপত্য স্নেহ ? নইলে জ্যোতিবাবুর মত একজন রুচিশীল অভিভাবক ক্লাবে, পার্টিতে চন্দনের দৃষ্টিকটু কাণ্ড–কারবার বরদাস্ত করে চলেছেন কিভাবে ?

ইন্দিরা তনয় সঞ্জয়কে নিয়ে রাজনারায়ণ বহুগুণাদের সঙ্গে ঝড় তুলেছিলেন জ্যোতিবাবুরা। সে ঝড়ে দিল্লির মসনদ পর্যন্ত উল্টে যায়। সেই জ্যোতিবাবুর নামেই আজ অভিযোগ তিনি বোম্বাই যাচ্ছেন পুত্রের শিল্প প্রসারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে।

জ্যোতিবাবুর বোম্বাই যাত্রা নিয়ে গুঞ্জন চলতে চলতেই রটনার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন আলপনা গোস্বামী। অবশ্য সশরীরে নয় নিরুদ্দেশ হয়ে। কেউ বললেন তিনি গেছেন বোম্বাই, কেউ বললেন মাদ্রাজে, কেউ বললেন আমেরিকা। কিন্তু স্টুডিও পাড়ার এলোমেলো হাওয়ায় ভাসতে লাগল আরেক কথা। বাংলাদেশী এক প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতে আলপনা নাকি আমেরিকা গেছেন।

আলপনা যেখানে খুশি যেতে পারেন। কিন্তু কান টানলে মাথা আসার মত সে গুঞ্জনেও জড়িয়ে গেলেন চন্দন বসু। যুগান্তরের ভাষ্য অনুসারে, তিনিই নাকি বাংলাদেশী প্রেমিকের সঙ্গে আলপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। গুজব সেখানেই থিতিয়ে গেল না। চন্দন-আলপনা উপাখ্যান নিয়েও চতুর্দিকে লেখালেখি শুরু হল।

বড় বড় শিল্পপতিদের মত তরুণ শিল্পপতি চন্দন বসুও এখন কলকাতার বিভিন্ন নামী ক্লাবের সদস্য। ক্লাবে, পার্টিতে বড় বড় ডিল নিয়ে প্রায় এক দশক ধরেই তিনি খুব ব্যস্ত। এসব ব্যাপারে সুন্দরীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সুতরাং তাদের উপস্থিতি চন্দনবাবুর পার্টিতেও আবশ্যিক। একদিকে ডিগনিটি, অন্যদিকে নিপুণ অতিথি আপ্যায়ন–দুটি কাজেই সুন্দর মুখের জয় অপ্রতিরোধ্য। আলপনার মুখটি এই কাজের উপযোগী। তিনি সুন্দরী, তার সঙ্গে আছে চিত্র নায়িকার গ্ল্যামার, সর্বোপরি 'সঞ্চয়িতা'র মালিক শম্ভু মুখার্জির সঙ্গে আলপনার ছিল নিবিড় সম্পর্ক। তা নিয়ে নানা মুখরোচক খবরও প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে। 'সঞ্চয়িতা'র অন্যতম অংশীদার তপন গুহের বাগান বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্টেও আলপনার নিভৃত অবস্থানের কিস্‌সা বেরিয়েছে পত্র পত্রিকায়। তপনবাবুর সহযোগিতাতেই তাঁর ছায়াচিত্রে আবির্ভাব। বন্ধুত্বের সুবাদে চন্দনবাবুও এই লাস্যময়ী অভিনেত্রীকে কাজে নামালেন। আলপনা হয়ে উঠলেন চন্দনবাবুর বিজনেস পার্টনার।

বিজনেস থেকে সম্পর্ক গড়াল অন্দর মহলেও। ইতিমধ্যে শম্ভু মুখার্জি হাসপাতালে আত্মহত্যা করেছেন, আর তপনবাবু করেছেন আত্মগোপন। চন্দনবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক জমাট বাঁধার আগেই আলপনা গাঁটছড়া বেঁধেছেন রূপালি পর্দার আরেক নায়কের সঙ্গে। তাঁর নাম জর্জ বেকার। তাঁর সঙ্গেও চন্দনবাবুর পরিবারের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে এই নিবিড়তার ফাঁকেই নাকি বেহুলার লৌহ-নির্মিত ঘরের মত দুই পরিবারের হৃদয়ের ফাটলও শুরু হয়। চন্দনের সঙ্গে আলপনার সম্পর্ক যেমন গভীর হয়ে ওঠে, তেমনি বাড়তে থাকে জর্জ বেকারের সঙ্গে ডলি বসুর অন্তরঙ্গতা। সম্প্রতি ডলি বসু জর্জ বেকারের সঙ্গে কলকাতা দূরদর্শনে

সস্ত্রীক জ্যোতি বসু : কোন দুশ্চিন্তার ছায়া দুজনের মুখে ?

অভিনয়ও করেছেন। উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর এই হিন্দি ছবিটি ন্যাশনাল হুক-আপেও দেখানো হবে। ছবিটির নাম 'রং'। কাহিনী সমরেশ বসুর। উৎপলেন্দু অবশ্য ছবির প্রয়োজনে গল্প অনেকটা বদলে নিয়েছেন। একটি আন্তর্জাতিক বহুজাতিক সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর জর্জ বেকার। তার স্ত্রীর ভূমিকায় ডলি বসু। পুত্রবধূর এই অভিনয়ে মুখ্যমন্ত্রী নাকি অসন্তুষ্ট, বিরক্ত নাকি চন্দন বসু নিজেও। এদিকে নানা মহলের ধারণা, আলপনার সঙ্গে চন্দনের মাখামাখি বেড়ে যাওয়ার বদলা নিতেই নাকি সনাতন গৃহবধূ ডলি বসু জর্জ বেকারের সঙ্গে টিভিতে অভিনয় করেছেন।

একের পর এক গুজব উঠেছে চন্দনবাবুকে ঘিরে। আর তাতে নানাভাবে জড়িয়ে পড়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও। আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গেই কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু জ্যোতিবাবুর নাগাল পাওয়া যায়নি। নানা কাজে তিনি ভীষণ ব্যস্ত। যতবার যোগাযোগ করেছি ততবারই জানা গেছে তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত। পার্টির নেতারাও এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি। অগত্যা যোগাযোগের চেষ্টা করি চন্দনবাবুর সঙ্গে। কিন্তু ২৮ এপ্রিল সারাদিন টেলিফোন করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। লাইন খারাপ। পরদিন সকালেও একই অবস্থা। বাধ্য হয়ে তাঁর বাসায় যেতে হয়। বলাবাহুল্য তখন সকাল সাড়ে আটটা। কারণ আমাদের কাছে খবর ছিল চন্দনবাবু সকাল ন'টায় বেরিয়ে যান। কিন্তু শুনি চন্দনবাবু তখনো ওঠেন নি। এবং আমরা যে নম্বরে (২১-২৪৮৫) বারবার ডায়াল করেছিলাম সেটি সম্প্রতি চেঞ্জ হয়েছে। চন্দনবাবুর স্ত্রী ডলি বসুই আসল টেলিফোন নম্বর লিখে দেন বাড়ির সঙ্গে অফিসেরও। আমরা তাঁরও একটি সাক্ষাৎকার চেয়েছিলাম। কিন্তু ডলি বসু রাজি হননি। আমরাও তাঁকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিনি। ডলি বসুর কথামতই চন্দনবাবুকে তাঁর অফিসে ফোন করি বেলা ঠিক সাড়ে দশটায়। সাড়া পাই। কিন্তু 'কাগজওয়ালাদের' ইন্টারভিউ দিতে চন্দনবাবু একদমই রাজি হন না। বলেন, 'আমি খেটে খাওয়া মানুষ। রাজনীতি করি না।' আমরা বলি, 'আপনার সম্পর্কে নানারকম খবর বেরোচ্ছে। নিশ্চয়ই সে সব পড়ে থাকবেন।' সঙ্গে সঙ্গে চন্দনবাবুর জবাব–'আপনারাও লিখুন।'

"কিন্তু আমরা আপনার বক্তব্যও প্রকাশ করতে চাই। সে জন্যই আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার।' অপর প্রান্ত থেকে চন্দনবাবু বলেন, 'দেখুন, আপনি এসে বন্ধু হিসাবে এক কাপ চা খেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ইন্টারভিউ আমি দেব না। আমাকে

বাবা নিষেধ করেছেন ।'

আমরা বলি, 'আপনি যদি অন্তত পাঁচ মিনিট কথা বলতে রাজি হন তাহলে নিশ্চয়ই যাব ।'

কিন্তু চন্দনবাবু কিছুতেই রাজি হলেন না । বরং ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, 'আমি মশাই খেটে খাওয়া মানুষ । আপনি সকাল সাড়ে আটটায় আমার বাড়িতে চলে গেছেন! আমার স্ত্রীর ইন্টারভিউ নিতে চাইলেন!"

তাঁকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে লাইন ছেড়ে দিতে হল ।

ইতিমধ্যে আমাদের কাছে খবর আসে আলপনা গোস্বামী কলকাতায় ফিরেছেন । কিন্তু জর্জ বেকার তার আগেই অন্য কোথাও চলে গেছেন । অবশ্য স্টুডিও পাড়ায় আমাদের সোর্সের খবর হল, জর্জ

মাইণ্ড। কিন্তু আমার একটাই খারাপ লাগে গুজবটা যখন মিথ্যে গুজব হয় । আমার মনে হয় সাংবাদিকদের কিছু সত্যি কথা লেখা উচিত । কারণ সত্যি না লিখে মিথ্যে কথা লিখে তো কোন লাভ নেই । আজ না হয় কাল তো জানা যাবেই হোয়াট শি ইজ ডুইং অর হোয়াট হি ইজ ডুইং । তখন তো খবরটা মিথ্যে হয়ে যাবে ।"

"তাহলে আমেরিকা যাননি?"

আলপনা সপ্রতিভভাবে জবাব দিলেন–"আই লাভ টু গো । আমেরিকায় যেতে পারার মত ভাগ্য খুব কম লোকের হয় । আমাদের এই গরীব ইণ্ডাসট্রিতে কাজ করে ক'জন লোক আমেরিকা যেতে পারে ? তাহলে আই উইল বি ভেরি প্রাউড, বলব যে, হ্যাঁ ভাই, আমি আমেরিকা যাচ্ছি ।
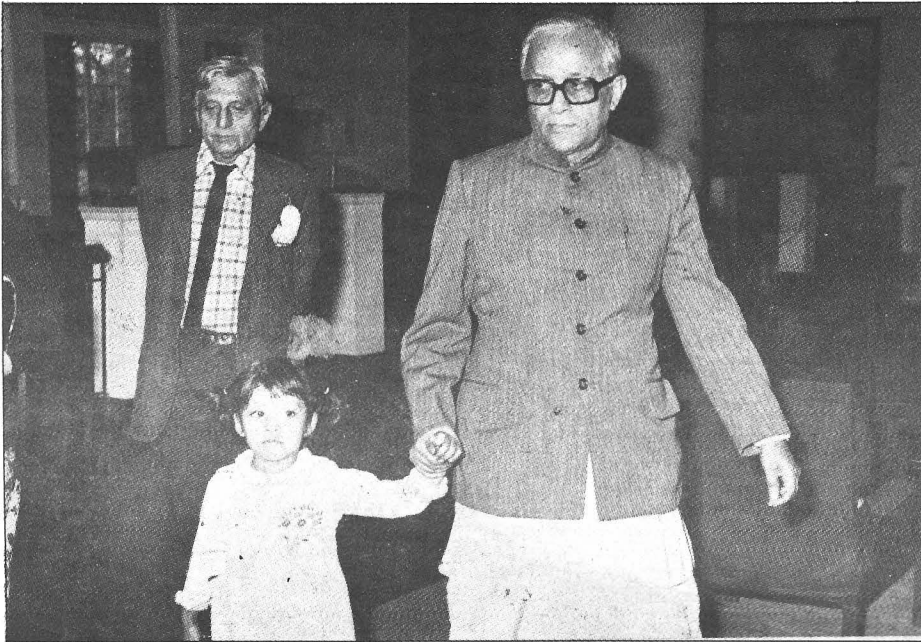
জ্যোতি বসু নাতনীর সঙ্গে, পাশে চন্দনের শ্বশুরমশাই

কলকাতা ছেড়েছেন আলপনার আগেই–৩ মার্চ । আর আলপনা বাইরে যান ২৭ কিংবা ২৮ মার্চ ।

যাই হোক, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আলপনা আমাদের সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হন । প্রায় এক ঘন্টার সাক্ষাৎকারে তিনি কথা বলেছেন অকপটভাবে–স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতায় । কিন্তু চন্দনবাবুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে একেবারেই মুখ খোলেন নি, আর ছবি তুলতে দিতেও রাজি হননি প্রচণ্ড টেনশনের মধ্যে আছেন বলে । তবে কথায় কথায় তিনি চন্দনের প্রশংসা করেছেন । বলেছেন, চন্দন খুব ভাল ছেলে । বেচারা মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে বলে সবাই তাঁর পিছনে লাগছে । এবং চন্দন তাঁর 'ব্যক্তিগত বন্ধু'।

আমরা জানতে চাইলাম, তাঁর সম্পর্কে প্রায় মাস খানেক ধরে নানান মুখোরোচক খবর হয়েছে। সেসব তিনি পড়েছেন কিনা ? তা আলপনা সব খবরই পড়েছেন। পড়ে 'একসাইটেড'ও হয়েছেন। তাঁর কথায় : "গুজব তাঁদের নামেই ছড়ায় যাঁরা একটু ফেমাস হচ্ছেন । এক্‌জাক্‌টলি আই ডোন্ট

এতে লুকোবার কি আছে ?'

"শুধু আমেরিকাই নয়, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান সম্পর্কেও আপনার নামে গুজব রটেছে।" আলপনার স্পষ্ট জবাব–"রটতে পারে । আমি ভয় করি না ।"

"পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক শত্রুঘ্ন সিন্‌হার ব্যক্তিগত বন্ধু। গত ন মাসে তিনি তিনবার পাকিস্তান গেছেন ।"

আলপনা কথার মাঝখানে বিরক্তি প্রকাশ করেন, "কি আশ্চর্য, এ সবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ?"

"মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে শত্রুঘ্ন কলকাতা এলে নাকি আপনি আহ্লাদে আটখানা হয়েছিলেন । আপনার বুদ্ধির খেলায় হেরে মুনমুন তখন মাদ্রাজে স্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত । আর শত্রুর নতুন বান্ধবী কিমি কাতকার কলকাতায় এলেও আপনার জন্যই বেচারি নাকি শত্রুর পার্টিতে ঘেঁষতে পারেন নি । মাঝরাতে কলকাতায় এসে শত্রু হোটেল থেকে আপনাকেই প্রথম টেলিফোন করেছিলেন, যেমনটি আগে কখনো হয়নি । এসব ব্যাপারে ভুলে গিয়েই বোধহয় শত্রুকে জড়িয়ে আপনার নামে কথা রটেছে? শত্রুর ভোজপুরী ছবি 'বিহারীবাবু'তে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়েও তো পাটনায় আপনার নামে কথা ছড়িয়েছিল–'বিহারীবাবু বাঙালী বিবি লে আয়ে হ্যাঁয় ।' খবরটা নাকি শত্রুর আসল বিবির কাছেও পৌঁছেছিল ।"

এ সম্পর্কে আলপনার জবাব–"ফিল্ম এক্‌ট্রেসদের সম্পর্কে এ রকম মুখরোচক গুজব সব সময়ই ছড়ানো হয় । গুজব নিয়ে মাথা ঘামাই না । আমি শত্রুর ছবিতে কাজ করছি । শত্রু একজন দারুণ মানুষ, এবং আমার ব্যক্তিগত বন্ধু । তিনি কলকাতা এলে আমাকে টেলিফোন করবেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখব এর মধ্যে অস্বাভাবিকতার কি আছে ?"

"তাহলে আসলে আপনি কোথায় গেছিলেন ?"

আলপনা বললেন, "আমেরিকাও নয়, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানেও নয়–আজমীর গেছিলাম শত্রুর ছবিতেই কাজ করতে ।"

"আচ্ছা, আমেরিকার কথাটা এত জোর দিয়ে উঠছে কেন বলুন তো ? আপনি নিজেও বলছেন, ইউ লাভ টু গো । ইজ দেয়ার অ্যানি অ্যাট্রাকশন্ ইন আমেরিকা ?"

আলপনা বললেন, "দেখুন, ফিল্ম জার্নালিস্টরা স্ক্যানডাল ছড়াতে ভালবাসেন । তাঁদের এই স্ক্যানডালের একটা ক্লু এই হতে পারে যে, ন্যুইয়র্কে ডালিম বসু নামে আমার এক বন্ধু আছেন । আমেরিকান একসপ্রেসের কর্মী । ভাইয়ের বিয়েতে সম্প্রতি তিনি কলকাতা এসেছিলেন । স্বাভাবিকভাবেই আমার সঙ্গেও তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল। এই ব্যাপারটিকেই সাংবাদিকরা হয়তো ফেনিয়ে দিয়েছেন ।"

"কিন্তু শোনা যাচ্ছে আমেরিকায় আপনার একজন বাংলাদেশী প্রেমিক আছেন ?" আলপনা এবার খানিকটা উত্তেজিতভাবে বললেন, "দেখুন, আই অ্যাম কোয়াইট ম্যাচিওরড । আমাকে কেউ খাওয়ায় না, কেউ পরায় না । আমি যা করেছি সব নিজে । আমি কাকে ভয় করব ? আমার যদি একটার জায়গায় দশটা বিয়ে করতে ইচ্ছা হয়, সেটা অ্যাবসোলিউটলি মাই বিজনেস । আমার নিজের ব্যাপার । বয়সের একটা সন্ধিতে এসে যদি এসব ব্যাপারে ভয় পেতে হয় তাহলে জীবনে করলাম কি ?"

"কিন্তু আমেরিকায় নাকি আপনার কোন বাংলাদেশী প্রেমিক থাকেন ? খবর বেরিয়েছে তাঁর সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতেই আপনি পাড়ি দিয়েছিলেন মার্কিন মুলুকে ?"

আলপনা বিরক্ত হলেন । বললেন, "বললাম তো আমেরিকা যাইনি ।"

"বাংলাদেশে আপনার প্রেম সম্পর্কে যা রটেছে তাও কি মিথ্যে ?"

আলপনা বললেন, "হ্যাঁ, সবটাই গুজব । ওরা তো কারো নাম পর্যন্ত করতে পারছে না ।"

"কেন, নামও তো শোনা যাচ্ছে ।"

"কে তাঁরা ?"

চন্দন বসু, যার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ইমেজ আজ প্রশ্নের সম্মুখীন

"জাফর ইকবাল এবং ইলিয়াস কাঞ্চন। ওদের সঙ্গে নাকি ঢাকায় মাঝরাত পর্যন্ত আপনি হুড়োহুড়ি করেছিলেন কার্ফু আইন অমান্য করে। এসব খবর বিভিন্ন কাগজেও বেরিয়েছিল। স্যুটিংয়ের অবসরে বাংলাদেশের কিছু জাঁদরেল ও ধনী লোকের সঙ্গেও নাকি আপনার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল ? বাংলাদেশ থেকে আসার সময় আপনি নিজেও নাকি বলেছিলেন, যা করে গেলাম এরপর বাংলাদেশ সরকার আর বোধহয় আমাকে ভিসা দেবে না।"

আলপনা বললেন, "সব বাজে খবর। প্রতিদিন কত খবর বেরোয়। কে কত প্রতিবাদ করবেন ? জাফর ইকবাল ও ইলিয়াস কাঞ্চন দুজনেই আমার হিরো। এর বাইরে তাদের সঙ্গে আমার কোন রিলেশন নেই। আমি শত্রুর সঙ্গে প্রেম করছি, এর সঙ্গে প্রেম করছি, ওর সঙ্গে করছি। কি অদ্ভুত সব কথা–আমি একসঙ্গে কতজনের সঙ্গে প্রেম করছি ? আর আমার যদি কাউকে ভাল লাগে, কারো সঙ্গে প্রেম করি তাতে লোকের এত বলার কি আছে ? আমি কারো খাই না, পরি না। আমি যা করেছি সবই নিজের চেষ্টায়। আমি কাকে ভয় করব ?"

"আপনার সঙ্গে জ্যোতিবাবুর পুত্র চন্দন বসুর সম্পর্ক নিয়েও কথা উঠেছে। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ?"

আলপনা বললেন, " এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলব না।"

"আপনার সঙ্গে জ্যোতিবাবুর আলাপ আছে ?"

আলপনার একই জবাব–"বললাম তো এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলব না।"

"তাহলে বোধহয় জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আপনার কোন আলাপ পরিচয় নেই ?"

আলপনা বললেন, "আছে কি নেই, কিছুই বলব না।"

পরে অবশ্য আলপনা কথা প্রসঙ্গে চন্দন বসুর খুব প্রশংসা করেন। তাকে প্রশ্ন করা হয়, "জর্জ বেকার কোথায় গেছেন ?"

আলপনার স্পষ্ট জবাব, "জানি না।"

"জর্জ কি আবার আপনার ফ্ল্যাটে ফিরে আসবেন ? মানে আপনার সঙ্গে তার সম্পর্কে কোন চিড় ধরেনি ?"

আলপনা বললেন, "প্লিজ, এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করবেন না।"

"আপনার প্রথম ছবি কি ?"

"সূর্যতৃষা। ১৯৭৮-এ পরিচালক আশুতোষ ব্যানার্জির ছবি। পরের ছবি 'অরুণ বরুণ কিরণমালা।"

"আগে কোথাও অভিনয় করেছেন ?"

আলপনা বললেন, "হ্যাঁ আমি বিশ্বরূপায় ছিলাম।"

"তার মানে অভিনয় করার একটা বেন্ট আপনার বরাবরই ছিল ?"

আলপনা "না, তা ঠিক নয়। তবে ছোটবেলায় সকলেরই হয়তো একটা ইচ্ছা থাকে ফিল্মের অ্যাকট্রেস হবার। কিন্তু সবার জীবনে তো সেটা সম্ভব হয় না। আমার জীবনে অ্যাকসিডেন্টলি সেই সুযোগটা এসে গেল।"

"সেই অ্যাকসিডেন্টটা কি ?"

আলপনা "সেটা অনেক বড় কাহিনী। আমি মনে করি না সেসব এখানে বলার দরকার আছে–আই ডোন্ট থিংক। দিস ইজ মাই অ্যাবসোলিউটলি পারসোনাল। অনেক ব্যাপার আছে–আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিপিট দ্যাট।"

নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জীবন সংগ্রামী আলপনা আজ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার জন্য তাকে কম মূল্য দিতে হয়নি। মূল্য না দিয়ে এ সমাজে অসহায় মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা এক কথায় অসম্ভব। আলপনা সেই অতীত জীবনের কথা আমাদের বলতে না চাইলেও আমরা তার অনেক ঘটনাই জানি। মাত্র পনেরো বছর চার মাস বয়সে হুগলির সাহাগঞ্জের মেয়ে আলপনার বিয়ে হয় চন্দননগরের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে। কিন্তু সে বিয়ে সুখের হয়নি। তারপর থেকেই বাঁচা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আলপনাকে নামতে হয় কঠোর সংগ্রামে। বস্তুত আলপনার 'গোস্বামী' পদবিটি তাঁর পূর্বতন স্বামীর। সে পক্ষের দুটি কন্যাও আছে, যারা এখন আলপনার কাছেই সস্নেহে লালিত হচ্ছে।

আলপনা গোস্বামীর হাতে একটি পোড়া দাগ আছে। শুধু হাতেই নয়–পোড়া দাগ আছে শরীরের আরেক বিশেষ জায়গায়। সেই দাগের দিকে তাকিয়ে আলপনা বোধহয় এখনো মনে মনে দগ্ধ হন–বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। এইভাবেই হয়তো সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর একটি ব্যতিক্রমধর্মী মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। সেই মূল্যবোধের উত্তেজনাতেই আলপনা বলে ওঠেন, আমার যদি একটার জায়গায় দশটা বিয়ে করতে ইচ্ছা হয় তাতে কাউকেই তিনি ভয় করেন না। তাঁর বিদ্রোহী
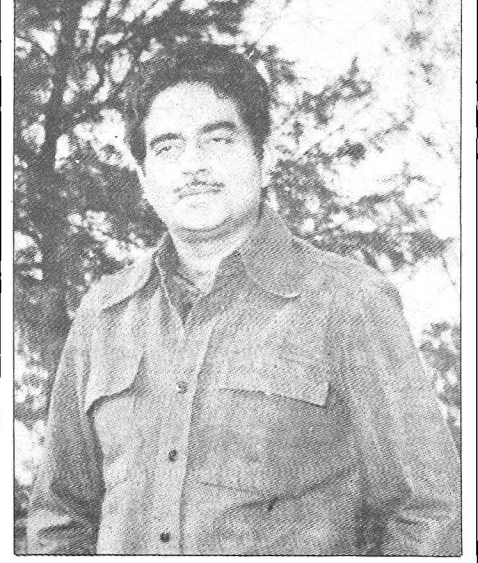
শত্রুঘ্ন সিন্‌হা : গোপন যোগাযোগ ?

ও নির্ভীক আচরণ আমাদের সমাজের অসার মূল্যবোধকেই ভেঙে দিতে চায়। আলপনা সেসব ব্যাপারে অকপট এবং স্পষ্টবাদী। কিন্তু যাঁরা সমাজের উপরের খান, আবার তলারও কুড়োন তারা কিন্তু আলপনার কাছের মানুষ হয়েও আলপনার মত স্পষ্টভাবে সে কথা স্বীকার করার সাহস রাখেন না।

এহেন সাহসী আলপনাও জ্যোতিবসুর পরিবার নিয়ে কথা বলতে ভয় পেয়েছেন। বলেছেন 'আমার ক্ষতি হয়ে যাবে,' অথচ ওকে নিয়েই চন্দন বসুকে জড়িয়ে মুখোরোচক খবর রটছে। যেহেতু চন্দন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর একমাত্র পুত্র সেহেতু বিষয়টিতে পাবলিক ইমেজ জড়িত। এবং সেজন্যই আমরা বাধ্য হয়েছি বিতর্কটির অনুসন্ধানে।

প্রকৃতপক্ষে চন্দন বসু, তস্য পত্নী ডলি বসু, আলপনা গোস্বামী এবং জর্জবেকারদের 'ক্রিশক্রশ রিলেশন' রটনা প্রভাবিত করছে পশ্চিমবঙ্গের জনমানস। কেননা এর মধ্যে আবর্তিত হয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক প্রিয় রাজনৈতিক পরিবারটি।

৭০ দশকে এরকমই একধরনের কথাবার্তায় সঞ্জয়ের জন্য তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তায় চাপ পড়েছিল। মোরারজি তনয় বা মার্গারেট থ্যাচারের ছেলেকে নিয়েও ঘটেছে অনুরূপ ঘটনা। এখন চন্দনের জন্য চাপ পড়েছে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ওপর। এই ঘটনা নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন মহলে কথাবার্তা থেকে একটা প্রশ্নই ফুটে উঠেছে: এরকম পরিবেশে জ্যোতি বসু কি করে পারিবারিকভাবে সুখী হতে পারেন ?

পাশ্চাত্যে শিক্ষিত জ্যোতি বসু যদি এই প্রসঙ্গে বিলেতীয়ানার মত লিবারেল হন তাহলে আমাদের কিছুই বলার নেই। কিন্তু যদি এবিষয় নিয়ে মানসিকভাবে দুঃখিত হন, তাহলে তাঁর সঙ্গে সারা দেশ দুঃখিত। আমরাও।

ছবি : অর্ধেন্দু রায়, প্রমোদ ভানুশালী, অশোক বসু

শাশুড়ি বধূ-উপাখ্যান

মেনকা গান্ধী

বরুণের মা হিসেবে ওর ভাবী স্ত্রীকে আমি এখন থেকেই হিংসে করতে শুরু করেছি। একটা অচেনা মেয়ে বৌ হয়ে আমার বাড়িতে ঢুকে আমার ব্যক্তিগত সময়, আমার জীবন ধারণের অভ্যেস সবকিছুর ওপর হস্তক্ষেপ করবে, সবচেয়ে বড় কথা হ'ল সে আমার ছেলেকেও দাবী করবে। তার মতামত হয়ত আমার সঙ্গে সবসময় সমতা রেখে চলবে না, তার লক্ষ্য তার মূল্যবোধ সবই হয়ত হবে আমার থেকে আলাদা। সে হয়ত আমাকে ব্যঙ্গ করবে আমারই অগোচরে। তার পোষাক আশাক, তার মজা করবার ধরনধারণ এমন কি তার খাওয়াদাওয়ার রীতিপ্রকৃতিও আমাকে বিরক্ত করে তুলতে পারে। আর এসবই আমাকে নীরবে সব সহ্য করে যেতে হবে। আমার ছেলে যাতে আমার প্রতি বিরূপ না হয়ে ওঠে সেই ভয়ে।

না, আমি আমার ছেলের জন্য বেশী বয়সের কোনও মেয়ে চাই না। আমার ছেলের বিয়ে দিতে হলে আমি একটা ছোট্ট মেয়েকেই খুঁজে নেব, তারপর মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান করব। তারপর সে তার ইচ্ছেমত মা বাপের আর আমার বাড়ির মধ্যে আসা যাওয়া করবে। ধরুন আমি এমন একটা মেয়েকে খুঁজেও পেয়েছি—বড় বড় চোখ আর মিষ্টি কন্ঠস্বর সেই পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটার—সে বরুণকে মেনে নিতে পারবে 'সুপার-ম্যান' হিসেবে সহজেই। বলুন ছেলের মায়েরা ঠিক এইভাবে ভাবে না ?

আমরা সকলেই ঠিক এইভাবে 'বউ'-এর পরিবর্তে মেয়ে চাই। কেউ কেউ এর ফলে বিভিন্ন অসুবিধের সম্মুখীনও হই। আমি আগেই বলেছি, নীরবে আমরা কষ্ট সহ্য করে যাই। তবুও যখন আমরা শাশুড়ির ভূমিকাটা পেয়ে যাই তখন পরিবারের নতুন সভ্যাটির প্রতি কেমন যেন রূঢ় হয়ে উঠি। আশ্চর্য, আমি অনেক বয়স্কা মহিলার মধ্যেই দেখেছি সেই একই অদ্ভুত মনোভাব, ছেলেটা আমার, নাতিও আমার কিন্তু ছেলের বৌ পরের মেয়ে পরিবারের গোপন ব্যাপারগুলো জেনে ফেলুক আপত্তি নেই, কিন্তু সিন্দুকের চাবি যেন বৌয়ের হাতে না পড়ে।

পণপ্রথাজনিত মৃত্যুগুলোর পেছনে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণই নেই। শুধুমাত্র টাকাপয়সার জন্যই কেউ পরিবারের একজনকে খুন করে ফেলতে পারে না। আসলে ছেলের বৌকে এসব-ক্ষেত্রে পরিবারের একজন তো নয়ই, মানুষ বলেও ভাবা হয় না। সে এমনই একজন যাকে আনা হয়েছে শুধুমাত্র ছেলের শারীরিক ও আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্যই, সেগুলি পরণ করতে সে যদি সক্ষম না হয় তাহলেই ঘটে বিপর্যয়। এজন্য বিধবা পুত্রবধূর সঙ্গে কি অসহনীয় আচরণ করা হয়, একবারও ভাবা হয় না স্বামীর মৃত্যুর পর বেচারীর মনের অবস্থাটা কি রকম হতে পারে ? পরিবারে তার অবস্থা তখন দাঁড়ায় বাড়তি একটা আপদের মত, তার থেকে বেশি কিছুই নয়।

পরিবারে কে আপন কে পর, এই বিচার-ধারার সূত্রপাত ঘটান কিন্তু শ্বশ্রুমাতাই। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে পরিবারে স্বামী আর স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে পণপ্রথাজনিত মৃত্যু ঘটে না। তাই যেসব মেয়ে একান্নবর্তী পরিবারের বউ হতে যাচ্ছেন তাদের আমি বলব, আপনারা স্বামী-কেই বিবাহিত জীবনের ধ্রুবতারা না করে বরং শাশুড়িকে পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নিন।

আমার নিজের যখন নতুন বিয়ে হ'ল সে দিনগুলোর কথা মনে করতে গিয়ে এখন ভাবি, সে সময় নববধূ হিসেবে আমিই যে শুধু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম তাই নয় আমার শাশুড়িও কিছুটা নার্ভাস ছিলেন। প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমি যেন ছিলাম সংসারের অতিথিই। তিনি তো আমাকে সাদরে বরণ করে তুললেন, তারপর প্রতিদিনই বাড়িতে আমার পছন্দসই খাবারদাবার তৈরি হতে লাগল। তারপর অবশ্য আমাদের সম্পর্কটা স্বাভা-বিকভাবেই এগোতে লাগল, এর কারণ ছিল মূলত: আমরা দুজনেই যে যার কাজে ব্যস্ত থাকতাম। আমি তখন ছিলাম কলেজের ছাত্রী, এর কিছুদিন পরেই যোগ দিই 'সূর্য' পত্রিকায়। সে সময় আমার শাশুড়ির হাতে সময় থাকত, আমরা দিনের খাওয়াদাওয়া একসঙ্গেই সারতাম, এমনকি কখনও নৈশাহারও। উনি আমাকে জানাতেন ওঁর ভাল লাগা, ভাল না লাগার কথা, ওঁর আকর্ষণের বিষয়-গুলো। উনি চাইতেন আমিও যেন ঐ সব ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে সমতা রেখে চলি, কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য ওঁকে দেখেছি আমার ওপর জোর করে কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার

শাশুড়ি ইন্দিরা, পুত্রবধূ মেনকা ছবি: রাজীব চাওলা

চেষ্টা করতে, অবশ্য তা সামান্য কয়েকবারই। যেমন উনি হঠাৎ একদিন আমাকে বললেন কাল রংয়ের পোশাক না পরতে। যখন আমরা দুজনেই বুঝতাম আমাদের দুজনের মধ্যে সংঘাত আসন্নপ্রায় তখন কয়েক ঘন্টার জন্য আমাদের সম্পর্কটা খুব শীতল হয়ে যেত। উনি হঠাৎ চুপ করে যেতেন, যার কোনও কারণই কখনও উনি জানাতেন না। অবশ্য কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমাদের সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক হয়ে আসত। আমি তাঁকে ভাল বাসতাম, তিনিও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। কিন্তু কখনই তিনি তার দু'ছেলের বউকে কোনক্রমে মনে করতে দেননি যে তারা তাঁরই মেয়ের মতন। একটা স্পষ্ট বিভেদরেখা সবসময়েই ছিল। আমরা ছিল্যাম তার পুত্রবধূ, আমাদের প্রতি তার স্নেহ ছিল সেই অনুপাতেই যতটা আমরা তাঁর ছেলেদের সুখী করতে পারব বা তার নাতি নাতনিদের ভালভাবে মানুষ করে তুলতে পারব। সংসারে সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোই নেওয়া হতো ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করে। একমাত্র যদি ছেলেরা চাইত যে আমরাও আলোচনার সামিল হই, তাহলেই তা হত। তবুও আমি এত খুশি ছিলাম পরিবারের চৌহদ্দীতে যে ১৯৮০ র নির্বাচনের পর সঞ্জয় যখন তার কাজকর্মের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় অন্য বড়িতে যেতে চাইল তখন আমিই তাকে বাধা দিলাম। কিন্তু সঞ্জয় যখন মারা গেল, আমি সেই চিরাচরিত শাশুড়ির রূপটিকে প্রত্যক্ষ করলাম।

আপনারা জানেন কি সামাজিক অবস্থান বা আয় মানুষের স্বাস্থ্য এবং সুখকে যতটা নিয়ন্ত্রিত করে, তার থেকে বেশি করে সামাজিক সম্পর্কগুলি? সঞ্জয় মারা যাবার পর আমি প্রায় মাস ছয়েক অসুস্থ ছিলাম। আমার এই অসুস্থতার কারণ অংশত ছিল আমি আমার ভালবাসার পাত্রকে হারিয়ে প্রেমহীনতায় আক্রান্ত হয়েছিলাম কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার বোধই ছিল বোধহয় তার প্রধান কারণ। বিস্তৃত সামাজিক সমীক্ষার পর 'অ্যানাটমি অফ্ রিলেশানশিপ' বলে যে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, তাতে একটা আশ্চর্য তথ্য পাওয়া গেল। বইটিতে বলা হয়েছে শুধুমাত্র পরিবারের সঙ্গে সুস্থ এবং নিবিড় সম্পর্ক থেকেই আপনি পেয়ে যেতে পারেন মানসিক এবং শারীরিক সুখরাজি আর সুস্বাস্থ্য, সর্বোপরি দীর্ঘজীবন। তাই যেসব-মেয়েরা অশান্তিতে ভোগেন, তাদের আমার পরামর্শ হ'ল আর কিছুর জন্য না হোক দৈহিক এবং মানসিক সুখলাভের জন্যও অন্ততঃ শাশুড়ির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

কিন্তু এখানেও দুপক্ষের জন্য একটা সতর্কতাবাণী আছে। এটা তো জীবনেরই একটা ব্যবহারিক অঙ্গ যে যখন পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত আসে, ভারসাম্য বজায় থাকে না তখন সেই সম্পর্কটাই ভেঙ্গে যায়। যদি কেউ দেখেন যে উভয়পক্ষীয় সম্পর্কের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে তখন তো সে সম্পর্কটাকে ভেঙ্গে না দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাটা এরকম হওয়াই বাঞ্ছণীয়, যদি কোনও শাশুড়ি তার ছেলেকে নিজের কাছে অর্থাৎ একান্নবর্তী পরিবারে রাখতে চান, তাহলে তার পক্ষে উচিৎ হবে পুত্রবধূর যে একটা ব্যক্তিসত্তা আছে সেটাকে স্বীকার করে নেওয়া। অপরপক্ষে কোনও তরুণী বধূকেও অনুরূপভাবে আনুষঙ্গিক বিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপ নিতেই হবে। পরিবারের ভাঙন রোধ একমাত্র এভাবেই সম্ভব।

শিষ্টতার নিয়মগুলো কি কি? প্রথম নিয়মটা হওয়া উচিত, "থাকবার জায়গাগুলোর মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি না হওয়াই ভাল।" কিন্তু আমার এই লেখাটা যেহেতু একান্নবর্তী পরিবারের সম্পর্ক নিয়ে, সেহেতু এক্ষেত্রে তা উপযোগী নয়। আমি নিয়মগুলো বরং শুরু করছি শাশুড়িকে দিয়েই, কারণ বিয়ের প্রথম দিনগুলোতে বাড়ির নতুন বউ সম্পূর্ণভাবেই থাকে শাশুড়ির ওপর নির্ভরশীল।

প্রথম নিয়ম হ'ল: প্রথমের সেই দিনগুলোতে ছেলের বউকে একজন অতিথিমাত্র নয় পরিবারের একজন হিসেবেই মনে করুন, আর ঠিক সেইভাবেই তার আদর আপ্যায়ন করুন। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, আমার বিয়ে হবার পরের সপ্তাহটিতেই আমি নিজেকে আমার স্বামীর পরিবারের একজন হিসেবে অনুভব করতে পারলাম। খাবার টেবিলে আমরা যখন একসঙ্গে বসতাম তখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হালকাভাবে আলাপ আলোচনা হত। প্রায় সময়েই এমন হত যে সঞ্জয় আর আমার মত মিলত না। আমি জানতাম আমি তর্কে হেরে যাব, তাই করুণ মুখ করে আমার শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে তার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতাম। তিনি মৃদু হেসে আমার পক্ষেই রায় দিতেন। এভাবেই ধীরে ধীরে আমার মধ্যে এই অনুভবটা এল যে আমি এই পরিবারেরই একজন। তাই শাশুড়িদের প্রতি আমার বক্তব্য পুত্রবধূর প্রতি আপনার স্নেহ আপনি প্রকাশ্যেই দেখানোর চেষ্টা করুন। আত্মীয়স্বজন আর পরিচিতজনেদের কাছে তাকে 'আমার ছেলের বউ' না বলে 'আমার মেয়ে' বলে পরিচয় দিন। তার দিকে তাকিয়ে কখনও একচিলতে হাসিমুখ, বা তাকে আপনি বিশেষভাবে স্নেহ করেন সেটা হাবভাবে প্রকাশের চেষ্টা, বা নিজের হাতে তাকে কখনও সখনও খাইয়ে দেওয়া এসবই তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নিবিড় ও মধুরতর করে তুলবে।

দ্বিতীয় নিয়মটা হল: আপনার ছেলের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক নিয়ে হিংসে করবেন না তাকে। এটা ঠিক বাৎসল্য আর বৈবাহিক সম্পকের মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এটার সূত্রপাত হয় শাশুড়ির পক্ষ থেকে। বিয়ের প্রথম বছরটাই হ'ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছর। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হতেই পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীর পরিবার পরিজন যদি নববিবাহিত বধূটিকেই দোষ দিতে থাকে তবে একদিন হয়ত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল হয়ে যাবে কিন্তু শাশুড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা আর স্বাভাবিক হবে না। তাই এ ধরনের মনোমালিন্যের ক্ষেত্রে হয় নিজে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকুন নয়ত সম্ভব হলে ছেলের বউকেই যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

যদি আপনার পুত্রবধূর বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে আপনি খোলামনের মহিলা, তাহলে দেখবেন ধীরে ধীরে সে তার বন্ধুদের কাছে না গিয়ে তার গোপন কথা বলা বা সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আপনার কাছেই আসবে। আপনার ছোট ছোট সহায়তাই তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে দিনের পর দিন মধুর করে তুলবে। মেয়ে হিসেবে আপনি তো জানেন মেয়েলি সমস্যাগুলো নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করা কতটা অসুবিধেজনক। এভাবে তাই আপনার পুত্রবধূর সম্পর্ক আপনার সঙ্গে এমনভাবে গড়ে উঠবে যে দেখবেন বিভিন্ন ব্যাপারে তার স্বামীর পরামর্শ না নিয়ে সে আপনারই কাছে আসছে সমস্যা সমাধানের জন্য।

আমার স্বামীর সঙ্গে আমার যখন প্রথম মতবিরোধ হ'ল, আমার নিজের ভীষণ খারাপ লাগছিল। ও কাজে বেরিয়ে গেলে আমি আমার শাশুড়ির ঘরে গিয়ে বসলাম। তারপর একসময় মুখ ফুটে বলেই ফেললাম, "কেন যে সে আমায় বিয়ে করতে গেল। আমি সব দিক থেকেই ওর অনুপযুক্ত।" সে সময় আমার শাশুড়ি অফিসে বেরোচ্ছিলেন, বললেন, "ও হয়ত তোমার সম্ভাবনাকেই দেখেছে, এখন তুমি যা সেটাকে নয়, তুমি ভবিষ্যতে যা হয়ে উঠবে তা ওর ধারণায় স্পষ্ট হয়ে গেছে।" আমার শুনে এত ভাল লেগেছিল! তিনি তো বলতেই পারতেন, "আমি ও তাই ভাবছি, কেন?" কিন্তু না, তিনি তা বলেননি। তাঁর সম্বন্ধে এই স্মৃতিটা আমার কাছে বেশ উজ্জ্বল হয়ে আছে। আপনিও আপনার পুত্রবধূকে এভাবেই সমর্থন করুন। যদি একতরফাভাবে আপনার ছেলেকেই সমর্থন করে যান, তবে অপরপক্ষের ক্ষুব্ধতা তো দিনের পর দিন বেড়েই চলবে।

তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটা হ'ল আপনার পুত্রবধূর গোপনীয়তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিন। আপনি দরজায় শব্দ না করেই হট করে তার ঘরে ঢুকে যেতে পারেন না। আপনি জোর করে ভাবতেও পারেন না যে আপনার ছেলে সেই শিশুটিই রয়ে গেছে, মায়ের যত্নআত্তি ব্যতিরেকে ছেলের চলবে না। সবসময়ই আপনি যদি আপনার ছেলেকে সঙ্গ দেন, তার একটি স্ত্রী আছে এই ব্যাপারটি ভুলে গিয়ে, তাহলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়ে যায় একান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই। ছেলেকে আপনি রাত অব্দি আগলে রাখলেন, আর তার বিয়ে করা বউটি চাতক পাখির মত অপেক্ষা করে বসেই রইল, এর পরিণাম কি খুব সুখকর হতে পারে? আমার এক বান্ধবীর বিয়ে কিন্তু ঠিক এই কারণেই ভেঙে গিয়েছিল।

আপনার দৃষ্টিভঙ্গীকে এভাবে মানিয়ে নিন। চিন্তা করে দেখুন বিয়ের পর এই যে সম্পর্কের পরিবর্তনগুলো ঘটে তাকে কোনও বিভেদের কারণ

না করে ঐক্যের পথেও তো এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আপনার ছেলে কাজে বেরিয়ে গেলে, আপনি আর আপনার ছেলের বউ একসঙ্গে বাইরে বেরোতে পারেন কেনাকাটা বা অন্য প্রয়োজনে। অবসর সময়েও আপনি কি কি করতে ভালবাসেন সেটা আপনার পুত্রবধূকে জানতে বুঝতে দিন। তারপর দুজনে মিলে অবসরের মুহূর্তগুলোকে সহযোগীতার নিয়ত আশ্বাসে ক্রিয়াশীলতায় ভরিয়ে তুলুন। আমি এরকম তো প্রায়শই দেখে থাকি, দুজন মহিলার মধ্যে যখন সম্পর্ক যথেষ্ট ভাল তখন একে অপরের অনেক বড় মানসিক সহায় হয়ে দাঁড়ান। নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে, পারস্পরিক মানসিক সহায়তা প্রদান করে উভয়েই যার যার নিজস্ব আত্মবিশ্বাস ও সমস্যা সমাধানের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলেন।

আপনার ছেলের বউকে আপনাদের পারিবারিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানান। দেখবেন সেসব কথা জানতে সে আগ্রহী হবে। এতে করে দেখবেন সে নিজেকে পরিবারের একজন বলেই ভাবতে শুরু করেছে। পরিবারের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে তাকে অংশগ্রহণ করতে দিন। পরিবারের সকলে কে কি কাজ করেন, চাবিগুলো কোথায় থাকে মোট কথা যে পরিবারে সে বৌ হয়ে এসেছে তার সঙ্গে তাকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রাখুন। যতই তাকে দূরে রাখবেন, পরিবারের প্রতি আনুগত্যও তার সেই হারেই কমবে। তাকে ঘরসংসারের বিশেষ কোনও একটি ক্ষেত্র সামলাতে দিন, তারপর তার সেই ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করেই দেখুন না। উদাহরণস্বরূপ ধরুন তাকে রান্নাঘরের ভার দিলেন, তারপর তার কাজকর্ম সম্বন্ধে, তার রন্ধনতালিকা সম্বন্ধে প্রকাশ্যেই তার সমালোচনা শুরু করলেন, তার স্বামীর সামনে তাকে বিব্রত করলেন, এটা কিন্তু ঠিক নয়। আপনার

বিবাহিত জীবনের ভাগ্য কখন কখন এই মা আর স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরেই নির্ভর করে থাকে। এ কারণেই যখন বাবামায়েরা মেয়ের পাত্র খোঁজেন তখন পাত্রের মায়ের সম্বন্ধেও বিশেষভাবে খোঁজখবর নেন। মা আর স্ত্রী এই দুজনের মাঝখানে যে পুরুষটি থাকেন তার ক্ষেত্রে উক্ত দুইপক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটা খুবই জরুরী।

নিজের বিয়ের পর এতগুলি বছর কেটে গেছে, আপনি এখন আর নববধূটি নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি আপনি চাইবেন, যে সবার সামনে আপনার সমালোচনা হোক ?

যাদের অদূরভবিষ্যতে বিয়ে হতে চলেছে তাদের সম্বন্ধেও আমার পরামর্শগুলি অনুরূপ। শাশুড়ির বয়স প্রসঙ্গ, তিক্ততা এসব নিয়ে এমনিতেই অনেক প্রবাদ, গল্পগাথা প্রচলিত আছে, নতুন করে কিছু বলবার নেই। তবে নতুন বউ হয়ে গিয়েই, "হ্যাঁ, আমিও ছেড়ে দিচ্ছি না" এমন মনোভাব নিয়ে জীবন শুরু করবেন না। ছেলের বিয়ের পর সে ভদ্রমহিলারও মানসিক কিছু পরিবর্তন ঘটে স্বাভাবিকভাবেই। এতদিন তার ছেলেকে যেভাবে তিনি পেয়ে এসেছেন পরিস্থিতি তা থেকে পালটে গেছে। একটা ভয় তার মনের ভেতর গোপনে বাসা বেঁধেছে, তাঁর ছেলেকে আপনি কেড়ে নিতে চলেছেন ! আপনি নিজে থেকে আপনার শাশুড়ির এই ভয় দূর করবার দায়িত্ব নিন, তাহলে দেখবেন আস্তে আস্তে পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আপনার শাশুড়ি যখন ক্রমে আপনার ওপর তার বিশ্বাস অর্পণ করতে থাকবেন তখন দেখবেন আপনার হয়েও তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকার আদায়ে এগিয়ে আসছেন। আপনার পরিবারের লোকজনের কাছে শাশুড়িকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করাবার চেষ্টা করবেন না, কারণ এর প্রভাব ক্ষতিকর হতে বাধ্য। তারপর আপনার যখন ছেলেমেয়ে হবে, তখন আপনি যেভাবে তাকে লালন পালন করছেন, খেতে দিচ্ছেন বা তার স্নানের জন্য যে সাবান ব্যবহার করছেন তাতে যদি আপনার শাশুড়ির কিছু আপত্তি করবারও থাকে, তাতে ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হবেন না। কারণ মনে রাখবেন তিনি তাঁর নাতি নাতনিদের ভালবাসেন বলেই অমনটা করছেন, অন্য কোনও কারণে নয়। এইসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে স্বামীর কাছে অনুযোগ অভিযোগ করবেন না বারবার, এতে অশান্তিই বাড়বে। শাশুড়ি যদি বিভিন্ন ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন নিজে থেকেই তবে তাকে বরং সহায়তা হিসেবেই ধরে নিন, নাক গলানো বা অযথা হস্তক্ষেপ বলে নাই বা ভাবলেন।

বিবাহিত জীবনের ভাগ্য কখনও কখনও এই মা আর স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরেই নির্ভর করে থাকে। এ কারণেই যখন বাবামায়েরা মেয়ের পাত্র খোঁজেন তখন পাত্রের মায়ের সম্বন্ধেও বিশেষভাবে খোঁজখবর নেন। মা আর স্ত্রী এই দুজনের মাঝখানে যে পুরুষটি থাকেন তার ক্ষেত্রে উক্ত দুইপক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটা খুবই জরুরী। যদি পারিবারিক শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে তবে তার পক্ষে অফিসে কর্মদক্ষ হওয়াটাও সহজ হয়ে যায়। কিন্তু তার মনে সবসময়েই যদি একটা গণ্ডগোলে ভরা গৃহপরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা থেকে যায় তবে তার পক্ষে কর্মদক্ষ হবার অবকাশ কোথায় ? পরিবারে তাই শাশুড়ি এবং পুত্রবধূ উভয়েরই এ ব্যাপারটায় নিয়ত লক্ষ্য রাখা উচিত যে কেন্দ্রীয় পুরুষটি যেন উভয়ের প্রতিই সন্তুষ্ট থাকেন। এটা করতে খুব একটা অসুবিধে তো নেই, দরকার শুধু পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার নিরন্তর প্রয়াস। এর ফলে স্ত্রীও যেমন স্বামীর কাছ থেকে তার মায়ের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য পাবেন ভালবাসা, তেমনি মাও পাবেন তার স্ত্রীকে পরিবারের একজন হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর আনুগত্য।

সঞ্জয় ও মেনকার বিয়ে, পেছনে ইন্দিরা ও রাজীব

ছবি : ক্রিয়েটিভ আই

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!

আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র!

নিয়মিত কোলগেট ব্যবহার সারা পরিবারকে দেয় সুস্থসবল দাঁত
আর তাজা নির্মল নিশ্বাস। এর থেকেই তো আসে আত্মবিশ্বাস!
আর কোলগেটের তাজা মিণ্টি স্বাদ কার না পছন্দ!

প্রতিবার দাঁত মাজার সময়ে কোলগেটের বিশিষ্ট ফর্মূলা কীভাবে কাজ করে দেখুন।
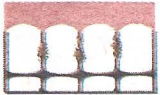
দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকেই নিশ্বাসের গন্ধ আর দাঁত ক্ষয়ের শুরু।

কোলগেটের অজস্র সক্রিয় ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে এই ক্ষয়ক্ষতিকারী খাবারের কণাগুলো বার করে আনে, রোগজীবাণু হ'তে দেয় না।
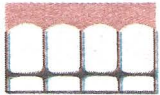
ফলে দাঁত থাকে সুস্থসবল, নিশ্বাস হয় ঝরঝরে তাজা।

প্রতিদিন নিয়মিত কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজতে ভুলবেন না। সম্ভব হ'লে প্রতিবার খাবার পর।
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ? দাঁতের ক্ষয়? আর নেই ভয়!
আপনাদের ঘিরে আছে কোলগেটের সুরক্ষাচক্র।

কি তাজা মিণ্টি স্বাদ!

দলাইলামার গুরুর পুনর্জন্ম

ছবি : অশোক সারীন

১৯৮২ সালের ১৫ অকটোবরের সকাল। সোনম তোপগিয়াল কাজে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে তাঁর স্ত্রী লোবসাং ডোলমা যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। তিনি চতুর্থবার সন্তান সম্ভবা। আগের দিন পর্যন্তও লোবসাং যথেষ্ট উৎফুল্ল মনে তাঁর স্বামীর সঙ্গে কাজে গিয়েছিলেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ডালহৌসির ইউনিয়ন হ্যাণ্ডলুম সেন্টারে কাজ করতেন। মাসে তারা যা মাইনে পেতেন, তাতে পাঁচ সদস্যের পরিবারের মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যেই কেটে যেতো। লোবসাংকে প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখে সোনম কাজে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। বড় দুই বাচ্চাকে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে, ছোট ছেলেকে জনৈকা প্রতিবেশিনীর কাছে রেখে তিনি নিজেই স্ত্রীর পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার নয়নশোভন এই পাহাড়ি শহর ডালহৌসি দারুণ স্বাস্থ্যকর স্থান। বছর জুড়ে পর্যটকদের ভিড় জমে। পাঠানকোট থেকে চাম্বা যেতে পড়ে রানিক্ষেত। সেখান থেকে ডালহৌসি পর্যন্ত সাত কি.মি. দীর্ঘ পিচ বাঁধান রাস্তার দুপাশে সার সার দেবদারু ও চির গাছ।

সেই আশ্চর্য শিশু : নতুন বালক গুরু

ইয়ং জিন লিং রিনপোচে

ডালহৌসির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাত হাজার পাঁচশো ফুটের চেয়েও বেশি। ১৯৫৯ সালে চীনা আক্রমণের পর তিব্বতী শরণার্থীরা ভারতে আসে। সব কটি পাহাড়ী অঞ্চলে তাদের পুনর্বাসিত করা হয়। ডালহৌসিতেও অনেক তিব্বতী শরণার্থী এসে বসবাস শুরু করে। রুটি-রুজির জন্যে তারা নানা ধরনের কাজ বেছে নেয়। অধিকাংশ তিব্বতী পরিবারই বিভিন্ন হস্তশিল্প, বিশেষ করে কার্পেট বয়নের কাজে যুক্ত হয়। এই শিল্পের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের অনেক দিনের। বিদেশেও তিব্বতী কার্পেটের বেশ চাহিদা আছে। তিব্বতী শরণার্থী হিসেবেই সোনম তোপগিয়াল এখানে এসেছিলেন। ডালহৌসিতেই তাদের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর তাদের তিনটি সন্তানের জন্ম হয়, দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। আর সন্তান হোক তারা তা চাইছিলেন না। কিন্তু যেন কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবেই ১৯৮২ সালে তাদের পুনরায় সন্তান পাবার ইচ্ছে জাগলো। লোবসাং গর্ভবতী হবার পর থেকেই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। স্বপ্নে তাদের ঘর রামধনুর অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় আলোকিত হয়ে উঠতো। একদিন স্বপ্নে এক বৃদ্ধ লামা হাত তুলে প্রসন্ন মুখে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। লোবসাং এই স্বপ্নের কথা সোনমকে বল্লেন। আশ্চর্যের বিষয়, সোনমও একই স্বপ্ন দেখেছিলেন। সোনম এবং লোবসাং এই স্বপ্নের কথা কাউকে বললেন না। ইতিমধ্যে আগের থেকে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা তাদের বেড়েছে। এবার আসছে চতুর্থ সন্তান।

সোনম তোপগিয়াল অধীর হয়ে ঘরের বাইরে পায়চারি করছেন আর ভিতরে লোবসাং প্রসব

বালক গুরু পূর্বতন গুরু য়ুং-জি-শিনজা রিনপোচের ব্যবহৃত করতাল বাজাচ্ছে

যন্ত্রণায় মাঝে মাঝেই চীৎকার করছেন। লোবসাং-এর জন্য সোনম একজন তিব্বতী মহিলা ডাক্তারকেও নিয়ে এলেন। হঠাৎই সোনমের ছোট ছেলেটি খেলার ছলে একটি সাদা গোলাপ নিয়ে ছুটে এসে তার বাবার হাতে দিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য বায়নাক্কা ধরলো। প্রসবের সময় কোন বাচ্চা ফুল উপহার দিলে তা তিব্বতীদের কাছে শুভ ইঙ্গিত বহন করে। সোনম বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি দরজায় টোকা মারলেন। মহিলা ডাক্তার দরজা খুলতেই বাচ্চাটির মায়ের কাছে পৌঁছানোর জেদ যেন বেড়ে গেল। বাচ্চাটির হাত থেকে ডাক্তার ফুলটি নিয়েই দরজা বন্ধ করে দিলেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই সদ্যোজাত শিশুর বিপুল চিৎকারে স্তব্ধ পরিবেশ খান খান হয়ে গেল।

ঘরের ভেতর এক অলৌকিক দৃশ্যের সৃষ্টি হল, নবজাত শিশুকে ঘিরে রইল ইন্দ্রধনুর আলোকচ্ছটা। দৃশ্যটি দেখে ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন। চেঁচিয়ে তিনি সোনমকে এই বিচিত্র দৃশ্যের কথা বললেন। এতক্ষণে নির্বাক সোনম দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন। বন্ধ ঘরের মধ্যে ইন্দ্রধনুর ছটায় তাঁর চোখ ঝলসে গেল। বুঝতে দেরি হলো না, তাঁর ঘরে কোনো অবতার জন্মেছেন। তার চোখ ভরে এল আনন্দাশ্রুতে। সঙ্গে সঙ্গে সদ্যোজাত শিশুকে প্রণাম করলেন সোনম। খবরটি দিতে ছুটে গেলেন লামা গুরুর কাছে। দেখতে দেখতে সোনমের ঘরে যেন লোকজনের মেলা বসে গেল। লামা গুরু সোনমের মুখে সব শুনে বললেন—এই বিচিত্র বালক কোন সাধারণ মানুষ নন, ইনি নিশ্চয়ই কোন মহান ব্যক্তির অবতারস্বরূপ।

দলাই লামা (চতুর্দশ)

ধীরে ধীরে শিশুটি বেড়ে উঠতে লাগল। তার শারীরিক বিকাশ ছিল অসাধারণ। চারমাসেই সে বসতে শিখলো এবং তার কয়েকদিন পরই হাঁটতে শিখল সে। ছেলেবেলা থেকেই বালক গম্ভীর প্রকৃতির। সারাদিন পূজোর ঘরে কর্মচক্ররূপ মালা ঘোরাতো। কেউ আশীর্বাদ চাইলেই তাঁর মাথায় হাত রাখতো সেই আশ্চর্য বালক। লোবসাং তাঁর ছেলের গায়ে যেন হাওয়া পর্যন্ত লাগতে দিতেন না। বালকের সেবার জন্য তিনি কয়েক মাস কাজেই গেলেন না। চারমাসে বালকের দাঁত গজাতে শুরু করলো। এরপর তার দুধে

১৯৮২ সালের ১৫ অকটোবর। হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার নয়নশোভন পাহাড়ি শহর ডালহৌসিতে, তিব্বতী শরণার্থী সোনম তোপগিয়ালের ঘরে জন্ম নিয়েছিল এক আশ্চর্য শিশু। এই শিশুর জন্মের আগে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখেছিলেন তোপগিয়াল দম্পতি। কে এই শিশু, যার জন্মের সময় দেখা গিয়েছিল ইন্দ্রধনুর আলোকচ্ছটা? তিব্বতীদের ধর্মগুরু দলাই লামা (চতুর্দশ) এই শিশুকে দেখেই চিনতে পারলেন। তাঁর গুরু য়ুন-জি-শিনজা রিনপোচে ফিরে এসেছেন পুনর্জন্ম নিয়ে। বিশ্বের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের গুরু দলাই লামার আবির্ভাব ও ইতিহাস বিবৃত হয়েছে ডালহৌসি থেকে অশোক সারীনের এই প্রতিবেদনে।
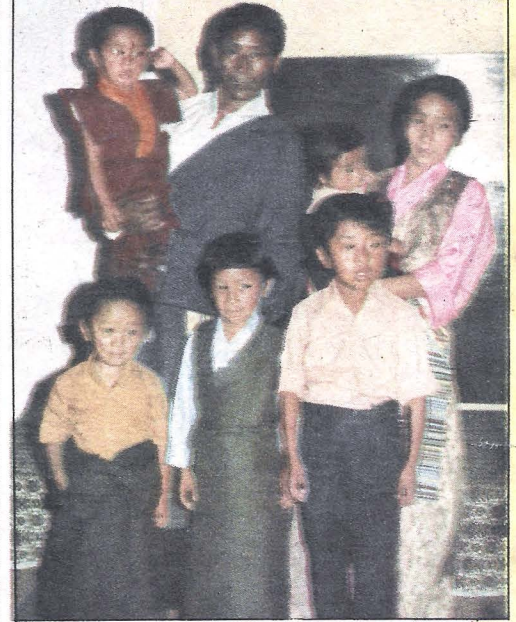
অবতার বালককে কোলে নিয়ে সোনম তোপগিয়াল, পাশে স্ত্রী লোবসাং ডোলমা

দাঁত পড়ে গিয়ে নতুন করে দাঁত গজাল, কিন্তু আশ্চর্য তার মাঝের একটি অংশ ফাঁকা। বালক সেই ফাঁকা জায়গাটিতে হাত দিয়ে কিছু যেন বোঝাতে চায়।

এই অদ্ভুত 'অবতার বালক' প্রকৃত পক্ষে কে ছিলেন? এ কথা জানতে হলে আমাদের পুনর্জন্ম সম্পর্কে তিব্বতীদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। তিব্বতীদের প্রধান গুরু দলাই লামা (চতুর্দশ) তাঁর আত্মকথা 'আমার দেশ, আমার দেশবাসী' নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

৬৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

ম্যানেজার শ্রী পালদেন বালক গুরুকে খাইয়ে দিচ্ছেন

PARACHUTE
COCONUT
OIL
GUARANTEED FOR PURITY
আপনার সুবিধার জন্য
সবরকম বিস্তৃত প্যাক-সমূহ।
প্যারাশুট
নারকেল তেল
শুদ্ধতম বলেই না ভারতে এর সর্বাধিক বিক্রি।
Avenues BO 239 86

এসে গেল...আপনার কেশসম্ভার
ঢেলে সাজাবার দিন!
কেননা প্যারাশুটের মতো
খাঁটি নারকোল তেল
আপনি এর আগে পাননি!
পরীক্ষা করেই দেখুন না...
১) স্বচ্ছতা চেয়ে দেখুন...
স্বচ্ছতম নারকেল তেল হ'ল
সব থেকে খাঁটি। আর
প্যারাশুটের স্বচ্ছতার
কথাই আলাদা!
নিঃসন্দেহে স্বচ্ছতম।
২) মসৃণতা ছুঁয়ে দেখুন...
একটু তেল হাতে ঢেলে চুলে
মাখুন। কেবল প্যারাশুটই
এমন সহজ ও মসৃণ অনুভূতি
দেবে যা অন্য কোন
তেলের দ্বারা সম্ভব নয়!
৩) সুগন্ধ শুঁকে দেখুন...
সর্ব্বোত্তম নারকোলের
প্রাকৃতিক তাজা গন্ধ।
একবার শুঁকে দেখলেই
বুঝবেন তফাৎটা কোথায়!
প্যারাশুটের শুদ্ধতার
অকাট্য প্রমাণ!

ছবি : তাপস দেব

কামতাপুরীঃ বাংলা সীমান্তে গোপন গেরিলা সরকার ?

রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরে আই.জি. শ্রী রমেন ভট্টাচার্যের কাছে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ থেকে এসে পৌঁছায় এক গোপন গোয়েন্দা রিপোর্ট। তার আগেই বাংলা দৈনিক 'যুগান্তরে' বেরিয়ে গেছে চাঞ্চল্যকর লীড নিউজটি উত্তর-খণ্ডীরা গোপনে স্বাধীন কামতাপুরী রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করেছে। আসাম, ত্রিপুরা, উত্তরবঙ্গ, সিকিম, ভুটান ও মেঘালয়ের কোচ রাজবংশী সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টায় এই গোপন কামতাপুরী সরকার গেরিলা কায়দায় কাজকর্ম চালাবে। তাৎক্ষণিক তৎপরতায় রাজ্য পুলিশের হেড-কোয়ার্টার্স থেকে বার্তা গেল তল্লাসী বাহিনী পাঠাবার। প্রত্যন্ত জেলা কোচবিহার হয়ে উঠল গোয়েন্দা পুলিশের অবাধ লীলার চারণভূমি। তামাম উত্তরবঙ্গের সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও ভুটানের সীমান্ত জেলা গুলির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হল। ভারতের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় সংহতি রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অসীম তৎপরতায় নিজেকে তৈরি করে রাখল।

১ এপ্রিল ১৯৮৬। সংবাদ দুনিয়ার গোপন সূত্রে খবর এল : কোচবিহার এলাকায় দিনহাটায় নাম সংকীর্তনের ছদ্মবেশে কোচরাজবংশীদের প্রতিনিধি সম্মেলনে স্বঘোষিত কামতাপুরী রাষ্ট্রের গোপন সরকারের মন্ত্রী পরিষদও তৈরি হয়ে গেছে। আত্মগোপনকারী এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ নিয়েছেন কোচবিহারের রুক্মিনী রায়। এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন উত্তরখণ্ডী আন্দোলনের পরিচিত নেতা সম্পত রায়। মন্ত্রী পরিষদের প্রতিটি সদস্যই নাকি কামতাপুরী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনে শ্রীশ্রী গীতা হাতে হয় জয়, নয় মৃত্যু'র শপথ নিয়েছেন।

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার গোয়েন্দা পুলিশ এই খবরের সত্যতা ও প্রমাণ পাবার তাগিদে সন্দিহান অঞ্চলগুলিতে জাল পাতল।

কামতাপুরী রাষ্ট্রের প্রকাশ হয়ে পড়া পশ্চাদ-পটটি ভারি কৌতূহলদ্দীপক। চলতি বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার সংলগ্ন পঞ্চানন পীঠে কোচ-রাজবংশীদের এক বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়া মহাদেশের এক কোটি কোচের প্রতিনিধি হিসাবে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বাঙলাদেশ, নেপাল, সিকিম, ত্রিপুরা এবং ভুটান থেকে ৫০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হন। সেখানে 'কোচ-রাজবংশী ইন্টার ন্যাশনল' নামে ২৫ জন কার্যনিবাহক কমিটির সদস্যর নেতৃত্বে একটি 'কোচ হোমল্যাণ্ড' আদায়ের সংস্থা তৈরি হয়। সর্ব সম্মতিতে ওই কমিটির সভাপতি মনোনীত হন আসামের প্রাক্তন জনতা নেতা কবীর রায়প্রধান।

এই প্রাক্তন নেতা কবির রায়প্রধান নিজে কোচ রাজবংশীয়। আসামের গোয়ালপাড়া এবং কাছাড় তাঁর কর্মক্ষেত্র। শ্রী রায়প্রধান জনতাপার্টির টিকিটে এবং আসাম গণ পরিষদের সমর্থনে আসামের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

পুলিশের লাল খাতায় রিপোর্ট ধরে রাখা রহস্যময় উত্তরখণ্ডী আন্দোলন এখন মোড় নিয়েছে এক অতীব বিপজ্জনক পথে। কোচ-রাজবংশীদের আন্তর্জাতিক সমিতি গঠন কোন উদ্দেশ্যে ? ভারতের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে কারা গড়ল বে-আইনী 'কামতাপুরী রাষ্ট্র' ? কংগ্রেস প্রতিবাদ করছে না কেন ? এর নেপথ্য নায়কই বা কে ? সত্যি কি অসম গণ পরিষদ কামতাপুরীকে মদত দিচ্ছে ? উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে এসে রমাপ্রসাদ ঘোষালের সরজমিন প্রতিবেদন।

নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে ভরাডুবির পর প্রকাশ্যে আসাম জনতা পার্টির কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করে তিনি দলত্যাগ করেন। আসামের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহান্তর সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তা বলার পর তিনি অ-গ-প অর্থাৎ অসম গণপরিষদে যোগ দেন। আসামে হিংস্র বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিণামে আঞ্চলিক দলের ক্ষমতালাভে উত্তরখণ্ডী আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে এরপর কবীর রায়-প্রধানের যোগাযোগ হয়। যোগাযোগের অব্যবহিত পরেই এই 'কোচ ইন্টার ন্যাশনল' গঠনের ঘোষণা। সন্দিগ্ধ মহলের প্রশ্ন : তবে কি অ গ প'র মদতে উত্তরখণ্ডে পাল্টা সরকারের দুন্দুভি নিনাদ? কে দেবে উত্তর ?

২৪-২৫ ফেব্রুয়ারির এই দু'দিন ব্যাপী কোচ রাজবংশী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের জয়পুরের প্রাক্তন মহা-রানী গায়ত্রী দেবী। শ্রীমতী গায়ত্রীদেবী হলেন, কোচবিহারের রাজা জগদীপ নারায়ণের মেয়ে। ওই সম্মেলনে ১২ কোটি টাকার 'আন্দোলন তহবিল' গঠনের উদ্দেশ্যে গায়ত্রী দেবীর নেতৃত্বে 'চিলা রায় ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ট্রাস্টের তহবিলে স্বয়ং গায়ত্রী দেবীই নাকি ১ কোটি টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

ট্রাস্টের নাম চিলা রায় দেওয়ার পিছনে কোচ-বিহারের রাজপরিবারের ইতিহাসের প্রভাব আছে। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ মহারাজা বিশ্ব-সিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মল্লদেব 'নরনারায়ণ' নাম নিয়ে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। সিংহাসনে বসেই তিনি নিজের ভাই শুক্লধ্বজ সিংহকে যুবরাজ ও প্রধান সেনাপতি পদদুটিতে মনোনয়ন দিলেন। ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অহোমরাজ খোরার সঙ্গে যুদ্ধে চিলের মত ছোঁ মারা রণ কৌশলে সিদ্ধহস্ত শুক্লধ্বজ অনায়াসে জয়ী হলেন। তার এই নতুন যুদ্ধকৌশল এবং বীরত্বের মর্যাদা দিতে কোচ রাজপরিবার থেকে তিনি চিলা রায় উপাধি পান। এই বীর চিলা রায়ই প্রথম কোচ রাজ্যের সীমানা দ্বিগুণ বাড়িয়েছিলেন যুদ্ধ করে। কোচদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী বীর চিলা রায় এর নামে ট্রাস্ট গঠন করে তাই কি কোচ-রাজবংশীরা আর এক ভবিষ্যৎ সংগ্রামের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করল ?

২৬ ফেব্রুয়ারি দিনহাটা থেকে ১০ কিলো-মিটার দূরে বুড়িহাটায় কোচদের কিংবদন্তী প্রতিম

বীর চিলা রায়ের ৪৭৬ তম জন্মউৎসব উপলক্ষে ৩০ হাজার মানুষ জমায়েত হয়। ওই সমাবেশে জয়পুরের মহারানী গায়ত্রী দেবী মঞ্চে উপস্থিত থেকে কোচ-রাজবংশীদের সম্মান অর্ঘ্য গ্রহণ করেন। খবরে প্রকাশ, ওই জমায়েতেই বলা হয় : পৃথিবীর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোচরাজবংশীদের এটিই মূলভূমি। অথচ এখানে তারা বিন্দুমাত্র বিশেষ সুবিধা ব্যবহার করতে পারে না। কোন সরকারেরই উত্তরবঙ্গ উন্নয়নে তেমন মাথা ব্যথা নেই। তাই নিজেদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে নিজেদেরই উদ্যোগী হতে হবে। চাকুরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ রাখতে হবে ৮০ শতাংশ। তৈরি করতে হবে নিজেদের স্বতন্ত্র হোমল্যাণ্ড।

অন্যদিকে ২২ এবং ২৩ মার্চ জলপাইগুড়ি শহরে উত্তরবঙ্গের মেচ, মুণ্ডা, হাড়িয়া ও আরা উপজাতিদের লক্ষাধিক মানুষ জমায়েত হয় অখিল-ভারত বড় মেচ সাহিত্য সভার ডাকে। জলপাইগুড়ি বড় মেচ সাহিত্য সভার সভাপতি মাইকেল বসুমাতারি সম্মতি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে চিঠি লিখে ওই চার উপজাতিদের অসন্তোষের কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তার উত্তরও দেননি। এদিকে ওই চার উপজাতি সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন কোন সরকার আমাদের কথা ভাবে না। নিজেদের পথ নিজেদেরকেই ঠিক করে নিতে হবে। আদায় করতে হবে ভাষা স্বীকৃতি। মাদারি হাট, কালচিনি ও আলিপুরদুয়ার এলাকার হাজার হাজার উপজাতিদের মনে অসন্তোষের সলতে পাকানো শুরু হয়ে গেছে। কালচিনির আর এম পি বিধায়ক মনোহর তিরকি অবশ্য এসব দল ও মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। ইদানীং ক্ষুব্ধ উপজাতিদের বৈঠকে সংগোপনে নাকি বক্তৃতা করে যাচ্ছেন উত্তরখণ্ডী নেতা পাল্টা সরকারের সম্পত রায়। তবে কি উত্তরখণ্ডী গেরিলা কার্যকলাপে এই সব মেচ, হাড়িয়া, মুণ্ডা ও আরা উপজাতি অংশকেও সামিল করার ষড়যন্ত্র চলছে? ওয়াকিবহাল মহল ত্রিপুরার কথা ভেবে আতংকিত হয়ে পড়েছেন। সতর্ক হয়ে পড়েছেন বামফ্রন্ট সরকার।

উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত দুই বামফ্রন্ট নেতা কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী শিবেন চৌধুরী দফায় দফায় ছুটে গেছেন নিজ নিজ এলাকায়। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ উত্তরবঙ্গের এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার পিছনে কংগ্রেসের হাত আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

ছবি : কে. মুখার্জি

ছবি : কল্যাণ চক্রবর্তী
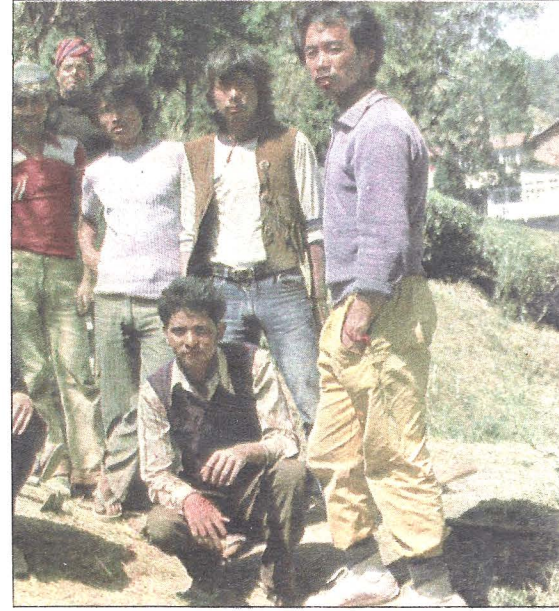
প্রসঙ্গত বলা যায় উত্তরখণ্ডীদের তথাকথিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পত রায় এক সময়ে কংগ্রেস সমর্থক ছিলেন। কিন্তু রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী উত্তরখণ্ড আন্দোলনের জন্য বাম সরকার এর ব্যর্থতাকে দায়ী করে কংগ্রেসের হাত থাকার অভিযোগকে অস্বীকার করেছেন। তবে কমলবাবু তার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তির অবতারণা করতে বলেছেন এ জনাই কামতাপুরী রাষ্ট্র গঠিত হবার খবর পেয়েও কংগ্রেসীরা কোনরকম প্রতিবাদ করেন নি। ফরোয়ার্ড ব্লকের সংবাদ সূত্র অনুযায়ী জানা গেছে কোচবিহারের এই জনপ্রিয় বামপন্থী নেতা কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ ১৫ এপ্রিল থেকে ওই তথাকথিত কামতাপুরী রাষ্ট্রের বিরোধিতায় নামছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে ও জাতীয় সংহতির পক্ষে প্রচারাভিযানের শুরু করেছেন তিনি তাই ১৫ এপ্রিল উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় পালিত হবে জাতীয় সংহতি দিবস। যার নেতৃত্ব দেবেন তিন মন্ত্রী কমল গুহ, অধ্যাপক নির্মল সেনগুপ্ত এবং শিবেন চৌধুরী।

ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি এবং দিনহাটায় নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে : ওই স্বঘোষিত কামতাপুরী রাষ্ট্রের কর্ণধাররা বলেছেন, তারা আপাতত অহিংস আন্দোলনের পথে আরও ব্যাপক জনসমর্থন আদায়ের জন্য লড়বেন। তবে বিরোধীপক্ষ যদি চায় তাহলে কোচভূমির পবিত্র মাটিতে ফের চিলা রায় জন্ম নিতে পারে। বক্তব্যটি কি ঝড়ের অশনিসংকেত?

রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল রমেন ভট্টাচার্য কামতাপুরী প্রসঙ্গে বলেন : কোচ আদিবাসী ও তপশিলীরা তাদের জন্য নিজস্ব একটি রাজ্য চায়–রাষ্ট্র নয়। তারা সরকারি চাকরিতে তাদের কোটা চায় : উত্তরবঙ্গে চায় তাদের প্রভুত্ব। কোচ-

(৬৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

'হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে' বসে যে নবনীতা প্রকৃতির সঙ্গে জীবনকে মিশিয়ে ফেলতে পারেন তিনি অনন্যা, এবার 'রিয়েল লাইফ' থিমে অন্য নবনীতা হয়ে তিনি এলেন 'আলোকপাত'-এর পাঠকের দরবারে, নিজেরই জীবনের পথে এক সদ্য আবিষ্কৃত ভরতকে নিয়ে ।

ভরত কথা

নবনীতা দেব সেন
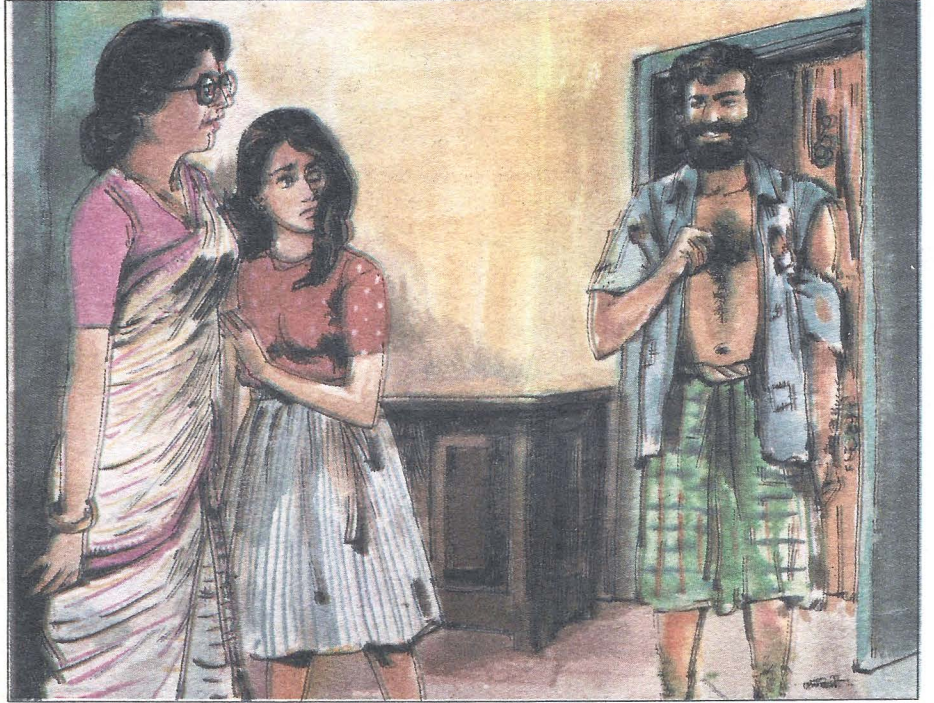
সন্ধ্যাবেলা, আলমারি খুলে বাজারের টাকা বের করে দিচ্ছি, কাজের মেয়েটিকে। শোবার ঘরে বাইরের লোক কেউই আসে না। কানের কাছে হঠাৎ মোটা গলায় 'দিদি'। শুয়ে পেছন ফিরেই একটি উদ্যত চীৎকার গিলে ফেলি। কাজের মেয়ে রেণু 'ও বাবা গো–' বলে আমাকে জাপটে ধরে। তার দোষ নেই।

ঘরের মধ্যে একটি মানুষ। নোংরা সবুজ চৌখুপি লুঙ্গি ঝুলছে হাঁটু অবধি, স্কার্টের মত। বুক পেট হাঁ করে আছে। লোমশ হাঁ। বোতামহীন বুশসার্ট-টার একটা হাতা কাঁধ থেকে ছিঁড়ে ঝুলছে কনুইয়ের কাছে। এলোমেলো চুল, মুখময় দাড়ি গোঁফ। চোখে অত্যন্ত মিষ্টি একটি হাসি। সেই হাসি ঠোঁটেও ছুঁয়েছে। খালি পা। কর্দমাক্ত। গুণ্ডাকে লজ্জা দেওয়া স্বাস্থ্য। আমি একে আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

গুণ্ডা? চোর? কী করে ঢুকল? ঠাশ্ করে আলমারি বন্ধ করে বললাম–

–'আপনি বাইরে গিয়ে বসুন, আমি আসছি। রেণু তুমি ওকে বাইরে নিয়ে বসাও। এটা বসার ঘর নয়।'

–'ওঃ, পার্দো! এটা বেডরুম? আই অ্যাম স্যরি।' লোকটি পর্দা তুলে বেরিয়ে গেল। রেণুও গেল পেছু পেছু। ভয় কেটেছে মনে হল।

চাবিটা লুকিয়ে রেখে আমিও গেলুম।

'কী চাই?' লোকটি বসেছে। সোফাতে। আমার চা হাতে রেণু এ ঘরের মধ্যে পর্দার পেছনে লুকোলো। অর্ধভুক্ত চা-টা শেষ করতে বলে রেণু নানান ইঙ্গিত করতে ল্যাগলো। আমি কাপটা হাতে করে নিয়ে ফিরে এলাম। লোকটি বলল–'কী খাচ্ছেন দিদি? কফি?'

–'না, চা। আপনি চা খাবেন?'

–'অঃ। চাঃ। নাঃ। আমি ঢের চা খেইচি। এই মাত্র হাওড়া থেকে চা খেয়ে এলুম। আমি ভাবলুম কফি। ক্যাফে-ও-ল্যে। কফি আছে?'

রেণু পর্দা তুলে মাথা নেড়ে জানাল, নেই।

ভদ্রলোক বললেন–'ও, নেই? থাক। তবে কিছুই খাব না। খান, আপনি চা খান।'

'আপনি কোত্থেকে আসছেন?' রেণু পর্দার ওপার থেকে কর্তব্য করলো। সাহস পেয়েছে।

–'হাওড়া থেকে।'

–'আপনার নাম কী?'

–'দিদি আমাকে চেনেন। আমি আসতুম দিদির কাছে দশ বছর আগে। তাই না দিদি?'

মুখটি খুবই মিষ্টি। হাসিটা চেনা চেনা। কথার সুর ঠিক ৪।৫ বছরের শিশুর মত। ঢোক গিলে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে। ফলে ভুলভাল জায়গায় শ্বাস ফেলে। যেখানে সেখানে যতি। আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি চিনি? আমি চিনি না। কিন্তু ও তো দেখছি চেনে।

–'দিদি, আমার সঙ্গে একটু গল্প করবেন?'

–'আজ্ঞে?'

–'মানে অনেকদিন পরে আপনার কথা মনে পড়লো। পড়তেই আমি বেরিয়ে চলে এলুম হাওড়া থেকে। রাস্তা চিনতে একটুও অসুবিধে হয়নি। যদিও দশ বছর আসিনি। কিংবা পাঁচ বছর। ঠিক মনে নেই।'

–'আপনি কিছু খাবেন?'

–'আজ্ঞে না। খেয়ে দেয়েই বেরিয়েছি। আমার খাদ্যের প্রয়োজন নেই। মের্সি বোক্যু। আমার দরকার আছে অবশ্য অন্য তিনটি। বলবো? দেবেন?'

–'বলুন না। দেখি, যদি পারি।'

–'আমাকে তিনটি জিনিস দিতে হবে। এক, দেড় মিটার শক্ত দড়ি। সোয়া মিটার হলেও হবে। দুই, বাথরুমে ১৫ মিনিট সময়। তখন দরজা ধাক্কা দিলে চলবে না। আর তিন নম্বর, এক জোড়া চটি। খালি পায়ে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে। খালি পায়ে ফিরতে পারবো না। এই তিন নম্বর জিনিসটা ধার নিচ্ছি। ফেরত দেব। ব্যাস। নাথিং মোর। বিয়্যাঁ। ফিনি।' মিষ্টি হাসলো।

কথার শেষে বুকের সামনে এই, দুটি হাত দরজা খোলার ভঙ্গিতে দুদিকে সরানো–এতে, আর কথায় কথায় ফরাসী বলায় কার কথা যেন মনে পড়ে যাচ্ছে–খুব চেনা কেউ–

'আপনি কি একটা ইশকুলে পড়াতেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। চন্দননগরে। ফ্রেঞ্চ শেখার ইন্টারেস্ট সেই জন্যেই হয়েছিল। মনে নেই? ওই থেকেই তো ফ্রেঞ্চ ক্লাসে ভর্তি হওয়া। আপনার ভায়ের সঙ্গে যেখানে আলাপ।'

'আর আপনি পড়ান না?'

'না, পাঁচ বছর বেকার। দে ফাউণ্ড মি আনফিট্ ফর এনি রেগুলার জব।'

'তাই? শরীর খারাপ হয়েছিল বোধহয়?'

'শরীর? নাঃ। শরীর খারাপ হয়নি।'

ডান হাত দিয়ে নিজের মাথায় টোকা মারলো–'মাথা!' সঙ্গে মধুর হাস্য।

'ও!' কয়েক মুহূর্ত কথার খোঁজে বেবাক্ বাতাস হাত্ড়ানো।

'আপনি ফ্রেঞ্চ চর্চাটা রেখেছেন?'

'কোথায় আর? আপনার কাছ থেকে মোশে মাশির বইটা নিয়ে গেলাম তারপর থেকেই–'

'দিদিমনি–' রেণু পর্দার আড়াল থেকে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করে, 'খেদিয়ে দিন! খেদিয়ে দিন!' হাত নেড়ে নেড়ে দেখায় রেণু।

'উনি কী বলছেন আপনাকে? দিদি?'

'কিচ্ছু না। আপনি কি বলছিলেন?'

'বলছি যে, আমি কিছুই পড়ছি না।'

'আপনার ভাই ফ্রেঞ্চ পড়ছে?'

'পড়ছে। মাঝে সেও ছেড়ে দিয়েছিল প্রায় ছ' সাত বছর।'

'ফাউন্ড আনফিট্?'–চোখে সিরিয়স উদ্বেগ।

'ওই রকমই বলতে পারেন।'

'ফ্রেঞ্চ ইজ আ ডেঞ্জারাস গেম।'

'তা বটে।'

'দিদি, আপনার সঙ্গে একসঙ্গে বসে আজকে আমি একটা কবিতা পড়বো বলে এসেছি।' সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ছেঁড়া ঠোঙার মত কিছু বের হয়।

'কিন্তু এখন আমি খুব ব্যস্ত যে–'

ছেঁড়া কাগজটা টেবিলের ওপর বিছিয়ে মন দিয়ে পরিষ্কার করে টেনে টেনে সোজা করতে করতে ছেলেটা বলে–'ব্যস্ত হলেই বা–এটা তো আর রোমাঁ নয়। ছোট্ট কবিতা। বেশি সময় নেবে না–' কাগজটা সমান হলে, আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়–

'এই কবিতাটা আপনি কি পড়েছেন? রনে শার-এর–'

তাকিয়ে দেখি গুজি গুজি অক্ষরে খুবই অস্পষ্ট জড়ানো হাতের লেখায় সত্যি সত্যি লেখা আছে–লা ব্রিসতেস দেজ ইল্লেৎরে দঁলে তেনেব্র দে বুতেই। ল্যাঁ কিয়ে ত্যুদ আঁপের সেপতিব্ল দে শারেরোঁ। লে পিয়েস দ্য মনেই দঁ লা ভাস প্রফঁদ।....ছ'টা লাইন।

এমন সময় দরজা খুলে শিবুর প্রবেশ। পরনে সাফারি স্যুট। হাতে ব্রিফকেস। অফিস ফেরৎ। ওপরে উঠেই চমৎকৃত। সোফায় সেই ছেলে বসে আছে। আমি এপাশে দণ্ডায়মান। পাহারাদারের ভূমিকায় পর্দার ওপারে রেণু উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। শিবু দৃশ্যটা দেখল। তারপর বলল, 'এটা কে–?' ছেলেটি শংকিত হয়ে ওঠে।

'আমি? আমি তো দিদির চেনা লোক। আমি তো হাওড়া থেকে প্রায়ই আসি দিদির কাছে। দিদির সঙ্গে আমার দরকার আছে। তাই না দিদি?'

'দিদি? আপনি একে চেনেন?' শিবু চ্যালেঞ্জ জানায়। আমি যার পর নাই লজ্জিত। তোত্লামি করছি। ছেলেটি কাঁদো কাঁদো।

'বলুন তো? বলুন তো ওঁকে। দিদি? উঃ, দেখুন না কেমন কচ্ছে!' শিবু কিছুই করে নি। শুধু তাকিয়ে আছে।

'চিনি, চিনি!' আমি বলে ফেলি।

'চেনেন?' শিবু অবিশ্বাসের ভ্রূভঙ্গী করে। 'চেনেন, তো ওর নাম কী?'

'নাম? উনি চন্দননগরে একটা ইশকুলে পড়াতেন। আর ফ্রেঞ্চ পড়তেন দীপংকরের সঙ্গে। হাওড়ায় ওঁদের বাড়ি–'

'হাওড়ায় কোথায়? শালকে? রামকেস্টপুর? কদমতলা? পঞ্চাননতলা? বল্লেই হল হাওড়া?'

'বেলিলিয়াস রোডের কাছে–এম সি ঘোষ লেনে থাকি। তাই না দিদি?'

'দিদি জানেন না। আমি জানলেই হবে। আপনি উঠুন। উঠে পড়ুন।'

'সে কি? আমার কবিতা?'

'কবি–তা?' শিবুর আত্মবিশ্বাস এবারে একটু স্খলিত।

'দিদির হাতে!'

'দিয়ে দিন, দিয়ে দিন।'

আমি তাড়াতাড়ি দিয়ে দিই। রেণুও পর্দার আড়াল থেকে হাত নেড়ে দিয়ে দিতে উপদেশ দেয়।

'এবার যান।'

'যাব কেন? আমার জিনিসগুলো?'

'কিসের জিনিস? শিবু অবাক।

'দিদি জানেন। দিদি দেবেন। হ্যাঁ।'

'কি দেবেন দিদি আপনাকে?'

'একটুকরো দড়ি–এক জোড়া চটি–আর বাথরুমে পনেরো মিনিট।' শিবু শুনেই শিউরে ওঠে–

'দড়ি? না না ওসব দড়ি–ফড়ি হবে না–দিদি! দড়ি ফড়ি দেবেন না যেন–'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো ছেলেটি। তারপর সেই ছোট শিশুর মত ঢোঁক গিলে গিলেই বলতে লাগলো–'কেন? ভয় পাচ্ছেন? গলায় দড়ি দেব? দূর! বি লজিক্যাল। যে সুইসাইড করবে, সে চটি চাইবে কেন? চটি পায়ে দিয়ে স্বর্গে যাবার কোনো দরকার হয় না। তাছাড়া, যে সুইসাইড করবে, সে ধারও চায় না। ধার শোধ করবে কখন তাহলে? আমি সুইসাইড করব না, অন্য দরকার আছে। ভয় পাবার কিছু নেই।' সান্ত্বনার অভয় মুদ্রা ছেলেটির হাতে। চোখে হাসি। শিবু এবার একটু থতমত। আমি বলে ফেলি–

'আচ্ছা? শায়ার দড়ি হলেই হবে?' লজ্জায় ঘেন্নায় মাথা নত করে ফেলে ছেলেটি–বলে–'এঃ ছি ছি! শায়ার দড়ি? কেউ ভদ্রলোককে ওসব দেয়? বেশ ভালো দেখে লাকলাইন দড়ি নেই?

রেণু ছুটে গিয়ে সন্দেশের বাক্স বাঁধা দড়ি এনে পর্দার পেছন থেকে অফার করে।

'এতে হবে?'

'এঃ ছি ছি। একে কি দড়ি বলে? এ তো সুতলি। ওতে হবে না। দেখি, বরং ওই পাজামার দড়িই দেখি।'

লক্ষ্য করলাম 'শায়া'টা 'পাজামা' হয়ে তবে গ্রহণ-যোগ্য হয়েছে। ঘর থেকে একটা পেটিকোট এনে তার দড়িটা খুলতে চেষ্টা করছি দেখি দড়িতে গিঁট দেওয়া, খুলছে না–

'ব্লেড দেবো? না কাঁচি?'–বলে ওঠে ছেলেটি।

'আছে, সঙ্গে?' ততোধিক দ্রুত শিবু বলে।

'না। ঘর থেকে খুঁজে এনে দিতাম।'

'থাক। তার দরকার নেই।' ইতিমধ্যে রেণু কাঁচি এনেছে। পেটিকোট দড়িশূন্য হয়েছে। ছেলেটি বললো–'ভেরি স্যরি। আপনার কত অসুবিধে করলাম। ওই পাজামাটা আপনি এখন কিছুদিন পরতে পারবেন না। কিন্তু আমার খুব উপকার হল। জামার বুকটা খোলা থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে। ফাল্গুন মাসেও হিম পড়ে। নিমোনিয়া হয়।'

'আপনি জামা আটকাবেন? তবে দড়ি দিয়ে কেন? সেফ্টিপিন্ দিচ্ছি। এঁটে নিন।'

জামাটি বুকের ওপর টেনে, দুই কপাট জুড়ে সমান করে, খিল তুলে দেবার মত, দড়িটি বগলের নিচ দিয়ে বুক পিঠে এক প্যাঁচ ঘুরিয়ে এনে ঠিক সামনে বাঁধলো।

'ও কি? ও কি? ওটা বুকে বাঁধা থাকবে কেন? সেফ্টিপিন্–'

'থাকবে, থাকবে। আমার যে কিমোনো পরা অভ্যাস আছে। আমি তো মাঝে মাঝেই জাপানে যাই, তখন খুব কিমোনো পরি। এবার বাথরুমে।' ছেলেটি বাথরুমের দিকে দৃষ্টিপাত করে।

'নিচে ইনডিয়ান আছে–এটা ওয়েস্টার্ন–আপনার যেটা প্রয়োজন?'

'আমার কোনোটাই প্রয়োজন নেই। আমি তো স্নান করবো। বেশ করে দিনের শেষে একবার স্নান না করলে–'ছেলেটা হাসতে থাকে।

'চলুন, চলুন, সামনেই টিউবেল আছে। আমি টিপে দিচ্ছি।' শিবু ধমক দেয়।

'ওতেই চলবে। চটি চাই এবারে। চটি কই?'

'চটি? আপনার পায়ের চটি কোথায় পাব? দীপংকরের একটাই চটি। সেটা পায়ে দিয়ে সে বেরিয়ে গেছে। আমারও একটাই চটি সেটা পরে রোজ আমি চাকরিতে যাই।'

'ওটা কার? ওই যে–?'

একটা আনকোরা নতুন নিচু হাইহীল চটি—কোলাপুরী—মেয়ের জন্য এনেছি সদ্য পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে—দিল্লি থেকে কিনে। বেচারা একদিনই পরেছে।

'আমার ছোটো মেয়ের। ওটা হাইহীল।'

'হোক গে। এখন ইউনিসেকস্ পোশাক।'

পা গলাতে শুরু করে দিয়েছে। প্রাণপণে শিবু বোঝাচ্ছে। ওটা তার মাপের নয়, পরে ঢুকবে না। পা কেটে ছিঁড়ে যাবে—আরো কষ্ট হবে—সে বুঝবে না। পরবেই। অবশেষে শুধু আঙুলগুলো ঢুকলো। ব্যাজার হয়ে শিবু বলল, 'সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যাবেন। চটি খুলে ফেলুন। এখানে আছাড় খেয়ে পড়লে, কে আপনাকে হাসপাতালে দেবে?'

'বেশ।' মুহূর্তে চটি খুলে দুহাতে করে বুকের কাছে তুলে নেয় ছেলেটি। ছেঁড়া বুশ শার্টের বুকে শায়ার দড়ি বাঁধা। হাঁটু পর্যন্ত লুঙ্গি। মুখে মিষ্টি হাসি। গোঁফ। দাড়ি। আমার ভয়ানক মায়া হয়।

'কীভাবে যাবেন? দাঁড়ান একটু আপনার বাস ভাড়াটা দিয়ে দিই—'

'আছে। আছে। প্ল্যাঁ দারজঁ।'

'তবু নিন। দুটো টাকা রাখুন। বাসে করে বাড়ি চলে যান। আর কোথাও যাবেন না।'

'চটি পরে যেন বাসে উঠবেন না। চাপা পড়ে যাবেন।'

শিবুর উপদেশ, 'বরং চটিটা রেখে যান।

'মের্সি ব্যকু' টাকাটা মুঠো করে নিয়ে অবহেলায় পকেটে রাখে। রনে শার-এর কবিতার সঙ্গে।

'চলুন, চলুন।' শিবু তাড়া দেয়।

'দিদি—মোশে মাশির সেই বইটা—'

'মাসি-পিসি কিচ্ছু দরকার নেই—আগে বাড়ুন দিকি।'

'দেখুন এই চটি দুটো আমি নেকস্ট্ উইকেই ফেরৎ দিয়ে যাব—'

'থাক থাক, ও চটি আর ফিইরে দিতে হবে নি—ও আপনি নে যান গে—আর এসোনি বাবু ইদিগে—' হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে রেণু পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে এসে আমার মেয়ের নতুন চটিটা ওকে দাতব্য করে দেয়। এই উদারতার কারণ খুঁজতে অসুবিধা হয় না। যাতে সে আর না আসে। অনেকেই পাগল ভয় পায়। রেণুও তাদের অন্যতম। এটা ভয়ের মহত্ত্ব।

'সত্যি? দিদি? দিয়ে দিচ্ছেন? এ চটি জোড়া তো আনইউজড্। একেবারে নতুন।'

'তা হোগ্‌গে যাগ্‌গে।' রেণু বলে। কিন্তু তার কথায় পাগল ভোলে না।

'দিদি দিচ্ছেন কি? দিদি?'

'হ্যাঁ ভাই। আপনি রেখে দিন।'

হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠে ছেলেটি মাটিতে নতজানু হয়ে বসে পড়ে। 'দিদি! এই করুণা আমি জীবনে ভুলবো না।' চটি জোড়া মাথার ওপরে ধরে বলে—'আমি ভরত! আপনি রামচন্দ্র। আমি আপনার অনুগত ছোট ভাই। এই চটি আমি মাথায় করে রেখে দেব। আমার দিদির স্নেহের দান বলে। এ আমি কোনদিন পায়ে দেব না। এই কাইন্ড্‌নেস-এর কোন তুলনা হয় না—যা চেয়েছি সব পেলাম। স-ব! দড়ি, চটি,—উঃ—কী সৌভাগ্য—'

'এবার চলুন। টিউবেল টিপে দিচ্ছি মুখ হাত ধুয়ে নিন। চানটা বাড়ি গিয়েই সারবেন—'

শিবু তাগাদা দেয়। চটি মাথার ওপরে দুহাতে ধ'রে এক পা এক পা করে সিঁড়ি দিয়ে ছেলেটি শিবুসমেত রাস্তায় নেমে যায়।—দরজা বন্ধ হতে রেণু বেরিয়ে আসে। বলে—'উফ্ দিদির ভায়েদের জ্বালায় তো আর পারিনে। কোথাকার উদ্‌মাদ্ পাগোল—সেও বলে, দিদি আমারে চেনে। বাজার যেতে যেতে আত্ হয়ে গেল। আর কিছু থাকবে?'

আমার এবারে সত্যি সত্যিই মনে পড়ে গেছে ছেলেটার নাম। প্রদীপ।

প্রদীপ গুইন। এই প্রত্যহের চাকরির রুক্ষ পৃথিবী ওর জন্য নয়। ওর জন্য ফুল, কবিতা ঝর্ণার অবসর। ঠিকই হয়েছে। ও এখন ফুল, কবিতা, ঝর্ণাধারার অনিঃশেষ ছুটির চাকরি পেয়ে গিয়েছে। আমরা কেউ ওকে বিরক্ত করতে পারব না। শিবু শত চেষ্টাতেও ওকে ঠেকাতে পারবে না। আজ সন্ধ্যায় সে ভরত। হাওড়া আজ অযোধ্যাপুরী।

পূর্বকথা

পৃথিবী ও মানুষ–দুয়েরই ইতিহাস আছে। এই দুই ইতিহাসের বুনোটে তৈরি সময় যেন সেই নদী–সে নদী বয়ে যায়–কিন্তু বয়ে যাওয়ার তত্ত্বতাবাসে সে উদাসীন। এই জীবননদীর আয়নায় ভেসে উঠেছে কত মুখ–সত্য বন্দোপাধ্যায় যিনি নিজের পরিচয় দিতেন ভারতবর্ষের মানুষ বলে, গঙ্গাচরণদার বাবা, মনোদিদির নিষিদ্ধ জগত। তখন দেশবিভাগ এসে রূপকথাকে খান খান করে ভেঙে দিয়েছে। যুদ্ধ এসে গোগ্রাসে গিলে খেয়েছে শৈশবকে। এভাবেই শিশুর জগত বদলে যেতে থাকে, এক দুপুরের 'কনসেসন'–এ অন্য রকম হয়ে যায় সে। শুরু হয় পাপবোধের এক গণ্ডীবদ্ধ জীবন।

জীবন রহস্য

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

।। ছয় ।।

কৈশোরও উবে যাচ্ছিল–আমিও একটু একটু করে লাস্ট বেঞ্চের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিলাম। রীতিমত রুটিন করে পড়ি। ঘন্টা মিনিট কিছুই অপচয়ের উপায় নেই। রুটিনের বজ্র আটুনির ভেতর ব্যাকরণ থেকে ভূগোল–লেটার রাইটিং থেকে অ্যালজেব্রা –সবই রেলের টাইম টেবেলের মত সানিয়ে নিতাম–

ভোর ৫ টা ১৫ মিঃ কবিতা মুখস্ত। ইংলিশ।
৫ টা ৩০ মিঃ আওরাঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়–কিংবা দাহিরের ভারত আক্রমণ।
৬ টা ৩০ মিঃ সাইমালটেনিয়াস ইকোয়েশন।
৭ টা ৩০ মিঃ প্রাকৃতিক ভূগোল। এশিয়ার নদীগুলির অববাহিকা।
৮ টা ৩০ মিঃ জলখাবার।
৮ টা ৪৫ মিঃ বাংলা রচনা।
৯ টা ৪৫ মিঃ মিল্টার মিকোবারের চরিত্র এম সেন হইতে মুখস্তকরণ।

এই ভাবেই রাত ১১ টা ১৫ মিঃ পর্যন্ত পড়াশুনোর নিচ্ছিদ্র আয়োজন। এর ভেতর খাওয়া-দাওয়া, স্নান, দাঁতমাজা, বাথরুম ইত্যাদির কারও ভাগেই পাঁচ মিনিটের বেশি বরাদ্দ করতে পারিনি। তবু গোল্লা। তবু একশোতে সাতাশ। রাতে ঘুমের জন্যে রেখেছি সাড়ে এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা –সাড়ে পাঁচ ঘন্টা মত।

লাস্ট বেঞ্চের বিভূতি হুই, মনোজ ঘোষ–ওরা আমায় লুফে নিল। আয় পানু–আয়–

রুটিনে ঘন্টা মিনিটের এদিক ওদিক হয়ে যেত। তখন নিজেকেই নিজে ২০ মিনিট পর্যন্ত অ্যালাউন্স দিতাম।

কিন্তু লাস্ট বেঞ্চে আসার পরে মনের ভেতরকার বিষাদভূমিতে দাঁড়িয়ে নানা রকমের গোলমাল পাকিয়ে তুলতাম।

এখন মনে হয়–পৃথিবীর চারদিককার সহস্র বিকাশের চল্লিশ দরজার উনচল্লিশ দরজারই যারা কোন হদিশ পায়নি–শুধু তাদেরই জন্যে সিলেবাস গিলে পরীক্ষার খাতায় উগরে দিয়ে অ্যানুয়ালে ভাল ছেলে হওয়া সম্ভব।

আগে বাংলা সিনেমার হিরোরা খুব ফাস্ট ক্লাশ ফাস্ট হত। জীবনেও এদের পেয়েছি। কৃতী। কিন্তু কোন বিদ্যুৎ খেলে না। বেশির ভাগই তাই। তবে ব্যতিক্রমও আছে। এই ব্যতিক্রম আমায় বারবার বিস্মিত করেছে।

ভবিষ্যতের পেপার সেটাররা যদি এভাবে প্রশ্ন করতেন–

১। বর্ষার ভেতর থার্ড পিরিয়ডে টরিসেলির ব্যারোমিটার পড়ানোর সময় ফিজিক্স স্যারের ঘ্যানঘ্যানানি ও বোর্ডে চকখড়ির খেলাধূলা তোমার কানে কোন্ ঢিমেতালা সুর হিসাবে প্রবেশ করে? উদাহরণ সহ লিখ। --১৬

অথবা

দিল্লি মেলের আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে হয়–গেট আউট–গেট আউট–তাহা হইলে নিম্নলিখিত আওয়াজ তিনটির কোনটি মাদ্রাজ মেইলের হইবে–চলপতি রাজলু, বোম্মানা বিশ্বনাথন, নরসিমা কোদণ্ড।

২। শীতের কুয়াশায় আমের বউলের ক্ষতি হয়। যতটা আম ফলার কথা ততটা ফলে না। যদি কুয়াশা তাড়ানো যায়–তাহা হইলে প্রচুর ফলনের আম খাইয়া আমরা কি ভাত বর্জন করিতে পারি? আম খাইবার পাঁচ প্রকার ভঙ্গী চিত্র সহকারে লিখ।

(পরীক্ষার শেষে বাছাই আম হইতে পাঁচটি আম খাইয়া ভঙ্গীগুলি দেখাও।)

এক্সটারনাল এগজামিনারের হাতে এই বাবদ ৮ নম্বর থাকিবে ফলে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর খেয়াল রাখা দরকার–যে ভাবেই আম খাওয়া হোক না কেন–গায়ের জামায় যেন রস না পড়ে। ফজলিতে ততটা সাবধান হওয়ার দরকার না হইলেও–ল্যাংড়া, হিমসাগরে অবশ্যই সতর্কতা প্রয়োজন।

বিভূতি হুই আত্মবিশ্বাসের অভাবে নানা কোশ্চেনের আনসারও গুলিয়ে ফেলতো। তোতলা বলে ওরাল পরীক্ষাগুলো ভণ্ডুল করে ফেলতো। কোন কোন স্যারের ক্লাসে বেঞ্চে দাঁড়ানো অবধারিত বলে ও আগে ভাগে স্ট্যান্ড আপ অন দি বেঞ্চ হয়ে যেতো।

মনোজ ঘোষ হেলাফেলায় থার্ড হোত। ও-ই আমাদের ছাপার অযোগ্য অসভ্য কথাগুলো শেখায়। সঙ্গে কয়েকটা অসভ্য কাজ। যেগুলোর কোনোটা নাকি আরব দেশে চালু। সাহেবরা কেউ কেউ বেশি বয়েসেও যা প্র্যাকটিস করে। নামী সব সাহেব। এমন কি ডি এইচ্ লরেন্সও।

উঁচু ক্লাসে এসে বিভূতি হুই গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল। আরও তোতলা হয়ে যাচ্ছিল। মনোজ ঘোষ উঁচু ক্লাসে ঘুড়ি ওড়াতে লাগলো। সুতোয় কাঁচগুঁড়ো দিয়ে মাঞ্জা দিতে লাগলো।

দেশবিভাগ বিভূতিকে একদম হারিয়ে দিয়েছিল। মনোজকে দু'পাঁচ বছর অন্তর পেতাম। এম বি বি এস পড়ছে। রেস খেলছে খুব। ফাস্ট এম বি পাশ করে পড়া ছেড়ে দিল। রেস। জুয়া। চোলাই। ইংরিজিতে এম এ পাশ করলো। টিউটোরিয়াল খুললো। সংস্কৃত থেকে ইকনমিক্স–সব পড়াতে পারে। বিয়ে করলো। নামী ইংরাজি স্কুলে টিচার। তার হাতে পরীক্ষার জন্যে তৈরি

ছাত্র—আমাদের দেশের প্রথম মহাকাশচারী।

বিভূতি হুইয়ের খবর পেলাম ওর মৃত্যুর পর। কনটেসা গাড়ির চিফ ডিজাইনার ছিল হিন্দমোটরে। এদের দু'জনের সামনেই সহস্র বিকাশের চল্লিশ দরজার উনচল্লিশ দরজাই খোলা ছিল। সিলেবাস গিলে ওগরাতে পারেনি বলে শুধু একটি বন্ধ ছিল। তা সে দরজাটাও মনোজের কাছে খোলা ছিল। মনোজ তাতে কোনদিনই মন দেয়নি।

চল্লিশ বছরের ওপারে সন্ধ্যার সেই বারন্দা মনের ভেতর পেরিসকোপ সমেত ডুবোজাহাজের কায়দায় ভুস করে ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। তখনই দেখতে পাই ধোঁয়াটে চল্লিশ বেয়াল্লিশটা বছরের ভেতরে সেই গোধূলির বারন্দাখানা কে আমূল বসিয়ে দিয়েছে। সেখান থেকে খানিক আগে বুড়ি মুড়িওয়ালি উঠে গেছে। বাবা এই মাত্র হেরিকেন

> চল্লিশ বছরের ওপারে সন্ধ্যার সেই বারন্দা মনের ভেতর পেরিসকোপ সমেত ডুবোজাহাজের কায়দায় ভুস করে ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। তখনই দেখতে পাই ধোঁয়াটে চল্লিশ বেয়াল্লিশটা বছরের ভেতর সেই গোধুলির বারন্দাখানা কে আমূল বসিয়ে দিয়েছে।

তুলে আমার মুখে তাকিয়ে একগাল হাসলো। তারপর বললো, আশ্চর্য! মা বলল, কাশীবাবুকে একবার ডাকো।

কাশীবাবু আসলে ডাক্তার। কাশীডাক্তার। তার জুতোর গোড়ালিতে ঘোড়ার নাল লাগানো থাকতো। তিনি এল এম এফ। রামকৃষ্ণের খুব ভক্ত ছিলেন। হাঁটলে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ জুতোয়। ডাক পেয়ে বারন্দায় এসে চুপ চাপ বাবার কাছে সব শুনলেন। বাবার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। তখনো তার চল্লিশ হয়নি। হাট্টা কাট্টা জোয়ান ছিলেন কাশী ডাক্তার।

সব শুনে কাশী ডাক্তার আমার চুলের মুঠি ধরলেন। তারপর নাল লাগানো সেই জুতো এক পার্টি পা থেকে খুলে আমার পিঠে পায়ে গদাম গদাম করে বসিয়ে দিতে লাগলেন। আমার পিঠে রক্ত। হাঁটুতে রক্ত। এক সময় ক্লান্ত হয়ে নিজেই থামলেন।

নাল লাগানো জুতোর এক পার্টি পা থেকে খুলে কাশী ডাক্তার আমাকে পেটাতে লাগলেন।

থেমে বললেন, চল। ঘরের ভেতরে চল।—মাকে ডেকে বললেন, লণ্ঠনটা দেবেন তো বৌঠান। একবার ল্যাংটো করে দেখতে হয় ছেলেটাকে—

ল্যাংটা হবো কি! আমার তখন চোখে চল। নাকে জল। ঠোঁট চেপে পিটুনী সইতে গিয়ে দাঁতের চাপে ঠোঁট কেটে রক্ত। আর পিঠে পায়ে তো রক্ত ছিলোই।

ঘর বন্ধ করে ধমকে উঠলেন কাশী ডাক্তার। ল্যাংটা হ বলছি। হলাম। আমি যেন কুকুর বা ছাগল। তিনি লণ্ঠন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। নাঃ। ভাল বোঝা যাচ্ছে না।—বলেই চেঁচিয়ে মাকে ডাকলেন, বৌঠান একটা টর্চ দেবেন।

মা জানলা দিয়ে টর্চ দিল। কয়েকবার ফোকাস মেরে গম্ভীর গলায় বললেন, যা ভেবিছি। নে—প্যান্ট পরে নে—বলতে বলতে কানের ওপর এক চড় কষালেন।

তখন কাশী ডাক্তারের ওপর আমার একটুও রাগ হয়নি। রাগ হয়েছিল—মা বাবার ওপর। আমি কি তোমাদের ছেলে নই? আমি কি তোমাদের কেউ নই? তোমাদের সামনে গরু পেটানোর মত আমায় পেটাচ্ছে—আর তোমরা চুপ করে আছো?

আমারও ইচ্ছে হচ্ছিল—বাবার মুখের সামনে হেরিকেন তুলে একগাল হেসে বলি—আশ্চর্য!

কাশী ডাক্তার ঘরের বাইরে বারন্দায় এসে বললেন, একটা নতুন ওষুধ বেরিয়েছে। বরফের ভেতর রাখতে হয়। পেনিসিলিন। একবার ডঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে কনসাল্ট করা দরকার।

কনসাল্ট করে রক্ত পরীক্ষা, ইনজেকশান, ওয়াশ সবই চলল। আমাকে সারাদিন মশারির ভেতর আলাদা রাখা হোত।

আমার যে ঠিক কোন্ রোগটা—আমি তা আজও জানি না। গনাদা? না শেফালিদি? পরে, অনেক পরে বেশ কয়েকবার আমি সব রকম টেস্ট করিয়ে ফেলেছি। আমার আর কোন অসুখ নেই। একেবারে সন্দীপনের উপন্যাসের নাম বললাম!

পরে অনেক পরে একবার এক বন্ধু বলেছিল—ওটা কোন রোগই নয়। একরকমের চুলকুনী। কয়েকবার ইনজেকশন নিতে হয় মোটে। তারপর সব ক্লিয়ার। আমি সিওর হয়ে তো তবে বিয়ে করলাম।

তখন ট্রিটমেন্টের ঝক্কি আমার গায়েই লাগেনি। কিন্তু মনের ভেতর দিয়ে একটা রোড রোলার চলে গেল। চিরকালের মত বিষাদ কেমন করে আমার মনের ভেতর স্থায়ীভাব হয়ে দাঁড়ল। আজও যা কিছু হাসিঠাট্টা, স্ফুর্তির ঝিলিক ওঠে মাঝে মধ্যে তা শুধু অন্তরা। স্থায়ী পর্দা সেই বিষাদ।

পাড়ার গার্জিয়ানরা তাদের ছেলেমেয়েদের আমার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিল। আমি চিকিৎসার সময় মশারির ভেতর থাকি। দিনের বেলাতেও। থালাবাটি গামছা সব আলাদা। যেন ডেটিনিউ। যেন জলবসন্ত হওয়ায় আলাদা ঘরে পরীক্ষার সিট পড়েছে। আলাদা গার্ড।

সেরে যাবার পর পাশের বাড়ির বারন্দাগুলোর পাশ দিয়ে ঘুরঘুর করি। আমাকে দেখেই সব বাড়ির ছেলেমেয়েরা উঠে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

একদিন ঘুটঘুটে জ্যোৎস্নার সন্ধ্যায় বাড়ির সামনের মাঠে বেপাড়ার কিছু বন্ধুর সঙ্গে খেলছি। মা ছাদ থেকে বলল, এই ম্যাগাজিনটা নিয়ে যা পানু—

ওপরে গেলাম। মাসিক বসুমতি।

মা বলল, এই প্রবন্ধটা পড়িস।

আলোয় এনে প্রবন্ধটা দেখলাম। হীনমন্যতা ও তাহার প্রতিকার। নিচে নেমে এসে না পড়েই প্রবন্ধর পাতা তিনটে ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেললাম। মাস কয়েক পরে স্কুল হস্টেলে সরস্বতী প্রতিমার ডেকরেশন করছি—দেবদারু পাতা দিয়ে। রাত ন'টা হবে। পরদিন সকালেই পুজো।

পেছন থেকে অন্ধকারে আমার নাম ভেসে উঠল। পানু—

গম্ভীর গলা। এ তো মেজদার গলা। ঢাকা থেকে মেজদা কখন এল সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। হস্টেল কম্পাউণ্ড পেরোতেই মেজদা মারতে শুরু করলো। হস্টেল থেকে আমাদের বাড়ি ছিল তিন মাইল।

মেজদা সে-রাতে আমায় মোট তিন মাইল মারলো। রাস্তার পাশের নাবি জমি। কিল চড় খেয়ে সেখানে গড়িয়ে পড়ছি। আবার উঠে আসছি। আবার চড় খেয়ে গড়িয়ে গিয়ে নিচে পড়ছি। আবার উঠে আসছি।

মেজদা সম্ভবত মায়ের চিঠিতে সব জেনেছিল। অনেকদিন পরে বাড়ি এসে আমায় অত রাত অব্দি ফিরতে না দেখে রাগ হওয়া তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল।

নয়তো মেজদা আমায় খুবই ভালবাসতো। বড়দা চাকরির জায়গা থেকে ফিরে এসে মেজদার অনেক আগেই সব শুনেছিল। বড়দা সব শুনে

মেজদা পেছন থেকে গম্ভীর গলায় ডাকল, পানু—

বলেছিল–থাক। পানুকে কেউ আর কিছু বোলো না।

তনুদা আমায় কিছু বলেনি। লা মিজারেবল্ পড়তে দিয়েছিল। তাতে একটা লাইন ছিল। গড্! উড্ নট মাই চেইন মেটস্ লাফ্ টু সি কনভিক্ট নাম্বার হেজিটেটিং টু

তখন সত্যিই মনে হয়েছিল–আমার কিছু শৃঙ্খল-সঙ্গী আছে। তারা অদৃশ্য। তাদের মত আমিও একজন কনভিক্ট। তারা সব সময় পাশাপাশি থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে খারাপ কাজ করে। নয়তো কিছু দিনের ভেতর সোনামুচিই বা আমায় জুতোপেটা করবে কেন?

বড়দার বিয়ের অল্পদিনের ভেতর সোনামুচির বিয়ে দেয় মা। বিয়ের কয়েকদিনের ভেতর সোনামুচির একটা আংটি হারায়। আমি তখন দাগী হয়ে পড়েছি। চোর সন্দেহে সোনামুচি আমায় পেটালো। পায়ের মাম্পস্ু দিয়ে। কিন্তু যে জিনিস আমি চুরি করিনি–তা ফেরত দেব কি করে! এমনিতে সোনামুচি কিন্তু আমায় খুব ভালবাসত।

এরপরই আমি সত্যি সত্যি একটি খারাপ কাজ করলাম। বিড়ি বাঁধতো আজাহারদা। তার বুক পকেটে সবসময় একটা রাজা ফাউন্টেন পেন থাকতো।

পেনটা দাও তো আজাহারদা। একটু লেখা লিখে ফেরৎ দিয়ে যাবো।

পেনটা নিয়ে গিয়েই আড়াই টাকায় বেচে দিয়ে সেই পয়সায় শৃঙ্খলসঙ্গীদের নিয়ে সাদা পাটালি খেলাম। সঙ্গে কলের জল।

সন্ধ্যেবেলা আজাহারদা কলমটা চাইতে এলো। কোত্থেকে দেবো? তখন হিসেব কষতাম এই ভাবে–একটা খারাপ কাজ করলে কতক্ষণ আর মারবে! বড়জোর আধঘন্টা। তিনমাইল মারবার মত দম ক'জনের! কুঁজো হয়ে দম বন্ধ করে পিঠে মার খেলে ব্যথাও লাগবে না। তারপর তো ফ্রি। আমি যে তখন দাগী। তাই মার খাওয়া হয়ে গেলে চোখ মুছে বাড়ির পেছনের বাঁশবাগানে–কিংবা দূরে ভৈরবের পাড়ে গিয়ে নাক ঝেড়ে খিক্ খিক্ করে হাসতাম।

ভাবখানা–খুব ঠকানো গেল যাহোক। মেরে মেরে ওদের হাতের ব্যথা করাই সার। আমার তো আর তেমন লাগেনি। মাঝখান থেকে আড়াইটা টাকাই লাভ। দিব্যি পাটালি খাওয়া গেল পেটভরে। কলের জল দিয়ে–পাটালি খেতে কী যে ভাল! সঙ্গীদেরও খাওয়ানো হোল। কত মারবি মার না! কত অপমান করবি কর না! আমার তো কিছু এলো গেলো না। মাত্র বিশ ত্রিশ মিনিটের মারামারি অথবা গালাগালি। কিংবা দুটোই সাই-মালটেনিয়াসলি। যাকে বলে যুগপৎ! অনেক পরে এর দোসর একটা শব্দ পাই। যুগপোযোগী। তা আমি আসলে যুগপোযোগী ধোলাই খাচ্ছিলাম।

তখন আমার চেইনমেটস্ ছিল বিভূতি, মনোজ, আসফাকুল, মাখম, মোয়েদুল, নৃপেন, শান্তি। ওরা আমায় লুফে নিয়েছিল। শান্তির বাবা পুলিশ হাসপাতলে ডাক্তার ছিলেন। মাতৃহীন শান্তির সৎমায়ের অনেক ছেলেমেয়ে। শান্তি বাড়িতে মার খাবার পর বাড়ি থেকেই পোর্টেবেল কলের গান এনে মাঠে বসে ৭৮ রেকর্ড বাজাতো।

ম্যাট্রিক পাশ করেই দেশভাগের ঠিক পরে শান্তি এয়ার ফোর্সে রেডার মেকানিক হয়ে ঢোকে। ঠিকানা জালাহালি ক্যাম্প বাঙ্গালোর। খাওয়া থাকা পোশাক ছাড়াও মাসে নগদ একশো আশি টাকা। ওই পোস্ট থেকে কেউ কোনদিন পরীক্ষা দিয়ে ফ্লাইং অফিসার হতে পারে না। খুবই অসম্ভব। কিন্তু শান্তি হয়েছিল।

কমিশনড্ অফিসার। কলকাতায় এলে লাইট হাউসে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতো আমায়–পকেট ভর্তি টাকা। তখনই নাকি ফ্লাইং অ্যালাউন্স নিয়ে মাসে তের চোদ্দশো টাকা পেতো শান্তি। এই সময় গমের সের পাঁচ আনা। কাটা পোনার সের দু'টাকা। চালের মন আঠারো টাকা। আমি বিভিন্ন পরীক্ষায় চাকরির জন্যে বসে যাচ্ছি–আর ফেল করছি।

এয়ার ফোর্সে জেট প্লেন চালু হল। রিপাবলিক ডে-তে দিল্লির মার্চ পাস্টে শান্তি জেট চালিয়ে রাষ্ট্রপতির মাথার ওপর নেমে আবার মেঘের ভেতর উঠে গেল। কাগজে নাম দেখলাম আমরা কলকাতায় বসে।

একদিন আমি আর মনোজ টালা পার্কে বসে চিনে বাদামের খোসা ভাঙছি–আর মতলব ভাজছি–কোথায় পয়সা পাওয়া যায়–এসপ্ল্যানেডে যাবো বাসে টিকিট না কেটে–কিন্তু অনাদিতে অন্তত দুটো মোগলাই খাবো।–সন্ধ্যের ভেতর জ্যোৎস্না বেরিয়ে পড়েছে। হঠাৎ খেয়াল হল–পার্কের ভেতর টিউবয়েলের কাছে একটা লোক খুব ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছে।

কিরকম সন্দেহ হল। এত ঘন ঘন তো কেউ সিগারেট ধরায় না। একটা সিগারেটেই একটা দেশলাই খতম করে দিচ্ছে? আশ্চর্য! দু'জনে কাছে গিয়ে দেখি–শাদা ট্রাউজারের ভেতর শাদা শার্ট গুঁজে একটা লোক মাথা নিচু করে কেবল সিগারেট ধরাচ্ছে–আর জলন্ত সিগারেটটা আগুন সুদ্ধু বাঁ হাতের কবজিতে চেপে ধরে নিভিয়ে ফেলছে। আবার আগুন ধরাচ্ছে সিগারেটে–আবার কবজিতে আগুনটা চেপে ধরবে বলে।

পাগল নাকি! আমরা দু'জন একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম। মনোজ লোকটার হাত থেকে দেশলাই সিগারেট কেড়ে নিতেই সে রাগে আমাদের দিকে তাকিয়েই ছুটে তেড়ে এল।

শান্তি? তুই?

থতমথ খেয়ে শান্তি দাঁড়িয়ে পড়ল। তোরা? এখানে? এখন?

আমরাও তো তাই ভাবছি। তুই? এখানে?

সেদিন আমরা তিনজন পার্কের ভেতর থেকে যখন রাস্তায় বেরোলাম–লাস্ট বাস চলে গেছে অনেকক্ষণ। অনাদির মোগলাই একবারও মনে পড়েনি আমাদের।

শান্তি শুধু বলেছিল–আর কোনদিন আমায় প্লেন চালাতে দেওয়া হবে না। ভাবতে পারিস? তাই বলে নিজের হাতে সিগারেটের ছ্যাকা দিবি?

শান্তি পিস স্টেশনে থাকার সময় এক এয়ার ভাইস মার্শালের বউয়ের সঙ্গে তিন চারদিন টেনিস খেলেছিল। মহিলা ওকে খুবই স্নেহ করতেন। ব্যাপারটায় ভাইস মার্শালের চোখ টাটায়। ঠিক এই সময় একটা নতুন ধরনের প্লেন চালাতে গিয়ে শান্তি যন্ত্রপাতির ব্যাপারে আপত্তি বা সন্দেহ জানায়। ডাইভ মারার পরই উঁচুতে ওঠার সময় প্লেনটার যতটা তীরগতিতে ওঠার কথা–তা উঠছে না। শান্তির সন্দেহ–অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।

বাঙালী ভাইস মার্শালটি বলল, তোমার আপত্তি লিখে দাও।

সরল বিশ্বাসে শান্তি লিখে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শান্তির কোর্ট মার্শাল। বরখাস্ত। অপরাধ: বিদ্রোহ। সশস্ত্র বাহিনীতে মুখে যা-ই বল তাতে যায় আসে না। কিন্তু একা যদি কিছু লিখে আপত্তি কর তো সেটা চরম বিদ্রোহ। ক'জন মিলে ওকথা লিখলে কিন্তু বিদ্রোহ নয়।

এত কষ্ট করে কমিশন পাওয়া শান্তির সামনে জগৎ অন্ধকার হয়ে যায়। সেই শান্তি বেকার হয়ে কলকাতায় ফিরে হাতে সিগারেটের ছ্যাকা দিয়ে চলেছে।

আমরা বললাম, চল ময়দানে গিয়ে ফুচকা খাবি। মন শান্ত হবে খেয়ে। সঙ্গে তেঁতুলের জল দেয়।

এছাড়া আমরা আর কি বলতে পারি। মনোজ তখন ফাস্ট এম বি বি এস পাশ করে টকসিসিটি, অ্যানাটমির বই বেচে দিয়ে রেস খেলছে। কলকাতা তো আছেই। বোম্বাই বাঙ্গালোরও বাদ যায় না। আমি তখন পুলিশের সার্জেন্ট থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর অব একসাইজ–সব চাকরিতে পরীক্ষা দিচ্ছি। ইন্টারভিউ দিচ্ছি। একটাও গাঁথছে না।

সেই শান্তির ছবি দেখলাম সেদিন–স্টেটস্-ম্যানে। কোন্ এক বিরাট ব্যাটারি কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ের বক্তৃতার সঙ্গে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে শান্তির ছবি। ফুলো ফুলো গাল। যেন এই মাত্র জলন্ত সিগারেটের ছ্যাকায় সারা মুখে ফোসকা উঠে ফোলা ফোলা।

শতাব্দী তখনো এমন ফুরিয়ে আসেনি। গোটা দু'ই মহাযুদ্ধ, কয়েকটা ঘূর্ণিঝড়, একটা করে ভূমিকম্প আর দুর্ভিক্ষ অভিজ্ঞতার ঝুলিতে ভরে শতাব্দী বেশ এগোচ্ছিল। পাকা আমটির মত সময়ের মগডালে মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবার ঝুলছিল। কে জানতো দেশবিভগের একটা ঢিল ছিটকে এসে' লাগতেই সে–আমটিও টুক করে খসে পড়বে।

বড়দা মেজদা চাকরিতে ঢুকে পড়ায় আমাদের বাড়িটা তখন সবে ঝলমল করে উঠছে একটু। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি। মালকোচা দিয়ে ধুতি পরে কালো পাম্পস্ু পারে বড়দা তার সাইকেল চালাতো। মাথায় কোঁকড়া চুল। টিকালো নাক।

আমাদের ভাই বলেই মনে হত না। যেন অন্য কোন জায়গা থেকে বেড়াতে এসেছে বড়দা—এত সুন্দর। জ্যোৎস্নারাতে বড়দা বড়বউদি হারমোনিয়ম বাজিয়ে ডুয়েট গাইত। জগন্ময়ের গান। সাতটি বছর পরে। শ্রোতা আমি, টোটো, উমা, টাপু, মা। আশপাশের বাড়ির মেয়েরা।

পৃথিবী কী নিদারুণ স্পিডে পালটে যাচ্ছে। ইংরেজরা চলে যায় যায়। বাবার বিশ্বাস হল না। বড়বউদির বাবাকে বলল, বেয়াই—আমার কেমন অবিশ্বাস হয়। ওরা সুন্দরবনে গিয়ে গুৎ পেতে বসে থাকবে। একদিন ছুটির দুপুরে বড়দার বন্ধু নন্টুদা এল। একটা দরজার খানিকটা ভেজিয়ে দিয়ে বড়দা হারমোনিয়াম আর বড়বউদিকে নিয়ে মাদুরে বসলো। নন্টুদা তবলায়। নাগে তেটে তাগে ধিন। বড়বৌদি বেলো করে গাইছে। বাবা বাইরের বারন্দায় তেলের বাটি থেকে সর্ষের তেল নিয়ে মাখতে মাখতে বলল, যত্ত দুশ্চরিত্তিরের কাণ্ড।

মা ধমকে উঠলো, বল কি তুমি? নতুন বিয়ে করেছে—একটু হাউস আল্হাদ থাকবে না? নন্টুদা তবলায় পাউডার ঢেলে চাটি দিচ্ছে তখন। আর মাঝে মাঝে সেই পাউড়ার খানিকটা নিজের ঘাড়েও মেখে নিচ্ছে। বড়বউদির গানের গলা ভারি সুন্দর। জানলা দিয়ে সে গান পাড়ার গাছপালার ভেতর দিয়ে যতীন সিংঘির মাঠের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।

শরতের সঙ্গে একদুপুরের মনোদিদি আমায় অপমান, লজ্জা, গঞ্জনা, ধোলাইয়ের কুম্ভীপাকে ফেলে দিয়েছিল। আমাকে দেখে পাড়াপড়সী গার্জিয়ানদের সাবধান হয়ে যাওয়ার ভঙ্গীটা আমি যে আজও ভুলতে পারি না।

তাই স্থায়ী বিষাদ গায়ে মেখে আমি যখন নদীর পাড়ে, নির্জন রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—আর ফাউনটেনপেন চেয়ে নিয়ে বেচে দিচ্ছি—চেইনমেট-সদের নিয়ে এক একটা খারাপ কাজের পর বিপদ কেটে গেলে খিক্ খিক্ করে হাসছি—তখন বড়দা বড়বউদির গান, তনুদার রিসাইটেশন প্র্যাক-টিস আমায় অন্য পৃথিবীতে নিয়ে যেতে লাগলো—যেখানে শোনার আনন্দে আমি বাকি পাঁচজনের সঙ্গে একই লাইনে পড়ি। আমাকে মশারি টানিয়ে তার ভেতর আলাদা রাখা হয় না।

মেজদা ছুটিতে এসে বাঁশ কেটে উঠোনে বাঁশের বেঞ্চ বানাতো। এই বানিয়ে তোলার আনন্দে আমি মেজদার হাতে পেরেক হাতুড়ি, দা এগিয়ে দিতাম। বেঞ্চ তৈরি হয়ে গেলে তাতে বসে পা দোলাতাম। যেন পার্কের বেঞ্চেই বসে আছি। মেজদা তো একবার বাঁশের প্যারালাল বার বানালো। তাতে অনুদা আর মেজদার সে কি দোল খাওয়া। হাওয়ার ভেতর শরীরের অনেকটা ওপরে উঠে আবার দুই বারের ভেতর এসে পড়ছে—আমি তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দোল খাই মনের ভেতর। আজও খাই।

উঠোনের ভেতর বেঞ্চ বানিয়ে পার্ক এনে ফেলা—প্যারালাল বার বানিয়ে জিমনাসিয়াম এনে ফেলা—এতো ছিল মেজদার ইচ্ছেপূরণ। বর্ষায়

তাই স্থায়ী বিষাদ গায়ে মেখে আমি যখন নদীর পাড়ে, নির্জন রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—আর ফাউনটেনপেন চেয়ে নিয়ে বেচে দিচ্ছি—চেইনমেটসদের নিয়ে এক একটা খারাপ কাজের পর বিপদ কেটে গেলে খিক্ খিক্ করে হাসছি—তখন বড়দা বড়বউদির গান, তনুদার রিসাইটেশন প্র্যাকটিস আমায় অন্য পৃথিবীতে নিয়ে যেতে লাগলো।

সে বেঞ্চ পচে যেতো। প্যারালাল বারের খুঁটি ঢলঢলে হয়ে পড়ত। একসময় মা সে-গুলো রান্নার জ্বালানী করে ফেলতো।

ঘরের ভেতর হাঁটতে গিয়ে ট্রাঙ্কে গুতো খেতে হোত। নয়তো আলনায় কিংবা চৌকিতেও গুতো খেতাম। মেজদা ছুটিতে এলে চার পাঁচদিন অন্তর সব জিনিস সরিয়ে নতুন ভাবে ঘর ঠিক করতো। যাতে কিনা হাঁটাচলার সুবিধে হয়—আলো বাতাস খেলতে পারে। এই ভাবে সরিয়ে নাড়িয়ে মেজদা কয়েকবারের মাথায় ঘরকে আবার শুরুর জায়গায় ফিরিয়ে আনতো। এই জিনিসটা আমি এখনো করি। মেজদার অনেক জিনিস আমার ভেতর এসে গেছে।

সেই এক দুপুরের অজানা মনোদিদি আমায় যে গাড্ডায় ফেলে দিল— তার নাম শুকনো কুয়ো—যার ভেতরে দাঁড়িয়ে আমার মাথার ওপরের গোলমত আকাশ দেখতে পাই শুধু। কিন্তু সেখানে যেতে পারি না। এই শুকনো কুয়োটায় সব অপমান গড়িয়ে এসে আমার দম বন্ধ করে দিচ্ছল।

কোনক্রমে মাথা তুলে আমি নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম। আর সেই সময় দেখতে শিখছিলাম। তখনই খুব করুণ জিনিস দেখে তার ভেতরেই কোন জিনিসটা হাসির—তা আমি দেখে ফেলি। আমার হাসির ভেতর কোন জায়গায় করুণ গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ছে—তাও দেখতে শিখি।

মেজদা টিউশনির টাকায় মাকে এক শীতে র‍্যাপার কিনে দিল। কিনে দিল একটা স্টিলের ট্রাঙ্ক। আর নিজের জন্যে কিনলো এক জোড়া স্যান্ডেল।

বড়দা ছুটিতে এসে সেই স্যান্ডেল পায়ে গলিয়ে মায়ের কাছ থেকে র‍্যাপার খানা চেয়ে বড়ুয়া স্টাইলে গায়ে জড়িয়ে আড্ডা দিতে বেরিয়ে গেল।

মেজদা রাগে বলল, দাদার বিহেবিয়ারটা একদম গাধার মত। মায়ের সেই সেন্টেন্সটা মুখস্ত হয়ে গেল। মা কথাগুলো রিপিট করে [illegible] হা হা করে হাসতো। পরে র‍্যাপার [illegible] মেজদা বড়দার আয়ের তুলনায় তুচ্ছ [illegible] একদিন। তখনো মা এই সেন্টেন্সটা রিপিট করতো। আর হাসতো।

এক একজনের এক একটা হাসি—এক একটা কথা সময়ের সব লম্বা দৌড় টপকে একদম তরতাজা থেকে যায় চিরদিন। এই চিরদিনের কথাটায় একটা আনন্দ আছে। আবার দুঃখও আছে। কঞ্চিতে ধুতির সুতো আটকে থাকার মতই খাঁজে একখানা হাসি কিংবা একটা কথার টুকরো আটকে থাকে। তার চারপাশ দিয়ে গল গল করে পৃথিবী বয়ে গেছে। শুধু ওই জায়গাটায় সেই সময়টার খানিক খানিক চোর কাঁটার ধাঁচে বিঁধে আছে। এ বড় আনন্দের। এ বড় বিষাদের।

মোয়েদুল, আসফাকুল, হায়দার আলি, আনোয়ারদারা মুসলিম লিগ হয়ে গেল আচমকা। আসলে ওদের বাবারা কাকারা মুসলিম লিগ হয়ে গিয়েছিলেন। সবাই মাথায় ফেজ পরতে শুরু করে দিল। নমাজের স্রোত নামলো। কলকাতা থেকে নেতারা এসে সভা করতে লাগলেন। কবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী অবিচার করেছেন—ওঁদের পূর্বপুরুষদের ওপর—সেজন্যে নিজ বাস-ভূমে আমারা পরবাসি হয়ে উঠতে লাগলাম। তখনো জানি না-এতদিনকার নিজ বাসভূমি থেকে আমরা শীগগিরিই পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতা পাড়ি দেব।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গী শুধু আসরাফউদ্দিন চৌধুরী এই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সভা করলেন। সে সভায় মুসলিম লিগ ইট মারলো। এতকাল পাশাপাশি বড় হয়েছি। কোত্থেকে এক অবি-শ্বাসের মেঘ এসে হাজির। আর যুক্তিটা বড় অদ্ভুত। তুই জল ঘোলা না করিস—তোর পিতামহ—প্রপিতামহ তো ঘোলা করেছে। এই যুক্তিতে আমরা আলাদা হয়ে যেতে থাকলাম। একটু একটু করে। সে যে কি কষ্টের।

গুরুজনরা বলতে থাকলেন—এখানে আর থাকা যাবে না। তার মানে—এই খেলার মাঠ, এই পুকুর ঘাট, এই নদীর পাড়—এই মোয়েদুল, বজলা, ফেরদৌসদা—সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে? তা কখনো হয়!

আমাদের বন্ধু শুধু নাজিমের বাবা এর বিরুদ্ধে ছিলেন। ওদের বাড়ি সন্ধ্যেবেলা অরগান বাজিয়ে গান হোত। আব্দুল হাকিম কৃতী উকিল ছিলেন। হকসাহেবের সময় একবার বোধয় স্বীকার হন। তিনি বন্দেমাতরম গান হলে উঠে দাঁড়াতেন।

পাকিস্তান হবার পর সেজন্যে তাঁকে অনেক দাম দিতে হয়। তাঁর ছেলে আলো—ভাল নাম নাজিম মাহমুদ—আমরা নাজিম বা আলো বলে ডাকতাম। তাঁর আব্বার ট্রাডিশন আজও সমানে বয়ে চলেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরই উৎসাহে রবীন্দ্রসঙ্গীত মেলা বসে।

হেরিকেনের সামনে বসে ধাতুরূপ শব্দরূপ মুখস্ত করতে করতে একদিন সন্ধ্যেবেলা শুনলাম—

দেশ ভাগ হবেই। আমাদের বাবা মা দেশভাগ যে হতে পারে তা কোনদিন বিশ্বাসই করেননি। মোয়েদুলের বাবা, আসফাকুলের বাবারা খুব খুশী হল। দেশভাগ পাকাপাকি ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের বাবারা গুম মেরে গেলেন।

স্বাধীনতার দিন বিকেলেই চাঁদ উঠলো। প্রায় তখন সন্ধ্যে সন্ধ্যে বলা যায়। আমি আর বজলা আবছা আলোয় একটা সাপ মারলাম। বজলা বড় সুন্দর দেখতে ছিল। সাহসীও খুব। রান্নার ছোট্ট চ্যালাকাঠ দিয়েই ও সাপটাকে মারলো। আমাদের ইংরাজি র‍্যাপিড রিডারে টেলস্ ফ্রম গ্রিক ট্রাজেডিতে অ্যাপোলোর গল্পটা ছিল। ওকে আমার অ্যাপোলো মনে হত

মরা সাপটা পোড়াবার পর বজলা বলল, জানিস কাল রাত্তিরে পাকিস্তান হয়েছে। ঢাকাতেও পাকিস্তান হয়েছে—

বাড়ি ফিরে ভেতরের ঘরে দেখি—মা গম্ভীর হয়ে বসে ইন্ডিয়া স্বাধীন হচ্ছে আজ। অথচ মায়ের মুখে কোন হাসি নেই। স্বাধীনতা তো একটা বিরাট ব্যাপার। কেননা—সবাই সব সময় এই নিয়ে কথা বলছে।

বাবা আজকাল সকাল সকাল কোর্ট থেকে ফিরে আসে। বড়দা তার কাজের জায়গায় চলে গেছে। যাবার আগে কয়েক মাস আগে মাকে বোঝাছিল—কীভাবে বড়দা সাইকেলে যাতায়াত করে ট্রেনের ভাড়াটা টি এ বিলে পায়। কথাগুলো সব আবছা মনে আছে। অফিসের ক্যাম্প বসেছে গড়বেতায়। বড়দা মেদিনীপুর থেকে সাইকেলে শেষরাতে রওনা হয়। ঘন্টা দুইয়ের ভেতর পৌঁছে যায়। ত্রিশ বত্রিশ মাইল রাস্তা। আবার সারাদিন কাজের পর সাইকেলে সন্ধ্যা সন্ধ্যা মেদিনীপুর রওনা দেয়।

অনেক পরে ভেবে দেখেছি—তখনকার রেলে এই যাতায়াতে ক'টাকাই বা পাওয়া যেতো? যেজন্যে বড়দা এতটা সাইকেলে যাতায়াত করতো? তাঁর ইনজিনিয়ার ছেলেকে রোজ এয়ার কন্ডিশনড্ মোটর হায়দারাবাদ থেকে ত্রিশ মাইল দূরে সাইটে নিয়ে যায়। আবার সন্ধ্যেবেলা হায়দারাবাদে ফেরৎ দিয়ে যায়। চল্লিশ বছরের তফাতে ডিস্ট্যান্স সেই ত্রিশ বত্রিশ মাইল রয়ে গেছে। সাইকেলের জায়গায় এয়ার কন্ডিশনড্ গাড়ি।

মেজদার বেলাতেই বা কম কি?

দেশটা ভাগ হয়ে যাওয়ার কয়েকমাস আগে বাবা টেলিগ্রাম পাঠালো মেজদাকে। তাড়াতাড়ি এসো। মেজদা তখন ফরিদপুরের গাঁয়ে গাঁয়ে সরকারী রাজস্ব আদায় করে। কয়েকটা নদী পেরিয়ে মেজদা ভাঙা সাইকেলে কাদা পায়ে এসে হাজির। বাবা বলল, এখানে সই করো। এই চাকরিটা তোমার হওয়া উচিত। কালই লাস্ট ডেট। কলকাতায় গিয়ে নিজের হাতে জমা দিয়ে এসো অ্যাপলিকেশন। আমি হকসাহেবকে বলবো।

হকসাহেব সব শুনে বললেন, আমি তো আর ক্ষমতায় নাই মতিবাবু। তবু আমি বলে দেখি।

কাজটা হয়েছিল মেজদার। ঠিক চল্লিশ বছরের তফাতে তাঁর ছেলে নিউইয়র্ক থেকে প্যারিসের কাছে চার্লস দ্যগল এয়ারপোর্টে উড়ে এল—বাবাকে রিসিভ করতে। মেজদা মেজবউদিকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে।

বড়দার সাইকেলখানা ছিল মাসে ন'টাকার কিস্তিতে কেনা নতুন রাজ হইট ওয়ার্থ। মেজদার-খানা ছিল সেকেণ্ড হ্যাণ্ড। ভাঙা। মেকারের নাম মুছে গেছে।

স্বাধীনতা টের পেলাম দিন পনেরোর ভেতর। মাস্টার, উকিল, ডাক্তার, পেশকার—সবাই ওপারে চলে যাচ্ছে। আমাদের ক্লাস টিচার এলেন এন ডবলু এফ পি থেকে। স্কুলের পর তিনি বাজারে যান বিকেলে। পায়ে বুট। গায়ে পাজামা পাঞ্জাবি। বাজার থেকে ফেরেন হাতে মুরগি ঝুলিয়ে।

আমরা যখন কলকাতার ট্রেনে উঠলাম—তখনো কোথাও কোন বড় রায়ট হয়নি। ট্রেনের জন্যে প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা মানুষজনের জিনিস-পত্তর বা আত্মীয়স্বজন তুলে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়নি তখনো। ট্রেন যায় আসে। পাসপোর্ট ভিসা তখনো তিন বছর দূরে।

আমরা যেন কলকাতায় বেড়াতে যাচ্ছি। আবার ফিরে আসবো। ফিরে এসেছিলাম। তবে পঁচিশ বছর পরে। ইণ্ডিয়ান আর্মির ট্যাংকের পেছনে জিপ গাড়িতে বসে। ওয়ার নভেল ভান্দা ভাসিলিয়া ভাস্কার দি রেইনবো উপন্যাসে অ্যাড-ভান্স রাশিয়ান ট্যাংক যেমন ককেসাসে ফিরে এসেছিল। পিছু হটা জার্মান আর্মিকে তাড়া করে। সেকথা অন্যসময়। ক্রমশঃ

শ্রীকান্ত সিনকর

বম্বে দাদার টি.টি.র কাছে পার্শী কলোনির একটি দোতলা বাড়ি 'ওয়াড়িয়া হাউস'-এ থাকেন ডাক্তার আর্দেশীর সোনাওয়ালা। ১৯৮২-র ৪ সেপ্টেম্বর। পরের দিন ভোরে ডাক্তার আমেরিকা রওনা হচ্ছেন। রাত থেকেই বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্খীর ভিড় বাড়িতে। ডাক্তারকে বিদায় জানাতেই এসেছেন তাঁরা।

ডাক্তারের এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর কথা ভোর চারটেয়। তাঁর গাড়িতে অত লোকের জায়গা হবে না বলে রাত থাকতেই পরিচারক রামুকে পাঠানো হলো একটা ট্যাকসি ডেকে আনতে। রামু জানতো, এই সময়ে পার্শী কলোনিতে ট্যাকসি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তাই সে কিছুদূরের খোদাদ সার্কেল থেকে ট্যাকসি ডেকে আনবে ঠিক করলো।

ওয়াড়িয়া হাউসের কম্পাউণ্ড পার হয়ে ফটক, অর্থাৎ সদর দরজা। ফটক খুললেই ফুটপাথ। ফুটপাথে পা বাড়িয়েই রামুর চোখ আটকে গেল সামনে, তার ঠিক পায়ের সামনেই এক মহিলার দেহ।

রামু ঝুঁকে পড়ে দেখবার চেষ্টা করল দেহটিকে। ঘুমোচ্ছে না কি। কিন্তু চকিতে শিউরে উঠলো। এ তো মারা গেছে! চিৎকার করে সে ডাকলো তার মনিবকে। ইতিমধ্যে লোকজন জড়ো হয়ে গেছে।

নিচের তলার পার্শীফ্যামিলিটিও এসে পড়েছেন। ডাক্তার পোষাক-টোষাক পরে রেডি হয়েছিলেন, সেই অবস্থাতেই নেমে এলেন। মহিলার দেহ পরীক্ষা করলেন। মহিলাটি সত্যিই মারা গেছেন।

ডাক্তারের আত্মীয়স্বজন শুভাকাঙ্খীদের মন খারাপ হয়ে গেল কিছুটা। দেশ ছেড়ে বিদেশে রওনা হচ্ছেন, এ সময় একি অশুভ লক্ষণ! যাই হোক, ডাক্তার মি. খাম্বাটা নামে তার এক প্রতিবেশীকে পুলিশে ফোন করে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। নিজে আর এ কাজটা করতে চাইলেন না,

(৬৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শারজা ঃ ক্রিকেটের মরুদ্যান

শারজা থেকে দীপক মিত্র

ছবি : প্রদীপ মান্ধানী
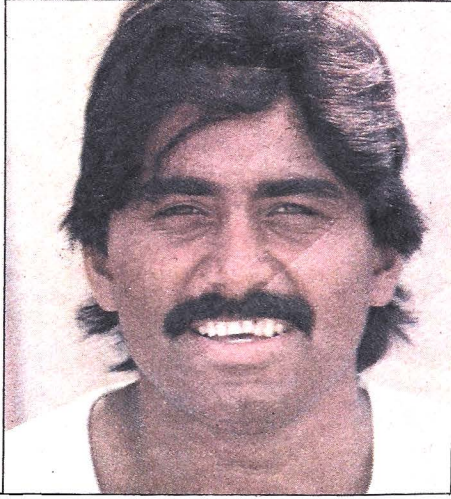
জাভেদ মিয়াঁদাদ : যিনি পাকিস্তানকে জেতালেন

পারস্য উপসাগর আর ওমান উপসাগরের সংযোগস্থলে যেখানে আরব উপদ্বীপ গণ্ডারের তীক্ষ্ণ নাসার মত খড়গ উঁচিয়ে রয়েছে ইরানের দিকে, তারই এক ধার ঘেঁষে উপকূলের দেশ, মরুভূমির দেশ, সংযুক্ত আরব আমীরশাহী। আটজন আমীরের সংযুক্ত আমীরি সাম্রাজ্য। শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহান, শেখ রসিদ বিন সয়ীদ আল মাখতুম, আমীর ওমরাহদের নামের এই অপরিচিতি কাটিয়ে যে স্থান নামটির সঙ্গে হাল আমলে সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত, তা হ'ল দুবাই, সংযুক্ত আরব আমীরশাহীর সঙ্গে বিশ্ববাজারের প্রখ্যাত যোগাযোগকেন্দ্র, এবং সেই সূত্রে আন্তর্জাতিক চোরাচালানের এক কুখ্যাত পৃষ্ঠভূমিও।

আরব আমীরশাহী আরব জাহানের অন্যান্য দেশগুলির মত তৈলসম্পদে অতটা ধনী নয় ঠিকই কিন্তু অর্থসম্পদে তারও কোন ঘাটতি নেই। আর কয়েকদশক আগেও যে মরুভূমির রাজ্যের পরিচিত দৃশ্য ছিল উটের পাল, ভেড়া, খেজুরগাছ আর দলে দলে যাযাবর পশুপালক, সেখানে আজ আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের কিস্‌সার আদলেই গড়ে উঠেছে শহর, যার অনেকগুলিই পাশ্চাত্যের কোনও শহরের স্কাইলাইনকে মনে করিয়ে দেয়।

ইমরান খান

ট্রফি নিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা পাকিস্তানী খেলোয়াড়রা

পাকিস্তানী সমর্থকদের উল্লাস

কমবেশী তিনলক্ষ জনসংখ্যার দেশ আরব আমীরশাহীর আবু ধাবি, দুবাই, শারজা, রাস আল খাইমা শহরগুলিতে এখন প্রতি মুহূর্তে চোখে পড়বে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিচিত্র মুখ, ঝকঝকে রাস্তা ঘাটে রোলস রয়েস আর মার্সিদাজের মসৃণ প্রবাহ, চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্যের আস্তানা এক একটি বিলাস সামগ্রীতে উপছে পড়া ডিপার্টমেন্টাল শপ, যা সর্বাধুনিক জাপানী ইলেকট্রনিক সাজসরঞ্জাম, প্যারিসের একান্ত হালফ্যাসানের পোষাকআশাক, মার্কিন খাদ্য সামগ্রী এমনকি ভারতীয় সিল্ক আর

দুর্লভ সব হস্তশিল্প সামগ্রীতে ঠাসা।

আরব আমীরশাহীর মুখ্য ভূমিকা সমগ্র আরব সাম্রাজ্যের বিদেশের পণ্য প্রবাহের নিরন্তর যোগানদানের। শারজাও এমনই একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। দুবাই থেকে মাইল চারেক দূরে মরুভূমির বালুকা রাশির মাঝখানে ঐশ্বর্যময় এক আধুনিক মরুদ্যান।

সত্তরের দশক থেকেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে নাবোস্তিন্ন জীবিকার বাজারে সমবেত হতে শুরু করেছিল অসংখ্য কুশলী, অর্ধকুশলী আর অকুশলী মানুষজন। আরব আমীরশাহীও তার ব্যতিক্রম নয়। শারজার পথে ঘাটে হাটে বাজারেও তাই আজ চোখে পড়বে অনেক পরিচিত মুখ, ভারতীয়, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী, সিলোনী, থাই, ফিলিপিনো। চলতে ফিরতে যে কেউই শুনতে পাবেন বিচিত্র কলকাকলি, 'নমস্কার', 'আসসালায় আলেয়কুম', 'সৎ শ্রী আকাল', 'সোয়াদি ক্কাপ্', 'মাশ্ আল খের্' আরও অজস্র জানা-অজানা বাক্যবন্ধ।

এই শারজা এখন বিশ্বের প্রচারমহলে আর একটি কারণেও বিখ্যাত হয়ে গেছে। তা হ'ল ক্রিকেট। যীশুখ্রীষ্ট তথা আরব পরিচিতিতে ঈশা মসীহ্র কথানুসারে সুঁচের ভেতর দিয়ে উট গলে যাওয়াও হয়তো সম্ভব ছিল কিন্তু আরব আমীরশাহীর ধু ধু বালুকাভূমিতে যে ক্রিকেট খেলা হবে এটা বোধহয় ঈশা মসীহ্রও ধারণাতীত ছিল। কিন্তু আজ ১৯৮৬ তে এটাই নিতান্ত বাস্তব। সম্প্রতি শারজায় অনুষ্ঠিত অস্ট্রালেশিয় কাপের

(৭১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কপিল দেব : বিতর্কিত অধিনায়কত্ব
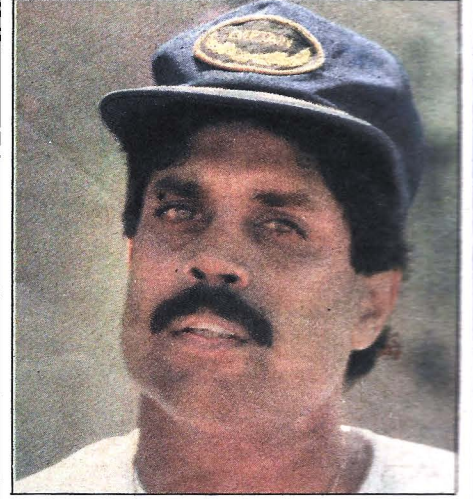
শারজা এখন বিশ্বের প্রচারমহলে আর একটি কারণেও বিখ্যাত হয়ে গেছে। তা হ'ল ক্রিকেট। যীশুখ্রীষ্ট তথা আরব পরিচিতিতে ঈশা মসীহর কথানুসারে সুঁচের ভেতর দিয়ে উট গলে যাওয়াও হয়তো সম্ভব ছিল কিন্তু আরব আমীরশাহীর ধুধু বালুকাভূমিতে যে ক্রিকেট খেলা হবে এটা বোধহয় ঈশা মসীহরও ধারণাতীত ছিল। কিন্তু আজ ১৯৮৬ তে এটাই নিতান্ত বাস্তব।

ভারতীয় দল

আবদুল বুখাতির রেহমানের স্বপ্ন : শারজায় ক্রিকেট

ভারতীয় [illegible]

আনন্দ পান্থ

রমাপ্রসাদ ঘোষাল

বম্বে শহরের মালাবার হিলস্‌। সেখানকার উত্তরপ্রান্তের এক হর্ম্যপ্রাসাদ 'রাজভবনে' দুই সুন্দরী দাসী নানুয়া এবং জুহি এক ৮ বছরের বালকের খোঁজে গলদঘর্ম। এইমাত্র বাগানে দেবদারু গাছের তলায় ছিল। পরনে জরির বেনিয়ান, সার্টিনের কুর্তা আর চুমকি ঘের দেওয়া পায়জামা। তন্ময় টানা দুটি চোখে রাজ্যের স্বপ্ন নিয়ে বসেছিল সৌম্য বালক। যেই একটু আনমনা হয়েছে, অমনি হাওয়া!

কি হবে এবার? একে রাজার ছেলে তায় একমাত্র সন্তান! ভয়ে আশংকায় আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়। সদ্য বর্ষাস্নাত এই আষাঢ়ের ভিজে বাতাসেও জুহি-নানুয়ার শরীর বেয়ে টপটপিয়ে ঘাম ঝরে। হাত-পা অজানা আশংকায় জড়ভরতের মত খিল খেতে থাকে। রাজ সরকারের কোপে এই বুঝি প্রাণ যায়।

হঠাৎ কিশোর কণ্ঠের খিলখিলিয়ে হাসি কানে আসে জুহির। আরে, ওই হবে বুঝি। জুহি দৌড়ে যায় পাশের হাসনুহানা ঝোপের পাশে। নাঃ, কেউ তো কোথাও নেই।

নানুয়া জোর দেয়। এ হাসি অবশ্যই কুমার সাহেবের। সে স্বকর্ণে শুনেছে। আর খুব ভাল করেই চেনে সে কুমার সাহেবের গলা। দিন রাত ওরা দুজনে দেখ্‌ভাল করে, নাওয়ায় খাওয়ায়। তাদের ভুল হবার কথা নয়। দুজনে একসাথে ফের খুঁজতে আরম্ভ করে বালককে।

সেই হাসনুহানার ঝোপের পাশে এক সিমেন্টের বাঁধানো রকে বসে কিশোর যেন উজ্জ্বল মুখে কারও সাথে একমনে কথা বলে যাচ্ছে। জুহি নিশ্চুপে দূর থেকে দেখে বালককে।

খুশিতে ডগমগ কুমার সাহেব। যেন তার অতিপ্রিয় কোন আপনজনের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে, তুমি এত দেরি করে এলে কেন বাবা? তুমি বেশি দেরি করে এলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। কান্না পায় তখন। তুমি যদি আর এরকম দেরি করে আসবে, তাহলে আমি জন্মের মত আড়ি করে দেব তোমার সঙ্গে। কথা বলব না।

দারুণ আশ্চর্য হয়ে যায় ওরা। ভয়ে শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কেউ তো নেই এখানে! তবে কুমারসাহেব কথা বলছেন কার সঙ্গে? পাগল হয়ে গেলেন না তো? সংশয়ের দোলায় এগিয়ে যায় জুহি-নানুয়া। ঝোপের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

বেটা যখন যখন দরকার পড়বে, তখন তখনই আমি আসব। গুরু মহারাজের আদেশ না হলে তো আসতে পারি না। গুরু মহারাজ যেদিন তোমার কাছে আসতে বলেন, তোমার নিজের রাস্তার কথা বলতে পাঠান, সেদিনই আসি। বালকের পাশ থেকে আসা এক ভারী অদৃশ্য কণ্ঠস্বরে ভয়ে জড় করে দেয় জুহি এবং নানুয়াকে। ন যযৌ, ন তস্থৌ অবস্থা। চলৎশক্তিরহিত দাঁড়িয়ে থাকে ওরা।

গুরু মহারাজের কথা বারবার বল তুমি। এর আগে যখন এসেছিলে তখনও বলেছ। কে এই গুরু মহারাজ? থাকেন কোথায়?—জ্ঞানান্বেষী কৌতূহলী বালক পর পর প্রশ্ন করে।

গুরু মহারাজ হলেন সদগুরু মহারাজ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং, ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌। বিশ্ব চরাচরে সর্বত্রই তিনি। তিনি অনাদি পুরুষ বেটা। বড় বড় লম্বা পিঙ্গল জটাজাল। কপালে চাঁদের টীপ। পরণে বাঘছাল, হাতে ত্রিশূল, সে এক পরমপ্রিয় অমৃতমূর্তি বেটা। অযুত ভালবাসা তার কাছে। তাকে দেখা, কাছে পাওয়াই জীবনে সবচেয়ে বড় কাজের কাজ।

তিনি ভগবান শংকরজী। সব দেবতার পুরানো দেবতা দেবাদিদেব মহেশ্বর। থাকেন হিমালয়ের

কৈলাস শিখরে তুমি তাঁর কাছ থেকে এসেছো। তাঁর অতিপ্রিয় তুমি। তাঁর কাজের জন্য তোমাকে কাছে যেতে হবে বেটা।

কবে যাব ? কখন যাব ? কার সঙ্গে যাব ? আনন্দের আতিশয্যে বালক হই হই করে উঠে। কে নিয়ে যাবে, তুমি ? পূজায় তো মন্ত্র পড়তে হয়। তাহলে শংকর ভগবানের কাছে যেতেও মন্ত্র জানতে হবে ? তুমি শিখিয়ে দেবে সেই মন্ত্র ?

বালকের অতি আগ্রহে হাসেন অদৃশ্য পুরুষ। সময় হলেই সদ গুরুমহারাজের কাছে যাবে বেটা। তার রাস্তা বড় কঠিন। লোভ পাপের বাঘ বসে সেই জঙ্গলের পথে। গুরু মহারাজের সিঁড়ি পাহারা দিচ্ছে অমা স্বয়ং। এক কাল ভয়ংকর যুবতী। দুষ্কর সেই অমাকে পার হতে বড় জবর সাধনার দরকার। উস লোকসে আয়া তুম বেটা। সময় হলেই সে সাধনার মন্ত্র শেখাবার মস্ত বড় মানুষ আসবেন তোমার কাছে।

তিনি গুরু। সদগুরু মহারাজ মাতৃগর্ভে থাকার সময় ৭ মাস বয়সে মুক্তির বীজমন্ত্র দিয়ে গেছেন। গুপ্ত রূপে আছে তা। গুরু এসে উদ্ধার করবেন সেই মন্ত্র। তাতে জপেই তুমি শংকর ভগবানের দর্শন পাবে। আমি দেওয়ার কেউ নই বব

নাছোড়বান্দা বালকের মন বদলাতে অদৃশ্য পুরুষ ঝোলা থেকে বের করেন একটি ফল এই নাও বেটা, সদগুরু মহারাজের প্রসাদ পার্সিমন ফল এটি। নাও খেয়ে নাও।—বালকের হাতে ফল দেন তিনি।

নিদারুণ ত্রাসে দৌড়ে পালায় জুহি ও নানুয়া। একি ভুতুড়ে কাণ্ডরে বাবা ! কেউ কোথাও নেই, অথচ গলা পাওয়া যাচ্ছে। কারও দেখা নেই, তবু উটকো ফল এসে পড়ছে কুমার সাহেবের হাতে। এ নিশ্চয় কোন অপদেবতার কাণ্ড। ভূত-প্রেত হবে বা। ফলটল দিয়ে শেষে হয়ত বা ঘাড় মটকে খাবে।

উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে একেবারে রানীমার কাছে এসে থামে জুহি নানুয়া। রানীমা তখন সবে শিব পূজা সেরে উঠেছেন। ওদের ভয়ে ফ্যাকাশে ও চোখ ঠিকরে বের হওয়া মুখ দেখে চমকে ওঠেন তিনি।—কি রে, এমন করছিস কেন ? কি হয়েছে তোদের ?

ভূত, রানীমা ভূত। সমস্বরে কথা বলে ওঠে দুজনে।

ভূত ! সে আবার কি ?

সত্যি ভূত ! জ্যান্ত ভূত !

সত্যি, জ্যান্ত কি বলছিস যা তা ? ভূত আবার কোথায় দেখলি ?

কুমার সাহেবের কাছে।

তার মানে ? আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন রানীমা।

বাগানে বসে আছেন কুমার সাহেব। কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। অথচ পাশে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ভারি গলার একটা পুরুষালি কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। নির্ঘাত ভূত ! ভূতটা আবার কুমার সাহেবকে ফল খেতে দিয়েছে। আমরা নিজের চোখে দেখে আসছি।

আশংকায় থরথরিয়ে কেঁপে ওঠেন রানী-সাহেবা। জুহি নানুয়াকে নিয়ে দ্রুত চলে যান বাগানের দিকে। সেখানে বালক তখন একা বসে। চলে গেছেন তার পরম প্রিয় অদৃশ্য সাধু। পার্সিমন ফলও খাওয়া হয়ে গেছে ততক্ষণে। মা এসে কোলে তুলে নেন বালককে। গায়ে মাথায় হাত বোলান। মনে মনে অপদেবতা তাড়াতে পূজার কথা ভাবেন।

বালক তবু কথা ভাঙে না কোনমতে। সে বোঝে, জুহি-নানুয়া দারুণ ভয় পেয়েছে। মাও বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন। বালক তবু চুপচাপ। তার প্রিয় এই গেরুয়াধারী সাধুবাবা বলেছেন আমি গুপ্তরূপে তোমার কাছে আসব বেটা। শংকর ভগবানের কথা বলব। কিন্তু আমার আসার কথা তুমি কাউকে যেন বলে দিও না।

কিছুতেই বলে না বালক। এ এক প্রিয় খেলা তার। সাধুবাবাবাকে সে দেখতে পাচ্ছে। আর কেউ পাচ্ছে না। সাধুবাবা তাকে এত ভালবাসে। আর এরা তার জন্য ভয়েই সারা। বেশ মজার খেলা তো। মনে মনে কৌতুক বোধ করে কুমার। এসব সাধুবাবাকে বলে হাসে।

কয়েকদিন বাদে বাড়িতে এক পারসিক ফকির সাধু আসে। কুমার সকলকে এড়িয়ে একা পেতেই দৌড়ে সেই সাধুর কাছে চলে যায় সে।—এই কাপড় কিনেছ কোথায় কত দাম ?

গেরুয়া তার বড় আদরের পোষাক। রাজ-ভবনের কেউ তো তাকে গেরুয়া পরতে দেয় না। দেয় দামি দামি চুমকি-বসান সার্টিনের কাপড় চোপড় অথচ সেই অদৃশ্য সাধুবাবা এমনি গেরুয়াবাস পরেন। রায়গড়ে আসা মোক্ষদা বাবাও পরতেন। মা বাদে এই দুজনই তার ভালবাসার জন। দুজনেই খুব ভাল। তাই বালক ধরে নেয়, ভাল মানুষই এই মহার্ঘ্য বস্ত্র পরে। তার দারুণ সখ হয় পরতে।

কোথা থেকে কিনেছ পোষাক ?

ভাই কিলা থেকে।

ভাই কিলা কোথায় ?

কেন, বাজারে।

কত দাম ?

বার টাকা করে।

আমাকে কিনে এনে দেবে ? আমি পরব।

টাকা দিলেই কিনে এনে দেব।

বালকের কাছে সদা সর্বদা জলপানির জন্য বিশ ত্রিশ টাকা থাকত। খুশি চকচক চোখ মুখে সে পকেট থেকে ১২ টাকা বের করে দেয়। কত-দিনের সাধ; যদি মিটে যায়। কিনেই কিন্তু ওই জানালা দিয়ে গলিয়ে দিয়ে যেও। কেউ টের পাবে না। তোমাকে ৫ টাকা বকশিস দেব।

ফকির গেরুয়া কিনে আনতে চলে যায়। কুমারের বড় আজব লাগে এই পার্শী ফকিরকে। বাড়িতে ধুনি জ্বেলে তাতে এই সাধু যেন কি কি জিনিসের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছিল। দাউ দাউ জ্বলে ওঠা আগুনে গুঁড়োগুলো পড়ে লাল, নীল, কাল, রঙবেরঙের রোশনি ফুটে উঠছিল। আর সাধু চিৎকার করে আঙুল বাড়িয়ে বলছিল দেখো, দেখো, ধুনিকা আগমে দেওতা প্রকট হোতা হ্যায়। এ অলগ অলগ রঙা দেওতা কী হোতা হ্যায়।

ঘন্টা খানেকের মধ্যেই বলে দেওয়া জানলার কাছে পৌঁছে যায় পার্শী সাধু। হাতে তার গেরুয়া কাপড়ের প্যাকেট। আরও ৫ টাকা বকশিস দিয়ে কুমার কাপড় নেয়। টাকা হাতে পেতে দ্রুত পালিয়ে যায় সাধু।

অসীম আগ্রহে দ্রুত প্যাকেট খুলে গেরুয়া কাপড় পরে ফেলে বালক। পরিতৃপ্তিতে তার কিশোরমন যেন থইথই করে ওঠে। আনন্দের চোটে সেই গেরুয়া পরে দু'পাক নেচে ফেলে কুমার। এখন তার কাছে মহামূল্যবান জরির কাপড় তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে গেছে।

কিন্তু মুহূর্তেই তার সব আনন্দ বেদনায় পর্যবসিত হয়। জুহি আচমকা দেখে ফেলেছিল এই গেরুয়াবাসে। নিমেষে খবর পৌঁছে যায় মায়ের কাছে। মা এসে পেটাই লাগান বাছাকে জীবনে সেই প্রথম পিটুনি খাওয়া।

মায়ের অভিমান অনাদর বালককে আহত করে। মন খারাপ নিয়ে সে একা চলে যায় সেই হাসনুহানা ঝোপের পাশে। বসে বসে অদৃশ্য বাবার কথা ভাবতে থাকে।

হঠাৎ চতুর্দিক মনোরম গন্ধে ভরে যায় মৃগনাভি কস্তুরীয় সৌরভে ম ম করে ওঠে চারপাশ। এদিক ওদিক তাকায় কুমার। না এখনও তো হাসনুহানা ফোটার সময় হয়নি, তবে গন্ধ কিসের ?

বাচ্চে ! সেই মিঠে ডাক।

দ্রুত মুখ ঘোরায় কুমার। হাত দুয়েক দূরেই সাধুবাবা। নিমেষে সব দুঃখ দূর হয়ে যায় কুমারের আকর্ণ হাসিতে ভরে যায় মুখ এসেছ ? বাবা, তুমি তো জান না, তোমার মত কাপড় পরেছিলাম বলে মা কত মেরেছেন !

আমি সব জানি বেটা। মা মহীয়সী। মায়ের মার হল আদর। তাই মা মারলে দুঃখ করতে নেই। তুমি একদম দুঃখ করবে না। দ্যাখ, আজ আমি তোমায় ভগবান শংকরজীকে ডাকার মন্ত্র শিখিয়ে দেব। নিবেদন মন্ত্র।

ওঁ গলিত তিমির মাল শুভ্রতেজ প্রকাশ
ধবল কমল শোভ জ্ঞান পূজ্য অট্টহাস
যমিজনো হৃদিগম্য নিস্কলো ধ্যায়মান
প্রণতমবতু সা মানস রাজহংস ॥
দূরিত দলল দক্ষঃ দক্ষাজা দত্ত দোষম
কলিত কলি কলংকম কম্রকলহার কান্তম
পরহিতকরণায় প্রাণ প্রচ্ছেদ প্রীতম।
নত নয়ন নিযুক্তম নীলকণ্ঠ নমাম ॥

বালকের কাছে এ এক অন্য জগতের আস্বাদ পরমপ্রিয় জনের কাছে কথা বলার ভাষা পেয়েছে সে। এর চাইতে সুখের আর কি হতে পারে ! দিন রাত্রি জপ। সোনার চাঁদিতে জল অর্পন, তর্পণ এবং ব্রত পালন। সামনের শিবচতুর্দশী ব্রত পালনের আশায় বালকের কচি কাঁচা মন এখন সেই প্রতীক্ষায় নিবিড়।

ক্রমশ

আপনি কি নতুন বেস্টো ব্যবহার ক'রে দেখেছেন?

তিনটি অতুলনীয় বিশেষ গুণ! দামও কত কম!

মাত্র ৭ টাকা ৬৫ পয়সা, প্রতি কিলো। স্থানীয় কর আলাদা।

১। নতুন ফর্মূলা-র বেস্টো। এ দিয়ে যতবারই কাচবেন — আরো ধবধবে, আরো ঝলমলে কাপড় দেখবেন। অবাককরা এই ডিটারজেণ্ট পাউডার—যেকোনো কাপড়ের পক্ষেই আদর্শ!

২। নতুন ফর্মূলা-র বেস্টো। এতে ক্ষতিকারক সোডার কোনো চিহ্ই নেই। তাই, এর গোলা জলে সাধারণ পাউডারের মত সেই হড়হড়ে ভাব নেই। ফলে, কাপড় ধোয়াও কত সুবিধা!

৩। নতুন ফর্মূলা-র বেস্টো। এ হ'ল একমাত্র ডিটারজেণ্ট পাউডার, যাতে আছে বিশিষ্ট 'আলফাওলেফিন', যা আপনার হাতকে রাখে একেবারে নরম ও মোলায়েম।

আর হ্যাঁ, আপনার ওয়াশিং মেশিনের জন্যেও তো বেস্টো-র তুলনা নেই। বেস্টো– আপনার কাপড়, হাত আর পয়সার সুরক্ষক!

পছন্দসই দামে মনের মতো ধবধবে সাদা আর সুরক্ষিত হাতের জন্যে

গোদরেজ-এর উৎপাদন

CHAITRA-B-G-391 BEN

৪৩ পৃষ্ঠার পর)

"আমি বিশ্বাস করি বিভিন্ন রূপে প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর পর জন্ম নেন। এ জীবনে তাঁর সুখ-দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হয় পূর্বজন্মের কৃতকর্মের দ্বারা। অবশ্য উদ্যোগের দ্বারা এর কিছু হেরফের ঘটানোও যায়। একেই কর্মযোগ বলা হয়। এর দ্বারা জীবন্তরও পাল্টে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পশুজীবন মনুষ্য জীবনে, বা মনুষ্যজীবনের পশুজীবনে 'উত্তরণ-অবতরণ' ঘটতে পারে। যখন এই আবর্তন শেষ হয়, তখনই ঘটে নির্বাণ। বৌদ্ধত্ব হ'ল নির্বাণের পথে অন্তিম ধাপ।" অবতার তিনিই, যিনি নির্বাণের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে সিদ্ধির শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন। তিনি অন্যান্যদের নির্বাণে সহায়তা করতে পুনর্জন্ম নেন বার বার।

সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত বোধিসত্ত্ব তাই বার বার জন্ম নেন অন্যান্যদের সহায়তা করতে। নিজস্ব কোন তৃপ্তির জন্য পুনর্জন্মের প্রয়োজন হয় না। তাই নির্বাণের জন্যেও নিজস্ব অস্তিত্ব তাঁরা পরিত্যাগ করেন না। এর সঙ্গে একমাত্র চাঁদেরই উপমা চলে। জলাশয় এবং সাগরের শান্তজলে চাঁদের ছবি দেখা যায় পৃথিবীতে। কিন্তু চাঁদ থাকে আকাশেই। এইভাবে অবতার বুদ্ধ বিভিন্ন শরীরে অবস্থান করতে পারেন। অবতারগণ ইচ্ছা শক্তির বলে পুনর্জন্মের স্থান এবং সময় বিষয়ে নিজস্ব প্রভাব খাটাতে পারেন। শুধু তাই নয় ... জন্মান্তরের স্মৃতিও অবিনশ্বর। ফলতঃ ... তাঁকে চিনতে পারেন।

তিব্বতী বৌদ্ধ পুনর্জন্মের এই ধারণা ... আশ্চর্য্যজনক নয়, তার কারণ, হিন্দুধর্ম ... যাবতীয় ধর্মে এই মতবাদ গ্রহণীয়। তিব্বতীদের বিশ্বাস মহান আত্মারা নশ্বর শরীর ছাড়ার ... আগামী জন্ম সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দিয়ে যান। এই ইঙ্গিতই নতুন গুরুর সন্ধানের দিশারী

১৯৫৯ সালে তিব্বতে চীনা আক্রমণের পর তিব্বতীরা যখন হিমাচলের শীতল স্থানগুলি ধর্মশালা, সিমলা, মানালি, ডালহৌসির মতো জায়গায় এসে বসবাস শুরু করে, তখন তিব্বতীদের ধর্মগুরু দলাই লামা (চতুর্দশ) ধর্মশালায় তাঁর মূল কার্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর সঙ্গে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম য়ুন-জি-শিনজা-রিনপোচে তিনিই দলাই লামার গুরু। দলাই লামার পাঁচ বছর বয়স থেকে এই শিন-জা-রিনপোচে তাঁকে সার্বিক শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। তিনি দলাই লামার সঙ্গে বিয়াল্লিশ বছর ছিলেন। প্রতিদিন তাকে দর্শনের পরই দলাই লামা কাজ শুরু করতেন ১৯৮১ সালের প্রথম সপ্তাহে সিনজা রিনপোচের শরীর খারাপ হতে থাকলো। ডাক্তার তাঁকে দিল্লি

দলাই লামার আবির্ভাবের পূর্বাভাষ

দলাই লামা তিব্বতের তথা বিশ্বের হীনযান বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রধান। আজ পর্যন্ত মোট ১৪ জন দলাই লামার অবির্ভাব ঘটেছে। ১৩৯১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম দলাই লামা আবির্ভূত হন। তাঁকে বুদ্ধদেবের অবতার বলে মানা হয়। অবির্ভাবের ক্রম-তালিকা অনুসারে এরপর ১৪৭৫ সালে দ্বিতীয়, ১৫৪৩ সালে তৃতীয়, ১৫৪৭ সালে চতুর্থ, ১৬১৭ সালে পঞ্চম, ১৬৮৩ সালে ষষ্ঠ, ১৭০৭ সালে সপ্তম, ১৭৫৪ সালে অষ্টম, ১৮০৫ সালে নবম, ১৮১৬ সালে দশম, ১৮৩৮ সালে একাদশ, ১৮৫৬তে দ্বাদশ, ১৮৭৬ সালে ত্রয়োদশ এবং ১৯৩৫ সালে চতুর্দশ লামা নির্বাচিত হন। বর্তমান দলাই লামা এই ক্রমে পঞ্চদশ অবতারপুরুষ।

দলাই লামার মৃত্যুর পর যতদিন না কোন নতুন অবতার জন্মগ্রহণ করেন ততদিন রাষ্ট্রীয় সভার ঘোষণা দ্বারা তৈরি এক অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষমতা সভার কাজ চালায়। পরে নতুন অবতার কোথায় জন্মেছেন তার খোঁজ খবর করার জন্যে প্রচলিত পদ্ধতি এবং নিয়ম অনুযায়ী বিজ্ঞ লামাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করা হয়।

তিব্বতের রাজধানী লাসার দক্ষিণ পূর্বে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে ছুখুরগিয়াল নামক স্থানের লামে লাৎসো নামের একটি পুকুরে নতুন অবতারের অবির্ভাবের আভাস পাওয়া যায়। তিব্বতের লোকদের প্রচলিত বিশ্বাস যে বিশেষ বিশেষ পুকুরের জলে ভবিষ্যতের ছায়া দেখা যায়। লামে লাৎসে নামের পুকুরটি এ বিষয়ে সর্বাধিক বিখ্যাত। এই পুকুরটিতে অবতারের অবির্ভাব-সূচনা কখনো আক্ষরিক ইঙ্গিতে, কখনো স্থানিক প্রতিভাস রূপে আবার কখনো বা ভবিষ্যৎ ঘটনার সম্ভাব্য চিত্রভাস রূপে দেখা দেয়। প্রধান লামাগণ এবং বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চপদাধিকারীগণ এই পূর্বাভাস গোপনে অবলোকন করে ভবিষ্যৎ অবতারের সন্ধানে প্রয়াসী হন। এভাবেই এক রহস্যময় সন্ধান-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হন হীনযান বৌদ্ধধর্মজগতের প্রধানতম ব্যক্তিত্ব, অবলোকিতেশ্বরের অবতারপুরুষ দলাই লামা।

ইয়ংজিন লিং রিনপোচে

ইয়ংজিন লিং রিনপোচে হলেন তিব্বতীয় বৌদ্ধ-ধর্মের গেলুগ মতবাদের প্রধান এবং দলাই লামার প্রধান শিক্ষক। তিনি তিব্বতের ইয়াবখু গ্রামে ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন কুংগা শেরিং, মা সোনাম দেকি।

১৯১২ সালে তিনি লাসার রেপুং মঠের লোজেলিং মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। যে সব শিক্ষকদের কাছে তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হলেন তেনপা চোজিন, এবং লোবসাং সামটেন। গাণ্ডেন ট্রিপার ঘা গাণ্ডেন মঠের প্রধান হিসেবে গেলুব স্কুলে তিনি তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দিতেন। ১৯৪২ সালে তিনি দলাই লামার শিক্ষক নিযুক্ত হন।

১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে ইয়ংজিন চীন অধিকৃত তিব্বত থেকে পালিয়ে এসে ভারতে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তখন থেকেই তিনি হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায়। ১৯৬৮ এবং ১৯৮০ সালে ইয়ংজিন উৎসাহী বৌদ্ধ ছাত্রদের আমন্ত্রণে-ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, এবং কানাডায় শিক্ষক হিসেবে ভ্রমণ করেন এবং বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বগুলির ব্যাখা দেন।

তিব্বতী বৌদ্ধ পুনর্জন্মের এই ধারণা মোটেই আশ্চর্য্যজনক নয়, তার কারণ, হিন্দুধর্ম উদ্ভুত যাবতীয় ধর্মে এই মতবাদ গ্রহণীয়। তিব্বতীদের বিশ্বাস মহান আত্মারা নশ্বর শরীর ছাড়ার আগে আগামী জন্ম সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দিয়ে যান। এই ইঙ্গিতই নতুন গুরুর সন্ধানের দিশারী।

শাক্য দাগ্‌ত্রি রিনপোচে

তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের শাক্য শাখার প্রধান, শাক্য দাগত্রি রিনপোচে ১৯৪৫ সালের ৭ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। কুংগা রিনচেন তাঁর পিতা। ম ছিলেন সোনাম ডোলকা।

১৯৫৯ সালে তিনি শাক্য মঠের একচল্লিশতম প্রধান ধর্মগুরু হন। ১৯৫৯ সালে লাসাতে চীনা কম্যুনিস্টদের অভ্যুত্থানের জন্য তিনি ভারতে পালিয়ে আসেন।

তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়-১৯৭৭ সালে। তাঁর লেখা অনেকগুলি স্তোত্রও আছে। শাক্য দাগত্রির বিদেশে শিক্ষাদান রীতিমত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৭৪ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ব্যাপকভাবে সুইজারল্যান্ড, ব্রিটেন, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেন। এরপর ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি ব্যাপকভাবে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, হল্যান্ড, আস্ট্রিয়া, ইতালি এবং ফ্রান্সে ভ্রমণ ও প্রচারকার্য চালান।

গিয়ালওয়া করমপা

তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের কার্গু মতবাদের প্রধান ষোড়শ গালোয়া করমপা জন্মেছিলেন ১৯২৪ সালে। বাবা সেওয়াং ফুন্টসোক এবং মা গামখের কেশাং ছোড্রন। ৎসুরফু মঠের প্রধান হিসেবে তিনি ক্ষমতাভার নেনে পঞ্চদশ গালোয়া করমপার লিখিত আদেশ অনুযায়ী। কথিত আছে ছেলেবেলা থেকেই তিনি অসাধারণ শক্তির অধিকারী।

১৯৫৯ সালে তিব্বতী অভ্যুত্থানের সময় তিনি ভারতে পালিয়ে আসেন। ১৯৬২ সালে সিকিমের রাজ পরিবারের আমন্ত্রণে গ্যাংটকে রুমটেক মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে তিনি আমৃত্যু প্রধানরূপে অবস্থান করে গেছেন। ১৯৮১ সালের ৫ নভেম্বর তিনি মারা যান।

দুদজোম রিনপোচে

লাসার পূর্বদিকে কোংপোর কাছে–তেংখন গ্রামে দুদজোম রিনপোচের জন্ম। তাঁর বাবার নাম ছিল জম্পেল নোরবু ওয়ংগিয়াল। মাত্র তিন বছর বয়সে দুদজোম পূর্বতন দুদজোমের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের ন্যুয়িঙ্গমা শাখার প্রধান এবং পদ্ম-সম্ভবের মহান শিক্ষার এক মহান উত্তরাধিকারী।

১৯৫৯ সালে দুদজোম তিব্বত থেকে পালিয়ে এসে ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। প্রথমে নেপালে, পরে কালিম্পং-এ তিনি আশ্রয় নেন। এরপর পশ্চিমী ছাত্রদের মধ্যে তিনি ব্যাপকভাবে বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন। এখনও তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মশিক্ষক এবং তন্ত্র-দার্শনিক হিসাবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি আছে।

যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। দলাই লামা গুরুর জীবন বাঁচাতে দিল্লি যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। কিন্তু গুরু যেতে চাইলেন না। শিষ্যদের একান্তে বললেন, তিনি শরীর ত্যাগ করতে চান। তিনি আরও বললেন তার পুনর্জন্ম মৃত্যুর এক বছর পরে হবে। কিন্তু সেই পুনর্জন্ম কোথায় হবে সে সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। ১৯৮১ সালের ১৫ই অকটোবর তাঁর দেহান্তর হয়। গুরুর মৃত্যুতে দলাই লামা গভীরভাবে শোকাহত হন। গুরু নির্দেশ দেন তাঁর দেহ যথাসত্বর সৎকার করতে। এরপর দলাই লামা শুধু ১৫ই অকটোবর ১৯৮২ র প্রতীক্ষায় থাকেন। অবশেষে ১৫ই অকটোবর এলো; দলাই লামা লক্ষ্ণৌ, মুসৌরি, বমডিলা, দার্জিলিং, সিকিম, ডালহৌসি, নেপাল এবং সিমলায় সন্ধানীদল পাঠিয়ে দিলেন, সেই বিশেষ দিনে জাত বালকের খোঁজে। সন্ধানী দল পাঁচশত বাচ্চার এক তালিকা তৈরি করলেন। ১৯৮৩ সালে তাঁরা গুরুর অবতারের খোঁজে বের হন। শেষ পর্যন্ত সোনম তোপগিয়ালের কাছেও তাঁরা এসে পৌঁছান। বালকের ব্যবহারে তাঁরা নিশ্চিত হন। সুনিশ্চিত হবার জন্য এই বিচিত্র বালককে কয়েকটি পরীক্ষা করেন। তাকে দেওয়া অনেকগুলি ছবির ভেতর থেকে বালকটি মাত্র দুটি ছবি বেছে নেয়, ঐ ছবিগুলি ছিল য়ুন-জী-সিনজা রিনপোচে তথা দলাই লামার (চতুর্দশ)। অঙ্গুলি সংকেতে বালক জানায় ঐ চিত্র তাঁরই। দলাই লামার ছবির উপরে বালক আশীর্বাদ করে। সন্ধানী দল বালকের সামনে কয়েকটি করতাল রেখে দেন। বালকটি পূর্ব গুরুর করতাল তুলে বাজাতে শুরু করে। কয়েকটি মালার মধ্য থেকে কেবল মাত্র পূর্বগুরুর বিশেষ মালাটি তুলেই ফেরাতে শুরু করে বালক। এরপর সন্ধানী দল বালকের সামনে কয়েকটি দাঁত রাখে। বালকটি সেই গুরুর দাঁতটি নিয়েই তার নিজের ফাঁকা দাঁতের জায়গায় স্থাপন করেন। পরীক্ষায় সব কিছু মিলে যাবার পর সোনম তোপগিয়াল এবং লোবসাং ডোলমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন সন্ধানী-দলের প্রতিনিধিরা। স্বামী স্ত্রী উত্তরে তাঁদের সেই স্বপ্নের কথা, প্রসবের সময়ে সাদা ফুলের কথা এবং বর্ণোজ্জ্বল ইন্দ্রধনু'র কথা বললেন। সব কথা শোনার পর সন্ধানীদল ডালহৌসিতে লামাদের এক সভা ডেকে সেই বালককে মহান গুরু দলাই-লামা-র গুরু য়ুন-জী শিনজা রিনপোচের অবতার ঘোষণা করলেন। এই অবতার বালকের কথা শুনে ডালহৌসির মানুষজন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। সোনম এবং ডোলমা'র আনন্দের সীমা রইল না। জুন মাসেরদ্বিতীয় সপ্তাহে বালক এবং তার মা-বাবাকে নিয়ে সন্ধানী দলটি প্রধান শাখা ধর্মশালায় যান, সেখানে বালককে দেখতে বিশাল জমায়েত হয়। বালককে দেখে দলাই লামা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, তিনি আশীর্বাদও নেন বালকের কাছ থেকে।

নতুন বালক গুরুকে এরপর রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করে প্রাক্তন গুরুর সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়। প্রাক্তন গুরুর ব্যবহৃত সমস্ত দ্রব্যাদি উক্ত বালককে দেওয়া হয়, তার পরিবারের সবাইকে ধর্মশালায় থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। ইদানিং বালক গুরু ঘন্টার পর ঘন্টা পূজাস্থলে আত্ম-মগ্ন থাকেন। ১৫ই অক্টোবর' ৮৬ বালক গুরুর জন্মদিন অভূতপূর্ব ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। প্রচুর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষেরা আসেন। এই সময় শ্রী পালদেন নরবু গুরুর ম্যানেজার ছিলেন। বালকগুরুর যাবতীয় কাজ দেখাশুনা এখন তিনিই করছেন।

৬৭ পৃষ্ঠার পর

গায়ত্রী দেবী

যতদূর জানা যায়, রাজকীয় বিলাস ছেড়ে ১৯৬০ সালে গায়ত্রী দেবীর রাজনীতির আখড়ায় ঢুকে পড়ার পেছনে বিশেষ কোন আদর্শ বা উদ্দেশ্য ছিল না। কতকটা সখের রাজনীতি করার তাগিদই প্রথমে তাঁকে উৎসাহিত বা প্রভাবিত করেছিল। তবে, সে সময় প্রবল প্রতাপশালী কংগ্রেস পার্টির একটা যোগ্য বিরোধী দল গড়ে উঠুক, এ আশা ১৯৬০-এর কয়েক বছর আগে থেকেই অবশ্য মনে মনে লালনপালন করতো গায়ত্রী দেবী। এবং শেষ পর্যন্ত চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর নেতৃত্বাধীন 'স্বতন্ত্র পার্টি' তে নাম লেখালেন। প্রথমটায় দলের হয়ে নির্বাচনী প্রচার চালান, দলের তহবিলে অর্থ সংগ্রহ, এসবেই বেশি মনোযোগী ছিলেন গায়ত্রী দেবী। সংসদে বসে কোনদিন সক্রিয় রাজনীতি করতে হবে, একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। অথচ রাজাজীর ভাষায় গায়ত্রী দেবী তখন ঝাঁসীর রানী। কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ একটি বিরোধী দল গড়ার নেশায় মশগুল।

১৯৬২ সালে 'স্বতন্ত্র পার্টি' প্রথম নির্বাচনে অংশ নিল। দলীয় সাধারণ সম্পাদক গায়ত্রী দেবীকে জয়পুর সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নির্দেশ দিলেন। কিছুটা অনিচ্ছা, নির্বাচনের ফল কি হয়, একথা ভেবে আশংকিত হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনী প্রচারে নামালেন গায়ত্রী দেবী। বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন গায়ত্রী দেবী। দেখা গেল, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, পরাস্ত কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে

তাঁর ভোটের ব্যবধান এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার। পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনে এত বেশি ভোটের ব্যবধানে কোন প্রার্থীর জয় হবার ঘটনা সেই একবারই ঘটেছে। আর সে কারণেই, গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ আজও জ্বলজ্বল করছে গায়ত্রী দেবীর নাম।

তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির সঙ্গে তাঁর মোলাকাতের শুরুতেই কেনেডি তাঁকে সম্মানিত করলেন এই বলে—আই হিয়ার, ইউ আর দ্য ব্যারি গোল্ডওয়ার্টার অফ ইন্ডিয়া। ভারতীয় সংসদে সে সময় গায়ত্রী দেবীর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। রাজকীয় সম্ভ্রম আর প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক নেত্রীর স্বভাবসুলভ দৃঢ়তা ও উদারতা—এই দুয়ের মনিকাঞ্চন যোগের ফলে গায়ত্রী দেবী তখন হয়ে উঠেছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।

১৯৬২ সালের পর ১৯৬৭ তে ফের সংসদীয় আসনের নির্বাচনে জয়ী হলেন গায়ত্রী দেবী। তারপর আবার নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগে, ১৯৭১-এর সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরানো কংগ্রেসের তথা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সেই বিখ্যাত স্লোগান 'গরীবি হটাও' এর ধাক্কায় এতটুকু বিচলিত না হয়ে অবলীলায় বিজয়ী হলেন তিনি।

আজ, রাজনীতির মঞ্চ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নেবার পর, গায়ত্রী দেবী এবার কি নতুন কোন পথের সন্ধানে? পুলিশ ও ইনটেলিজেন্সের সাম্প্রতিক তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন জয়পুরে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে যাই, তিনি তাতে রাজী হন নি।

'কামতাপুরী' প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ ও যুব কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ গুহর বক্তব্য।

কমল গুহ

প্রদ্যুৎ গুহ

উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয়তম বামপন্থী নেতা ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ ১৫ এপ্রিল থেকে সপ্তাহব্যাপী প্রচারাভিযান সেরে এলেন উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায়। জাতীয় সংহতির মন্ত্রে ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে এই প্রচারাভিযানের মূল প্রতিপক্ষ ছিল উত্তরখণ্ডীদের কামতাপুরী আন্দোলন।

উত্তরখণ্ডী বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী গুহকে যখন কামতাপুরী রাষ্ট্র ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হয়, তখন তিনি বলেন যে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা ও তপসিলীরা তাদের জন্য একটি নিজস্ব রাজ্যের দাবী তুলেছেন, রাষ্ট্র নয়। এরা চাকরীতে নিজস্ব কোটা ও উত্তরবঙ্গে তাদের প্রাধান্য চাইছে। যদিও এই আন্দোলন মূল জনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। তার মতে শতকরা ৯০ জন রাজবংশীই এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন যে গায়ত্রী দেবী এর পেছনে আছেন কিনা সে সম্পর্কে পুলিশকে তদন্ত করতে বলা হয়েছে, আসলে কিছু রাজনৈতিকভাবে হতাশাগ্রস্ত মানুষ বামফ্রন্টের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উসকানি দিয়ে চলেছে। আসাম থেকে আগত কিছু নেতাও রয়েছেন এর পেছনে।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন যুব কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ গুহও। কামতাপুরীর জন্য আন্দোলনের পেছনে কংগ্রেসীরা আছেন এই অভিযোগ জানালে তিনি বলেন, কেউ যদি এটা প্রমাণ করতে পারেন তবে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। তার বক্তব্য হল উত্তরবঙ্গের স্থানীয় আদিবাসীরা বামফ্রন্টের ভাঁওতা ও অপশাসনে তিতিবিরক্ত হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন, অসম গণ পরিষদের মদত এদের পেছনে থাকতে পারে এই অভিযোগের সঙ্গে তিনি একমত হ'লেন। গায়ত্রী দেবীর জড়িয়ে থাকার প্রশ্ন প্রদ্যুৎ সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে বললেন, এসবই বামফ্রন্টের রাজনৈতিক প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক ব্যর্থতার বহিঃপ্রকাশ।

'কামতাপুরী' নামটি কিভাবে এল?

১১৫০ খ্রীস্টাব্দে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপাল বর্তমান গৌহাটির পশ্চিমখণ্ডে রাজত্ব করতেন। ধর্মপালের পর বার ভুঁইয়াদের রাজত্ব কালে মেচ বংশের 'ভূখণ্ড' অধিকারী হাজোর পুত্র বিশু ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে কামরূপের রাজা হন। বিশুর আরাধ্যাদেবী ছিলেন কামরূপ অধিশ্বরী দেবী কামাখ্যা। খান চৌধুরী আমানত উল্লা হাসাহেবের কোচবিহারের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে পাওয়া যায়, ১৪৯০ খৃস্টাব্দে এই বিশুই মহারাজা বিশ্বসিং নাম গ্রহণ করে কোচবিহার প্রদেশের রাজা হয়ে বসেন। ১৪৮৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কোচবিহারের রাজ-রাজধানী ছিল চিকনা। ১৪৯০ খৃস্টাব্দে চিকনা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন কোচবিহারে। এবং নাম দেন কামতাপুরী। দরঙ্গ রাজ বংশাবলী'তে এই কামতাপুরীর কথা উল্লেখিত আছে। আসাম বুরঞ্জীতে অবশ্য এই কমাতা পুরীকে 'কমতা পুরী' বলা হয়েছে। বর্তমান উত্তরখণ্ডী কোচ রাজবংশীরা সে সময়ের ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখে সাধারণ উপজাতিদের উদ্দীপিত করতেই কমতাপুরী বা কামতাপুরী নামটি গ্রহণ করেছেন। যেমন বীর চিলারাই-এর নামে গড়েছেন চিলারাই ট্রাস্ট।

গায়ত্রী দেবী

অপরাজিতা গোপ্পি

নকশালবাদীদের স্রষ্টাও তাত্ত্বিক নেতা চেয়ারম্যান চারু মজুমদার। এই উত্তরবঙ্গে থেকেই তিনি সেদিন কোচ, মেচ, মুণ্ডা, হাড়িয়া, আরো উপজাতিদের সহায়তায় সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নকশালী হত্যার আগুন। আজকের এই উত্তরখণ্ডী গোপন আন্দোলনের জন্মও উত্তরবঙ্গের মাটিতে। সঙ্গে সেদিনের আদিবাসী উপজাতি ও তপশিলীরা। ১৯৮২ সালের এই নকশাল খতমবাহিনীই দ্বিতীয় কেন্দ্রিয় কমিটির নেতৃত্বে নদীয়াতে পাল্টা বিপ্লবী সরকারের জন্ম দিয়েছিল।
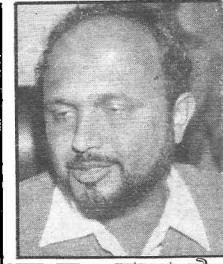
প্রফুল্ল মহন্ত: কামতাপুরীকে মদত দিচ্ছেন?

শিবেন চৌধুরী
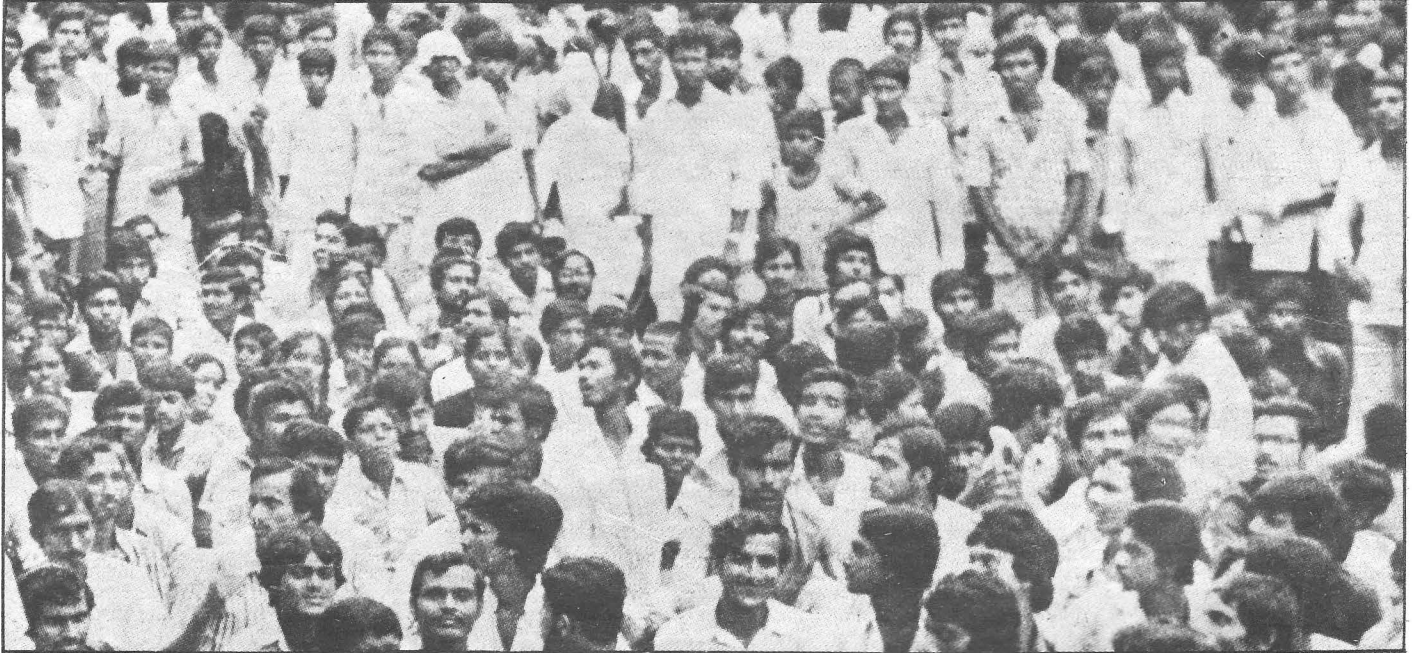
বিহার, শিলিগুড়ি, মালদা ইত্যাদি জেলায় এই সব আদিবাসীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর বিশেষ ভাবে তদন্ত করছে।' দিনহাটায় উত্তরখণ্ডীদের গোপন সমাবেশের গোয়েন্দা রিপোর্টের একটি কপি রমেনবাবু রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে দিয়েছেন।

কামতাপুরীর বিষয়টি তখনই সারা রাজ্যের মানুষকে নাড়া দিয়ে গেল, যখন ১লা এপ্রিল বিধানসভায় বামফ্রন্টের বিধায়ক অপরাজিতা গোপ্পী দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'উত্তরবঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বাদী আন্দোলনের ঝোঁক দেখা দিচ্ছে। সম্প্রতি কোচবিহারে কোচ-রাজবংশী আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত হয়েছে। ওরা উত্তরবঙ্গে একটি স্বশাসিত রাজ্যের দাবী করেছে। এ ব্যাপারে এখনি তদন্ত করা হোক। দেশকে টুকরো টুকরো করার এ চক্রান্ত দেওয়া যায় না।'

উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়িতে কামতাপুরী রাষ্ট্র ঘোষণার খবরে চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ৭০ দশকে এই শিলিগুড়ি থেকে শুরু হয়েছিল রক্তক্ষয়ী নকশালপন্থীদের যাত্রা। নকশালবাড়ি তো এই উত্তরবঙ্গেই। আর নকশালবাড়ি থেকে জন্ম নেওয়া খতম রাজনীতির শ্রদ্ধা শিলিগুড়ি শহরের মানুষ সি.পি. আই(এম.এল)

দার্জিলিং
ভুটান
নেপাল
শিলিগুড়ি
জলপাইগুড়ি
হলদিবাড়ি
আসাম
আলিপুর দুয়ার
কোচবিহার
দিনহাটা
ধুবড়ি
বিহার
বাংলাদেশ
রায়গঞ্জ
পশ্চিমবঙ্গ

উত্তরখণ্ডীদের সাথে তাদের যোগাযোগ থাকলে উত্তরবঙ্গে এবার ধুন্দুমার লেগে যাবে।

বিদেশী শক্তির খেলার ময়দান ভারত এখন ভারি বিপজ্জনক অবস্থানে। বিশেষত উত্তরপূর্ব ভারত তো বটেই। আসামে ইউ.এম.এফ নাগাল্যাণ্ডে এন.এস.সি.এল. মণিপুরে পি.এল.ও, মিজোরামে এম.এন.এফ., ত্রিপুরায় টি.এন.ভি., সর্বত্রই বিচ্ছিন্নতাবাদ উগ্রপন্থায় রূপান্তরিত। সব বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির কাছেই আরাকান পর্বতমালা পেরিয়ে কিংবা বাংলা দেশের সীমান্ত দিয়ে এসে যাচ্ছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। এবং তা ব্যবহৃত হচ্ছে নিরীহ জনসাধারণের উপর। একের পর এক ঘটে যাচ্ছে গণহত্যা। এমতাবস্থায় উত্তরখণ্ডী আন্দোলন ও ঘোষণা আশংকাজনক বইকি। শিলিগুড়ি থেকে হাঁটা পথে ভুটান এবং নেপাল যাওয়া যায়। নেপাল এখন আন্তর্জাতিক খোলা মার্কেট। পাশেই সীমান্ত। সেদিক থেকেও অস্ত্রের চোরাচালান এসে পৌঁছাতে পারে নজর এড়িয়ে। আর তাহলেই ঘটে যাবে মারাত্মক দুর্ঘটনা। জলপাইগুড়ির পোস্টার তাই তো বলে।

কামতাপুরী রাষ্ট্র প্রসঙ্গে সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, কংগ্রেস এখনও অব্দি একেবারে চুপচাপ। এমন কি কামতাপুরী রাষ্ট্রঘোষণার প্রতিবাদ অব্দি তারা করেনি। অথচ তাদের সভানেত্রী ইন্দিরা গান্ধী ৩১ অক্টোবর এই জাতীয় সংহতিরক্ষায় প্রাণ বলি দিয়েছিলেন। কামতাপুরী প্রসঙ্গে কংগ্রেস কিন্তু নীরব। উল্টোদিকে অসম গণপরিষদের সমর্থকদের সঙ্গে কামতাপুরীর লোকজনদের ঘনিষ্ঠতা কম নয়। অ-গ-প সরকারের জড়িত থাকার গুজবটি তারা কিন্তু কোন প্রতিবাদ করেনি। তাহলে কেউ যদি ভাবেন, অ-গ-প এবং কংগ্রেস নেপথ্যে এই উত্তরখণ্ডী আন্দোলনের পিছনে আছে—তাহলে কি তিনি অন্যায় করবেন? এই কোচরাজবংশীদের নেত্রী গায়ত্রী দেবীইবা জয়পুর থেকে এখানে কেন এলেন?

(৫৭ পৃষ্ঠার পর)
এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে, এখন আর পুলিশের ঝামেলা কে-সামলাবে? রামুকে তাড়াতাড়ি বললেন, "ট্যাকসি ডেকে নিয়ে আয়, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

মাতুঙ্গা পুলিশ স্টেশনে খবর দেওয়া হল। তখন রাত সওয়া তিনটে। ডিউটিতে ছিলেন সাব-ইনসপেকটার চৌহান। ও.সি. থানার কম্পাউণ্ডেই থাকতেন। চৌহান ফোন পেয়ে একজন সিপাইকে পাঠালেন তার কাছে। এরপর তিনি ফোন করলেন পুলিশ কন্ট্রোল রুমে, তারপর ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং সি.আই.ডি. তে।

ভোর সওয়া চারটের সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোলো। ডাক্তার সোনাওয়ালা তখন এয়ারপোর্টে চলে গেছেন। পুলিশ এসেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। ততক্ষণে ডাক্তার সোনাওয়ালাকে বিদায় দিয়ে তাঁর সঙ্গের লোকজনেরাও ফিরে এসেছেন এয়ারপোর্ট থেকে। তাদেরও বিবৃতি নেওয়া হল। ইতিমধ্যে সি.আই.ডি. ইনসপেকটার সত্যব্রত জয়কার এসে পড়েছেন। প্রথমে ক্রাইম ব্রাঞ্চ ইতস্তত করছিল যে এই খবরটা এত তাড়াতাড়ি জয়কারকে দেওয়া ঠিক হবে কি না। পরে দিলেও তো চলতে পারে। ব্যাপারটা এত গুরুত্বপূর্ণ নয় যে এ নিয়ে এখনই এত দৌড়োদৌড়ি শুরু করা দরকার। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, ঘটনাস্থল থেকে মি. জয়কারের বাড়িটার দূরত্ব সাত-আট মিনিট তাই তারা ভেবেচিন্তে জয়কারকে ফোনে খবরটা জানিয়েই দেন।

জয়কার এসে প্রথমেই মাতুঙ্গা পুলিশের তৈরি করা বিবৃতিগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর প্রথম প্রশ্ন করলেন রামুকে। অত ভোরে রাস্তায় সে কি করছিল? উত্তরে রামু আনুপূর্বিক যা ঘটেছিল তা জানাল। এরপরেই জয়কারের মনে হলো, রামুর আগে কি কেউ এই মৃতদেহ লক্ষ্য করেছে, যাতে করে বোঝা যাবে, কখন এই দেহটা এখানে আনা হয়েছে। এই মনে হওয়াটা মাথায় রেখেই তিনি তদন্ত শুরু করলেন।

ওয়াড়িয়া হাউসের বাসিন্দা মি. খাম্বাটা ফোনে পুলিশকে খবর দিয়ে ছিলেন। চার তারিখ রাতের শো'তে তিনি সস্ত্রীক সিনেমায় গিয়েছিলেন। তিনি বাড়ি ফেরেন সাড়ে বারোটা থেকে পৌনে একটার মধ্যে। সেসময় তিনি ও জায়গায় কিছু দেখেননি। ডাক্তারের বাড়িতে আরও পরে রাত দেড়টা নাগাদ কিছু আত্মীয়স্বজন আসেন। তারাও কিছু দেখেননি।

মাতুঙ্গা পুলিশের পেট্রলিং স্টাফ অন্যান্য রাতের মত সে রাতেও প্রায় দুটো নাগাদ ঐ এলাকা দিয়ে পার হয়। এসব দেখেশুনে জয়কার মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে চার তারিখ রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে কোনো এক সময় লাশটা ওখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

মৃতদেহ পরীক্ষা করে জানা গেল, মেয়েটির, বছর পঁচিশেক বয়স, আঁটোসাঁটো শরীর, দেহে কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। চুল খোলা। পরনে সালোয়ার-কুর্তা, পায়ে সবুজ রং-এর চপ্পল, কানে বড় দুল। বাঁহাতে উলকিতে নাম লেখা, সলমা।

ঘটনাস্থলে তখন পুলিশ ফটোগ্রাফার পৌঁছে গেছে। তারা নানাভাবে ছবি নিচ্ছিল। জয়কার চুপ-চাপ মৃতদেহটিকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। সলমাকে উপুড় করে যখন তার পিঠের দিককার ফটো নেওয়া হচ্ছিল, সেসময় হঠাৎ কিছু একটা লক্ষ্য করে তিনি সামান্য চমকে উঠলেন। দু'পা এগিয়ে সলমার পিঠের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। সলমার কুর্তার পেছনে গলা থেকে নিচে পর্যন্ত একটা চেন এবং চেনটার নিচের দিকের কিছু অংশ ওপড়ানো, যাতে এটা স্পষ্ট অনুমান করা যেতে পারে, কেউ সলমার কুর্তার চেন ধরে জোরে খুলবার চেষ্টা করেছিল। কুর্তাটা এজন্য কিছুটা ছিঁড়েও গেছে। জয়কার এবার বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন, সলমার শরীরে কোনা ওড়না নেই। কোথায় গেল সলমার ওড়না? তার ছেঁড়া কুর্তা, এলোমেলো খোলা চুল, এসবই বা কিসের ইঙ্গিত?

জয়কার এবার ভাবলেন, দেখতে হবে ওয়া-ড়িয়া হাউসের সঙ্গে সলমার কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা। কোনো পার্শী পরিবারে একজন মুসলমান মেয়ে কাজ করতেই পারে। ওয়াড়িয়া হাউসে সব সুশিক্ষিত এবং ভদ্রলোকজনেরই বাস, সেখানে অবশ্য সলমা কে নিয়ে কোন কুকর্ম ঘটেছে-ভাবাটা একটু কঠিন, তবু এটা নিয়ে ভাবতে হবে।

জয়কারের ধারণা এটা একটা ধর্ষণের কেস। এবং ধর্ষণকারী নিজেই খুনী। কিন্তু খুন করে মৃতদেহটিকে এতদূরে এনে ফেলাটা বাস্তবিকই কঠিন কাজ। ভেবেচিন্তে জয়কার সিদ্ধান্ত নিলেন, কাজটা নিশ্চয়ই একাধিক ব্যক্তির। আরেকটা প্রশ্ন তার মাথায় এলো, সলমার মৃতদেহ যদি অন্য জায়গা থেকে এনে ফেলে রাখা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। ভাড়া করা গাড়ি যদি হয়, তাহলে এটাও ঠিক যে কোনো ট্যাক্সি চট করে এ কাজে রাজি হবে না। যদি হয়ও, তবে নিশ্চিত যে ট্যাকসির ড্রাইভারও এতে জড়িত। প্রাইভেট কারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

যাই হোক. জয়কার অকুস্থলের কাজ সেরে অফিসে চলে গেলেন। অফিসে পৌঁছে তিনি পুলিশ কন্ট্রোলরুমে যোগাযোগ করে মহারাষ্ট্রের সব কটা থানায় নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন, কোথাও যদি সলমা নামের কোন মুসলমান যুবতীর নিখোঁজ হবার ঘটনা ডায়েরি করা হয়ে থাকে, কিংবা কেউ যদি সলমার নিখোঁজ হবার রিপোর্ট নিয়ে থানায় হাজির হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে যেন ক্রাইম ব্রাঞ্চকে সে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

এতে কাজ হলো। জানা গেল সুলেমান নামের জনৈক যুবক ডোংরি পুলিশ স্টেশনে তার বোনের নিখোঁজ হবার ব্যাপারে ডায়েরি করতে এসেছে। তার বক্তব্য অনুযায়ী, তার বোনের নাম সলমা এবং নামটা তার বাঁ-হাতে উলকিতে লেখা আছে। ডোংরি থানায় ডিউটি অফিসার সঙ্গে সঙ্গে জয়কারকে ফোন করে একথা জানিয়ে দিলেন। জয়কার ডোংরি থানায় নির্দেশ পাঠালেন, সুলেমানকে যেন থানাতেই বসিয়ে রাখা হয়, তিনি আসছেন। এর মধ্যে একজন স্টাফ এসে পৌঁছতেই জয়কার তাকে নিয়ে ডোংরি থানায় রওনা হয়ে গেলেন। স্টাফটি জে.জে. হাসপাতাল থেকে এসেছিল, সলমার মৃতদেহের সঙ্গে তাকে পাঠানো হয়। সে'ই সলমার কাপড়চোপড়গুলি নিয়ে এসেছিল।

সুলেমান বোনের কাপড়চোপড় দেখেই চিনতে পারল। বোনের লাশও সে সনাক্ত করল হাস-পাতালে গিয়ে। রুদ্ধ, কান্নাভেজা গলায় জয়কারকে জানালো, সে ডোংরির একটা মাংসের দোকানে কসাই এর কাজ করে। বিবাহিত, কয়েকটি সন্তানও আছে তার। বোন সলমা সুন্দরী এবং চঞ্চল প্রকৃতির। ফলে, সুলেমান বোনের জন্য দুশ্চিন্তায় দিন কাটাত, যদি কখনো বোন ভুল পথে চলে যায়। বোনের বিয়ের জন্যও সে খুব চেষ্টা করছিল সম্প্রতি।

ডোংরি অঞ্চলে মাঝে মাঝে কিছু আরব-দেশীয় লোক আসতো। সলমা'র এই আরবদের সম্পর্কে একটা বিস্ময় মেশানো কৌতূহল ছিল। সে শুনেছিল, এইসব শেখেদের প্রচুর টাকা, তারা জলের মতো টাকা খরচ করে। সলমাদেরই পাড়ার নজমা নামে একটি মেয়ে এক শেখকে বিয়ে করে আরবে চলে যায়। বছরে এক দু'বার দেশে আসতো। সলমাকে আরবদেশের নানা লোভনীয় গল্প শোনাতো। শুনতে শুনতে তার মনে হতে থাকে, আহা আমিও যদি এরকম এক ধনী শেখকে বিয়ে করতে পারতাম। তার বৌদি রাজিয়াকে সে এই ইচ্ছের কথা বলেও ছিল।

৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ সলমা তার বৌদি রাজিয়াকে বলে বাড়ি থেকে বের হয়। বৌদিকে সে বলে যায়, মহম্মদ কুরেশি-র বাড়িতে সে টি.ভি. দেখতে যাচ্ছে। কুরেশি-র বাড়ি খুব একটা দূরে নয়। কিন্তু রাত আটটা পর্যন্ত সলমা যখন বাড়ি ফিরলো না, রাজিয়া তাকে ডাকতে কুরেশি'র বাড়িতে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে শোনে, সলমা সেই সন্ধ্যেয় সে বাড়িতে যায় নি। রাজিয়া তখন পাড়ায় টি.ভি. আছে, এরকম কয়েকজন প্রতিবেশীর বাড়িতেও সলমার খোঁজ করে, কিন্তু সলমাকে কোথাও পাওয়া যায় না। রাজিয়া কি করবে ভেবে পায় না। সুলেমান বাড়ি ফিরতেই সে একথা জানায়। সুলেমানও ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ে। সমস্ত পরিচিত জায়গায় খুঁজে বেড়ায় বোনকে, কোথাও পায় না। সারারাত ধরে কুরলা, সান্তাক্রুজ, মাহিম, যেখানে যেখানে আত্মীয় স্বজনের বাড়ি ছিল খুঁজে শেষ পর্যন্ত বোনের নিখোঁজ হবার সংবাদ ডায়েরি করতে এসেছিল ডোংরি থানায়।

ততক্ষণে সলমার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেল। জয়কার যা যা ভেবেছিলেন, ঠিক তাই। সলমাকে খুন করা হয়েছে শ্বাস বন্ধ করে, এবং তার আগে যৌন সঙ্গমও করা হয়েছে তার সঙ্গে।

জয়কার সদলবলে তদন্তের উদ্দেশে রওনা হলেন সুলেমানদের পাড়ায়। সলমার মৃত্যুসংবাদ

ইতিমধ্যেই সবাই জেনে গিয়েছিল। জয়কার জানতে চেষ্টা করছিলেন, সলমার সঙ্গে কারোর কোন গোপন সম্পর্ক ছিল কিনা, এবং পরিচিত কোনো লোক এপাড়া থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে কিনা। জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে হঠাৎ একটি দশ বারো বছরের মেয়ের কাছ থেকে জানা গেল, সে নাকি ঐ সন্ধ্যেবেলা পাড়ার একপ্রান্তে পানের দোকানের সামনে সলমা ও মমতাজকে কথা বলতে দেখেছিলো। মেয়েটির নাম সঙ্গীদা, সে ঐ দোকানে পান কিনতে গিয়েছিল। সে জানাল, সলমা ও মমতাজ কি কথা বলছিল, তা অবশ্য সে জানে না। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, সলমা যখন কুরেশির বাড়িতে টি·ভি· দেখতে যাচ্ছিল নিশ্চয়ই রাস্তার মধ্যে মমতাজের সঙ্গে তার দেখা হয়। তারপর কোথায় গেল সলমা ? মমতাজ হয়তো একথা বলতে পারে। কিন্তু মমতাজ কে ?

মমতাজের নাম শুনেই সুলেমানকে একটু ফ্যাকাশে দেখায়। তিনটি সন্তানের জননী বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের মমতাজের স্বামী মদ্যপ। মমতাজের নিজের চরিত্রও মোটেই ভাল নয়। তাদের বাড়ি সুলেমানদের বাড়ির কাছেই। সুলেমান চাইতো না তার বোন মমতাজের সঙ্গে মিশুক।

মমতাজের বাড়ি গিয়ে জয়কার দেখলেন, মহিলা বাড়িতে নেই। তার স্বামীকে পাওয়া গেল, কিন্তু সে লোকটি কিছুই বলতে পারলো না, তার স্ত্রী কোথায় গেছে আর কবেই বা ফিরবে। জয়কারের সন্দেহ দৃঢ় হয়। আগের দিন সকাল দশটা নাগাদ নাকি মমতাজ বেরিয়ে গেছে। পানওলাকেও জিজ্ঞেস করা হল, সে-ও জানালো, সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ সলমা ও মমতাজকে সে দোকানের সামনে কথা বলতে দেখেছে। তাহলে, সকাল দশটায় বেরিয়ে মমতাজ সারাদিন কোথায় ছিল ? ডোংরিতেই সলমা'র সঙ্গে সে তো দেখা করে সন্ধ্যেবেলা। ডোংরিতে যদি না থাকবে, তাহলে সন্ধ্যে ছ'টার আগে সে কোথা থেকে এসেছিল ? ফিরে এসেও বাড়ি ফিরলো না কেন ? বিশেষ করে সলমা'র সঙ্গেই তার কি দরকার ছিল মমতাজের স্বামী এসবের সঙ্গে যুক্ত নেই তো ?

এসব প্রশ্নের উত্তর জয়কারকে খুঁজে বের করতেই হবে। মমতাজের বাড়ির আশেপাশে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে মমতাজ সম্পর্কে আরো কয়েকটি তথ্য পাওয়া গেল। এক উত্তরপ্রদেশী ট্যাকসি ড্রাইভারের সঙ্গে তার নাকি অবৈধ সম্পর্ক ছিল। আর, একদু'বার মমতাজকে একজন আরব শেখের সঙ্গেও দেখা গেছে।

জয়কারের সামনে এই কেসে এখন দু'জন পুরুষ দেখা যাচ্ছে, একজন ট্যাকসি ড্রাইভার, অন্যজন আরব শেখ। আচ্ছা, এমনো তো হতে পারে, ট্যাকসি ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ হয় কোনো শেখের। শেখ তার কাছে 'মেয়ে' চেয়েছিল, ড্রাইভার সে-খবর মমতাজকে দেয়। আরবদের প্রতি মোহাবিষ্টা সলমা-কে মমতাজ ফাঁদে ফেলে। জয়কার ভাবতে থাকেন।

জয়কারের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। সন্ধ্যে পাঁচটা নাগাদ জয়কার মমতাজের স্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন, হঠাৎ মমতাজ নিজেই হাজির হলো বাড়িতে। বাড়ির সামনে পুলিস দেখে সে পালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু পুলিশ তাকে ধরে ফেলে।

ক্লান্ত, বিবর্ণ মমতাজের দিকে তাকিয়ে ইনসপেকটার জয়কার কঠিন স্বরে প্রশ্ন করলেন, "মমতাজ, গতকাল বেলা দশটা থেকে এখন পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে ?" মমতাজ কোনো জবাব না দিয়ে কেঁদে ফেলল। জয়কার চটকরে মমতাজের হাত থেকে পার্সটা ছিনিয়ে নিয়ে দেখলেন, তার-মধ্যে একশ টাকার নোটের একটা তাড়া। জয়কার আবার জোর গলায় প্রশ্ন করেন, "মমতাজ, কান্না থামাও, যা জিগ্যেস করছি, তার ঠিক ঠিক জবাব দাও। এ টাকা কোথায় পেলে ? কাল সন্ধ্যেবেলা তুমি সলমার সঙ্গে দেখা করেছিলে, সলমা এখন কোথায় ?"

জয়কার এরপর মমতাজ সম্পর্কে যা জানলেন, তা চমকপ্রদ। মদ্যপ স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো ছিল না। বিলাসব্যসনে মমতাজের আগ্রহ ছিল খুব বেশি। দৈহিক সুখের জন্যও তার লালসা ছিল। এবং যৌনতৃপ্তি দেবার ব্যাপারে সে বদ্রীপ্রসাদ তেওয়ারি নামক এক ট্যাকসি ড্রাইভারকে জোটায়।

চল্লিশ বছর বয়সের বদ্রীপ্রসাদ বেশ স্বাস্থ্যবান এবং দৃঢ় শরীরের। বৌকে দেশের বাড়িতে উত্তর-প্রদেশে রেখে এখানে সে কুলা চুনাভট্টি অঞ্চলে একটা পুরনো বাড়িতে থাকতো। মমতাজ কখনো কখনো সারারাত কাটাতো বদ্রীপ্রসাদের ঘরে। বদ্রীপ্রসাদ মমতাজকে নিয়মিত টাকা পয়সা দিত।

একদিন বান্দ্রা অঞ্চলে ট্যাকসি নিয়ে যেতে বদ্রীপ্রসাদ এক ধনী শেখকে পেয়ে যায়। আখতার জাফর নামের এই আরবীয়টিকে বোম্বাই ঘুরিয়ে দেখায় বদ্রীপ্রসাদ। কথায় কথায় শেখ "মেয়ে-ছেলে"র প্রসঙ্গ নিয়ে আসে। শেখটি ছিল 'রেন-বো' হোটেলে।

হোটেলের সামনে শেখকে ছেড়ে বদ্রীপ্রসাদ সেদিনই মমতাজকে তার পরিকল্পনা খুলে বলে, মমতাজ সানন্দে রাজি হয়ে যায়। সন্ধ্যেবেলা মমতাজকে নিয়ে বদ্রীপ্রসাদ হোটেলে যায়। শেখের সঙ্গে দেখা করে। শেখ অবশ্য মমতাজকে দেখে খুব একটা খুশি হয় না। তবু মমতাজ শেখের সঙ্গেই সে-রাত কাটায়।

পরের দিন সকালে বদ্রীপ্রসাদ রেনবো হোটেলে মমতাজকে আনতে যায়। শেখ বলে, 'এই মেয়ে-ছেলেটির বয়স অনেক বেশি। তোমরা আমাকে একটা কমবয়সী মেয়ে যোগাড় করে দাও।'

৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যেয় বদ্রীপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে মমতাজ বান্দ্রা থেকে ডোংরি পৌঁছলো। পানের দোকানের সামনে তার সঙ্গে সলমার দেখা হয়, এখানেই সঙ্গীদা সলমা ও মমতাজকে কথা বলতে দেখেছিল। মমতাজ সলমাকে বলে, সে এক আরবীয়কে বিয়ে করে খুব শিগগীরই কুয়েতে চলে যাবে। তার ভাবী স্বামী এখন বোম্বাইতে রয়েছে এরপর মমতাজ সলমাকে প্রস্তাব করলো, সলমা যদি তার সঙ্গে হোটেলে যায়, তাহলে ভাবী স্বামীর সঙ্গে সে তার আলাপ করিয়ে দেবে।

সলমা সরল প্রকৃতির মেয়ে। সে মমতাজ ও বদ্রীপ্রসাদের ষড়যন্ত্রের কিছুই টের পায়নি। তখন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। আরবীয়টি সবে ঘুম থেকে উঠে স্নান করতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। এসময় সলমাকে নিয়ে সেখানে হাজির হয় মমতাজ। তাকে দেখে খুশি হয় শেখ।

সলমাকে সে বিছানায় নিয়ে আসে। অসহায় সলমা প্রচণ্ড বাধা দেয়। শেষে চীৎকার করতে থাকে। কিন্তু শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরার বাইরে সে আওয়াজ পৌঁছায় না।

এরপর শেখ একতাড়া একশটাকার নোট মমতাজকে ধরিয়ে দিয়ে তিনজনকেই ঘর থেকে বের করে দেয়। রাত তখন একটা।

এরপর বদ্রীপ্রসাদ ট্যাকসি নিয়ে নিজের বাড়িতে আসে। সলমাকে সেও সেখানে জোর করে যৌনক্রিয়ায় বাধ্য করে। সলমার কান্নাকাটি, বাধাদান কিছুতেই কিছু হয় না। সে মমতাজকে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আমি দাদাকে সব বলে দেব, পুলিশকেও সব জানাবো।'

বদ্রীপ্রসাদ ও মমতাজ এবার একটা গোপন পরামর্শ করে এবং ঠিক করে, সলমাকে মেরে ফেলাই বরং বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বদ্রীপ্রসাদ ট্যাকসি নিয়ে সলমাকে আনে দাদারের কাছে ফাইভ গার্ডেন অঞ্চলে। অঞ্চলটা তখন নির্জন। একটা গলিতে ট্যাকসি দাঁড় করিয়ে মমতাজকে সে ঈশারা করে। মমতাজ সলমার হাত চেপে ধরে জোরে, আর বদ্রীপ্রসাদ সলমার গলা টিপে ধরে। সলমা ছটফট করতে থাকে। প্রচণ্ড চেষ্টা করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু ক্রমশ তার ছটফটানি কমতে থাকে এবং একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে।

এরপর ট্যাকসি নিয়ে বদ্রীপ্রসাদ অন্য একটা গলির দিকে এগোয়। তারপর একটা বাড়ির সামনে সে এবং মমতাজ ধরাধরি করে সলমার মৃতদেহ নামিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। এই বাড়িটাই 'ওয়াড়িয়া হাউস'।

রাত তখন তিনটে। বদ্রীপ্রসাদ মমতাজকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরে। কিন্তু ঘুমোতে পারে না। সকাল ন'টা নাগাদ হোটেলে গিয়ে আরবীয়ের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে।

বদ্রীপ্রসাদের সঙ্গে এদিকওদিক ঘুরে সময় কাটিয়ে মমতাজ সন্ধ্যে পাঁচটা নাগাদ ডোংরিতে তার বাড়িতে ফিরে আসে এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

সেই রাতেই জয়কার সহকর্মীদের নিয়ে বদ্রী-প্রসাদের ঘরে হানা দেন। তাকে নিয়ে যান রেনবো হোটেলে। কিন্তু আরব শেখটি দুপুরের প্লেনেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

মমতাজ আর বদ্রীপ্রসাদকে পুলিশ হাজতে পাঠিয়ে জয়কার ভাবেন, সরল একটি তরুণী কি-ভাবে একটা স্বপ্নের পিছনে ছুটতে গিয়ে জীবন দিয়ে ক্ষণিক ভুলের মাশুল শোধ করল।

পিতামহ ঃ অতুল্য ঘোষ

ছবি : কল্যাণ চক্রবর্তী

কলকাতার শিশুরা দাদু বলতে এখনও একজনকেই চেনে: তিনি বিধান শিশু উদ্যানের স্রষ্টা অতুল্য ঘোষ। কিন্তু রাজনৈতিক শিশুদের-ও তিনি প্রকৃতপক্ষে দাদু। কি কংগ্রেস, কি সি পি এম, কি নকশালপন্থী—অনেক নেতারই তিনি রাজনৈতিক অভিভাবক ছিলেন। কংগ্রেসের প্রিয়রঞ্জন, সি পি এমের বিনয় চৌধুরী, কিংবা নকশাল নেতা সুশীতল রায়চৌধুরী মাঝে মধ্যে বসে যেতেন অতুল্যদা'র কাছে। মোরারজী দেশাই, জৈল সিং, সঞ্জীব রেড্ডি, ওয়াই বি চ্যবন, ইন্দিরা গান্ধী এমন কি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও এসেছেন অতুল্য বাবুর কাছে। ১৯৭১ এর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন কংগ্রেসের বঙ্গেশ্বর। রাজনীতির সেই নেপথ্যপাটের 'কিং মেকার' হঠাৎই হয়ে গেলেন কলকাতার দাদু। কলকাতার দাদু গত ১৮ এপ্রিল মহাপ্রয়াণে চলে গেলেন। তাঁরই স্মরণে আলোকপাতের প্রতিনিধি আলপনা ঘোষ এবং গুরুপ্রসাদ মহান্তির এই প্রতিবেদন।

শ্রীচরণেষু দাদু : শেষ নমস্কার

মা, দাদু কই? ২১ এপ্রিলের বিকেলে কাঁকুড়-গাছি সংলগ্ন বিধান শিশু উদ্যানের গেটে দাঁড়িয়ে দোলন মাকে বারংবার প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। সেই ঘর, আরামকেদারা, গাছগাছালি, পশুপক্ষী সব আছে, অথচ তাদের চশমা চোখে দাদু নেই কেন, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না দোলন। খুব খারাপ লাগছে দোলনের। দাদু থাকলেই বলতেন, কেমন আছ দোলা? আজ তো কেউ বলল না। দোলন জানত গত ১০ এপ্রিল সাতদিন যমেমানুষে টানাপোড়েনের পর উডল্যাণ্ড নার্সিং হোমে কলকাতার দাদু অতুল্য ঘোষ মহাপ্রস্থানের পথে চলে গেছেন।

১৯৭১ সালে লোকসভার আসানসোল কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী রবিন সেনের কাছে পরাজিত হবার পর প্রয়াত অতুল্য ঘোষ প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে পুরোপুরি সরে আসেন। এর আগের বার অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে সি পি আই প্রার্থী জে. এম. বিশ্বাসের কাছেও তিনি পরাজিত হন। ৭১-এর পরাজয়ের পরই অতুল্য-বাবু প্রত্যক্ষ রাজনীতি ছাড়লেন। তিনি আগে থেকেই আঁচ করতে পারছিলেন জনগণের উপর তাঁর প্রভাব কমে আসছে। কিন্তু আসানসোল কেন্দ্রেই হারবেন এমনটা ধারণায় ছিল না। রাজ-নৈতিক মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে তৈরি করতে লাগলেন তাঁর নিজস্ব সংসার, মানুষকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, মানুষের জন্য মাটিতে নেমে এসে।

বিধান শিশু উদ্যান ছবি : প্রদীপ গুপ্ত

প্রত্যক্ষ রাজনীতির জগত থেকে নীরবে বে-রিয়ে এলেন সেদিন। কাউকে কোন কৈফিয়ৎ দেবার প্রশ্নই ওঠে না। আর এই নীরবে রাজনীতির রণক্ষেত্র থেকে সরে আসার ঘটনাকে নিয়ে সাং-বাদিক ও কাগজওলারা মনগড়া সব কারণ দেখিয়ে অপপ্রচার চালিয়েছিলেন। নির্বাচন ক্ষেত্রের যথার্থ পরিচর্যা নাকি তিনি করেন নি, তাই জনসাধারণ তাঁকে সরে যেতে বাধ্য করল।

সাংবাদিক আর কাগজওলাদের ব্যবসাদারি মনোভাবকে সরাসরি আক্রমণ করা অতুল্যের নীতি বিরোধী। নীরবে হাসলেন তিনি। আসল কারণ তো তাঁর চেয়ে বেশি কেউ আর জানে না! তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্ল সেন। তাঁর মজুতদার বিরোধী খাদ্যনীতি এবং অতুল্যের জোতদার বি-রোধী ভূমি সংস্কার নীতিতে গ্রাম্য কংগ্রেসের মাতব্বর শ্রেণী বেঁকে বসল। তাঁদের দুজনকে জব্দ করার সাথে সাথে দল ভাঙার চেষ্টায় তৎপর হল। বিরোধী পক্ষকে মদত, টাকা কিই না দিল! ওদের ভোট পড়ল বিরোধী দলের দিকে। স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসপ্রার্থী অতুল্যের জেতার কোন সুযোগই ছিল না।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী আর কংগ্রেসের চিফ হুইপ সুব্রত মুখার্জি এক বাক্যে আজ স্বীকার করেন, বয়োজ্যেষ্ঠ অতুল্য-বাবু ছিলেন কংগ্রেসের রাজনৈতিক অভিভাবক। তাঁর নীতিনিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা, তৎপরতা, দলের প্রতি সীমাহীন আনুগত্য জীবৎকালেই তাঁকে প্রবাদ পুরুষে পরিণত করেছিল। যে কোন দলীয় কর্মীর কাছে আদর্শ স্থানীয় তিনি। কিন্তু এই কর্মনিষ্ঠ মানুষটির বিরুদ্ধেও অভিযোগ কম আসে নি। কং-গ্রেসের নেহেরু-বিরোধী চক্র 'সিন্ডিকেটের' কুচক্রী-দের মধ্যে সাংবাদিকরা যোগ করে দিলেন অতুল্য-বাবুর নামও।

১৯৬২ সাল তখন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের শরীর ভাঙতে শুরু করেছে। আর এই শরীর ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে তখন নতুন এক রাজনীতি। জওহরলালের পরে কংগ্রেসের সভাপতি হবে কে? এই টানাপোড়েনে কিছু সময় কেটে গেছে। ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি সত্যি সত্যিই শুরু হয়ে গেল জওহরলালের বিক-ল্পের সন্ধান।

বিধান শিশু উদ্যানে ক্রীড়ারত শিশুরা ছবি : প্রদীপ গুপ্ত

প্রাক্তন রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং ও অতুল্য ঘোষ : শিশু স্বপ্নের সাথী

কেউ কেউ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে মোরারজীর নাম প্রস্তাব করলেন। কলকাতা এবং বোম্বাইয়ে বসে এস কে পাতিল নাম করলেন অতুল্যবাবুর। অতুল্যবাবু তাঁর পছন্দের লালবাহাদুরের নাম তুললেন। কাগজ লিখল অতুল্যবাবু নেহেরুর বিরোধিতা শুরু করছেন। কারণ নেহেরু চাইছিলেন কামরাজই সভাপতি হোন। প্রথমে কামরাজ রাজি ছিলেন না। নেহেরু কৌশলে অতুল্য ও অনান্য ক'জনকে কামরাজকে রাজি করানর জন্য ভার দিলেন। কামরাজ শেষ পর্যন্ত সভাপতি হবার জন্য রাজি হলেন কিন্তু মাঝখান থেকে অতুল্যবাবু, কিছু সাংবাদিক, সঞ্জীব রেড্ডি, নিজলিঙ্গাপ্পা, মোরারজী আর পাতিল চিহ্নিত হয়ে গেলেন নেহেরু বিরোধী 'সিণ্ডিকেট'–এর কুচক্রী হিসেবে।

১৯৮৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এদিনও অতুল্যকে বিরূপ মনোভাবের মুখোমুখি হতে হল। সেই ১৯৭১–এ রাজনীতির নোংরা আবর্জনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও লোটাকম্বল তাঁকে ছাড়ছিল না মোরারজী সেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে শুরু করলেন। ইন্দিরার স্বপক্ষে বলার পরেও ইন্দিরা কৌশলে কেমন নিরাশ করেছিলেন অতুল্যকে তারই প্রসঙ্গ। কারণ নেহেরুর পর লালবাহাদুর আর ইন্দিরাকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য যাঁরা মুখ্যভূমিকা নিয়েছিলেন অতুল্য ছিলেন তাঁদের অগ্রণী।

কিন্তু রাজনীতি থেকে সরে গিয়েও বসে থাকেন নি এই সদাউদ্যমী মানুষটি। এবার শিশুদের স্বপ্ন আর কল্পনার রঙীন জগতে জায়গা করে নিলেন কর্মিষ্ঠ অতুল্য ঘোষ। বাংলার রূপকার বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতিতে বিধান শিশু উদ্যানের কাজে নেমে পড়লেন। শিশুসাথীর সার্থক রূপায়নে দুবছরের মধ্যেই তিনি হয়ে ওঠেন কলকাতার 'দাদু'।

১৯৬২ সালের ৪ জুলাই বিধানচন্দ্রের মৃত্যুর পর বি সি রায় মেমোরিয়াল কমিটি পূর্ব কলকাতার নারকেলডাঙ্গায় একটি শিশু হাসপাতাল গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে এই শিশু উদ্যানটি তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মাত্র তিন মাসে এই কাজের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার একটি তহবিল গড়ে ওঠে। ১৯৬৮ সালের ১৪ নভেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন শিশু উদ্যানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৭৬ সালে ১ ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ বিধান শিশু উদ্যানের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। ঝিল সমেত ৬৪ বিঘা জলাজমি ভরাট করে তৈরি হয়েছে বিধান শিশু উদ্যান। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের দিকে তাকিয়েই অতুল্য ঘোষের এই সৃষ্টি। এখন এখানে বিনা প্রয়সায় প্রায় ছ'হাজার শিশুর নানা ধরনের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা রয়েছে। শিশুদের সৃষ্টিশীল প্রতিভা বিকাশের কথা মনে রেখে এখানে 'খেয়াল খুশি' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। শিশু উদ্যানের উদ্যান–সংগীত হল :

'মহান নেতার নামে গড়া
মোদের এ উদ্যান
দেশের সকল ছেলেমেয়ের
প্রিয় প্রতিষ্ঠান।
মোদের দাদুর হৃদয়খানি
ভালবাসায় ভরা
কাজের মানুষ স্নেহের ফাঁদে
গেছেন পড়ে ধরা।

৬–১৪ বছরের ছেলে মেয়েরা এই উদ্যানের সদস্য হতে পারে। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জের মত এখানেও পড়াশোনা এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক ব্যাপারগুলি থাকে বাগানের গাছগাছালির ছায়ায় বসে। ৫২ টি দোলনা, স্লাইড, মেরী গো রাউণ্ড, স্লিপ ইত্যাদি নানান ধরনের শিশুদের খেলার উপাদান বাগানের মধ্যে শৈল্পিক ভাবে সাজান। প্রতিদিনই হাজার খানেক শিশুর বিকেল হলেই আনাগোনা। আর কি আশ্চর্য দাদু কিন্তু সকলকেই নামে চিনতেন। কেউ না এলে, আসা মাত্র নাম ধরে খোঁজ খবর নিতেন।

১৯৭৮ সালে বিধান শিশু উদ্যানের সদস্যদের মধ্যে যারা কোন বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার

কিন্তু রাজনীতি থেকে সরে গিয়েও বসে থাকেন নি এই সদাউদ্যমী মানুষটি। এবার শিশুদের স্বপ্ন আর কল্পনার রঙীন জগতে জায়গা করে নিলেন কর্মিষ্ঠ অতুল্য ঘোষ। বাংলার রূপকার বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতিতে বিধান শিশু উদ্যানের কাজে নেমে পড়লেন। শিশুসাথীর সার্থক রূপায়নে দুবছরের মধ্যেই তিনি হয়ে ওঠেন কলকাতার 'দাদু'।

করে তাদেরকে ২৫ টাকা হারে এক বছরের বৃত্তি দেওয়া হয়। এখানে ২২ টি বিষয়ের ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম ছাত্রকে মাসিক ৭৫ টাকা এবং মাধ্যমিকের ছাত্রকে ৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। প্রতিবন্ধী ছাত্রদের এখান থেকেই সাহায্য করা হয়। শিশু উদ্যানে রিডিং রুম, লাইব্রেরী সবই আছে। অতুল্য ঘোষ বলতেন: 'বিধানচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার কথা মনে রেখেই আমার বিধান শিশু উদানে একসঙ্গে নানা রকম শেখাবার চেষ্টা করছি। বাগানের পরিবেশে ফল–ফুল–গাছপালার প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুমনের সহজ বিকাশই আমাদের লক্ষ্য।'

কলকাতার দাদু অতুল্য ঘোষ তাঁর শেষ শয্যাটি পেতেছিলেন এই বিধান শিশু উদ্যানেই। দাদু নেই শুনে নাতিনাতনিরা শিশু উদ্যানের চত্বরে আলপনা এঁকে রাখে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে। তাদের দাদু এলেন নিথর নিস্পন্দ ফুলে ফুলে ঢাকা। সকলে শেষ যাত্রায় চোখের জল বিছিয়ে বলল–দাদু প্রণাম।

(৫৯ পৃষ্ঠার পর)

সত্তর দশকের মাঝামাঝি লণ্ডনে পাকিস্তান ক্রিকেটদলের সে সময়কার অধিনায়ক আসিফ ইক্‌বালের সঙ্গে বুখাতির রহমানের দেখা হয়। বুখাতির তার আকৈশোর লালিত স্বপ্নটির কথা আসিফকে জানান। আসিফ সানন্দে রাজী হন বুখাতিরের প্রস্তাবে।

খেলার পর আর কারও বুঝতে বাকি নেই যে আরব জাহানও বিশ্বের ক্রীকেট ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে চলেছে। এবং সেটা ঘটেছে গত কয়েক বছরের নিরলস অধ্যবসায়ী প্রক্রিয়ায়। অস্ট্রেলিয় টি.ভি. টাইকূন কেরী প্যাকারের মত মেষশাবক একত্র করার স্পর্ধিত প্রয়াস নয়, একজন শেখের স্বপ্নের মরমী বাস্তবায়ন। কমনওয়েলথ দেশগুলির একাধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি লোকের সুপরিকল্পিত কর্মপ্রয়াসের ফলশ্রুতি। লোকটি শেখ আবদুল বুখাতির রেহমান।

আবদুল বুখাতির রেহমানের স্কুলজীবন কেটেছিল করাচিতে। সেসময়েই ক্রিকেট খেলাটি তিনি প্রথম দেখেন, এবং প্রথম দর্শনেই খেলাটির প্রেমে পড়ে যান। ধীরে ধীরে বুখাতির তার মনের ভেতর একজন হীরোকেও তৈরি করে নেন, তিনি পাকিস্তানী ক্রিকেটের প্রবাদপুরুষ হানিফ মহম্মদ। পাকিস্তানের এই প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন মাত্র ১৭ বছর বয়সে, তারপর খ্যাতির দিগন্তে তাঁর ক্রমান্বিত উত্তরণ। ১৯৫৯ সালে বুখাতির হানিফ মহম্মদের জীবনের একটি স্মরণীয় ম্যাচ দেখেন করাচীতে। ভাওয়ালপুরের বিরুদ্ধে করাচী একাদশের হয়ে হানিফ সেবার এক ইনিংসে করেছিলেন ৪৯৯ রান। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের ইতিহাসে এটি এখনও পর্যন্ত একটি রেকর্ড। এর পর থেকেই বুখাতিরের মনে একটি অসম্ভবের স্বপ্ন দানা বেঁধে ওঠে।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি লণ্ডনে পাকিস্তান ক্রিকেটদলের সেসময়কার অধিনায়ক আসিফ ইক্‌বালের সঙ্গে বুখাতির রহমানের দেখা হয়। বুখাতির তার আকৈশোর লালিত স্বপ্নটির কথা আসিফকে জানান। আসিফ সানন্দে রাজী হন বুখাতিরের প্রস্তাবে। বুখাতিরের প্রস্তাব ছিল দুটি বিশ্বপর্যায়ের ক্রিকেট দলের মধ্যে হানিফ মহম্মদের উদ্দেশ্যে একটি বেনিফিট ম্যাচের আয়োজন করা। অত্যন্ত ব্যস্ততার দরুন আসিফ তখনই কিছু করতে পারলেন না। কিন্তু আসিফ যখন ১৯৮০ সালে শারজায় যান, বুখাতির পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন তার পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা। তিনি জানালেন আসিফ যদি ক্রিকেট টিমদুটোকে রাজি করাতে পারেন তাহলে শারজায় একটি স্টেডিয়াম তৈরি করে দিতে তিনি প্রস্তুত।
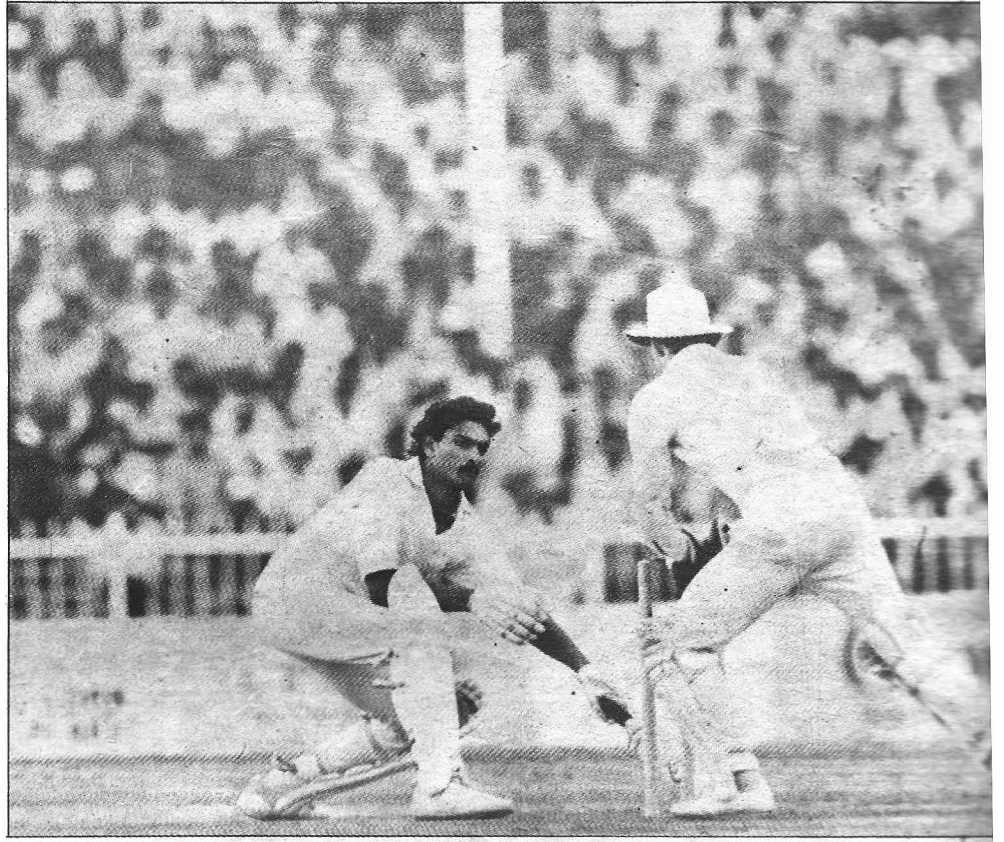
নিউজিল্যাণ্ডের উইকেট কিপার রবি শাস্ত্রীকে স্ট্যাম্প করেছেন

শ্রীলঙকার বিরুদ্ধে শ্রীকান্তর একটি চমৎকার স্কোয়ার ড্রাইভ

আবদুল বুখাতির রেহমান

কাশিম নূরানী, ক্রিকেটারস্ বেনিফিট ফাণ্ডের সেক্রেটারি

আসিফের ধারণা ছিল না যে বুখাতির রেহমান শারজাতেই তার প্রস্তাবিত বেনিফিট ম্যাচের আয়োজন করতে চাইছেন। আসিফ বেশ কিছুটা অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু আসিফের জানা ছিল মধ্য প্রাচ্যের এই শেখেদের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। ৪২ বছরের এই আবদুল বুখাতির রেহমানের কাছে অর্থনিয়োগ কোনও সমস্যাই নয়। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন বানিজ্যিক সংস্থায়, প্রাইভেট ব্যাঙকিং অর্গানাইজেশানগুলিতে, কনস্ট্রাকশন ফার্মগুলিতে এবং রিয়েল–এস্টেট ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর শেয়ারের অধিকারী। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার আকৈশোরের স্বপ্ন। আসিফ ভারত এবং পাকিস্তান থেকে সাড়া পেলেন। স্টেডিয়াম তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেল। ১৯৮১–র এপ্রিলে স্টেডিয়াম মোটামুটি তৈরী, মাঠে ঘাস বিছানো শুরু হয়ে গেছে।

এরপরেও সমস্যা থেকে গেল, এতসব প্রস্তুতির পরেও মাঠে দর্শক হবে কি? আরব দেশগুলির দর্শকেরা ক্রিকেট দেখতে খুব একটা অভ্যস্ত নন। ইদানীং ফুটবল আরব দুনিয়ায় জনপ্রিয় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতেও দর্শকসংখ্যা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। শারজাতে কমবেশি চল্লিশটি স্থানীয় ক্রিকেট টিম আছে, কিন্তু তাতেও ভারতীয়, পাকিস্তানী আর শ্রীলঙকার অধিবাসীদের আধিপত্য। দর্শক বলতেও তাদের মধ্য থেকেই। তবু উল্লেখযোগ্য যে এই 'শারজা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশান'–এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন শেখ আবদুল বুখাতির রেহমান স্বয়ং।

স্টেডিয়াম তৈরী হয়ে গেছে। বুখাতির তার স্বপ্নকে সফল করতে বদ্ধপরিকর। এখনও তার ব্যস্ততার মধ্যে তিনি নিয়মিত ক্রিকেট খেলেন। আসিফকে তিনি 'ক্রিকেটার'স বেনিফিট ফাণ্ড সিরিজ (সি.বি.এফ. এস)' চালানোর ভার দিলেন। প্রথম বেনিফিট ম্যাচ বুখাতিরের আকৈশোরের নায়ক হানিফ মহম্মদের নামে। তিনি নিজের পক্ষ থেকে ৫০,০০০ ডলারের (প্রায় ৬ লক্ষ টাকার) একটি চেক দিয়ে ফাণ্ডের সূত্রপাত করলেন।

৭১ সালে 'শারজা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশান' প্রতিষ্ঠা হবার পর চল্লিশটি ক্রিকেট টিমের মধ্যে 'বুখাতির লিগ'–এর খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার (শুক্রবার অর্থাৎ জুম্মাবার শারজায় ছুটির দিন)। এ পর্যন্ত শুধুমাত্র ক্রিকেটের প্রতি তার ভালবাসার জন্য বুখাতির কয়েক কোটি ডিরহাম (স্থানীয় মুদ্রা, প্রায় চার টাকার সমমূল্যের) খরচা করেছেন। 'সি.বি.এস.এফ' প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত ফাণ্ড থেকে খরচা হয়েছে ৭ লক্ষ ৫৫,০০০ ডলার (প্রায় এক কোটি টাকা)। এই ফাণ্ড থেকে উদ্দিষ্ট ক্রিকেটারকে অর্থসাহায্য করা ছাড়াও বিজয়ী দলকে ৫০,০০০ ডলার এবং শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে ১৫,০০০ ডলার দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। বিশ্বের তাবত ক্রিকেট দলগুলি এবং ক্রিকেটারদের কাছে তাই শারজা আজ এক প্রধান আকর্ষণ।

এপর্যন্ত যাদের বেনিফিট ম্যাচ শারজায় আয়োজিত হয়েছে বা হবে।

১৯৮১–হানিফ মহম্মদ, আসিফ ইকবাল, মাধব মন্ত্রী।

১৯৮২–সুনীল গাভাসকর, ইন্তিখাব আলম, নাজির মহম্মদ, সুভাষ গুপ্তে।

১৯৮৩–গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, জাহির আব্বাস, আলিমুদ্দিন, রমাকান্ত দেশাই।

১৯৮৪–বিষেণ সিং বেদী, ইমরান খান, মেরি ম্যাক্স, সেলিম দুরানি।

১৯৮৫–ওয়াসিম বারি, সৈয়দ কিরমানি, গুল মহম্মদ, একনাথ সোলকার।

১৯৮৬–দিলীপ বেঙ্গসরকার, জাভেদ মিয়াঁদাদ, বিজয় হাজারে, ওয়াজির মহম্মদ।

দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন দিলীপ কুমার, সায়রা বানু ও আবদুল বুখাতির রেহমান

গোদরেজ নিয়ে এলো সুখভোগের শিখর: মার্ভেল লাক্সারি সোপ
Godrej Marvel
ELLOUS PERFUME
যাতে আছে
রাশি রাশি মখমলের
মতো ফেনা আর মনমাতানো সুগন্ধ !
Mudra:B:GS:2704 BN R
দাম : টা. ৪.৫০ স্থানীয় কর আলাদা

রামকৃষ্ণ মিশন কি সত্যিই হিন্দু নয় ?

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত তামাম ভারত সেদিন নড়ে উঠল যেদিন কলকাতা হাইকোর্ট রামকৃষ্ণ মিশনকে অহিন্দু বললেন। সত্যি কি রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দু নয় ? মিশন দীক্ষিত ভক্তরা কি ভাবছেন ? কেন রামকৃষ্ণ মিশন নিজেদের অহিন্দু বলতে চাইছে ? হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক মর্মস্পর্শী ধর্মবোধের দিকে রমাপ্রসাদ ঘোষাল-এর চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন।
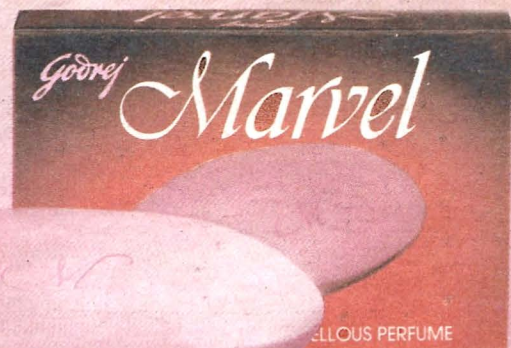
৬ এপ্রিল ১৯৮৬। বিকেলে মেদিনীপুর জেলার সাহসপুর গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন অনুরাগীরা একটি উদ্বিগ্ন বৈঠকে ব্যর্থতা এবং অনুশোচনা মাখানো তুমুল কথা কাটাকাটি করে চলেছেন। তখন পাশের গ্রাম তাতারপুরের গোবিন্দচরণ ঘোষের হাতে 'আজকাল' পত্রিকার একটি পুরনো কাটিং। তাতে লেখা 'রামকৃষ্ণের অনুগামীরা হিন্দু নন হাইকোর্ট'। হঠাৎই স্মৃতিকণা রায় নামে এক তরুণী কথা বলতে বলতে আচমকা ঢলে পড়লেন জ্ঞান হারিয়ে। শশব্যস্ত বৈঠকের মানুষজন তড়িতে সেবায় নেমে পড়লেন।

গত ১১ ডিসেম্বর এরকমই একটি ঘটনা ঘটেছিল উত্তর কলকাতার বনেদী পাড়া শোভাবাজারে, গ্রুপ থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেত্রী মঞ্জুরাহা যেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে পড়ার টেবিলে বসে চোখ বোলাচ্ছিলেন সান্ধ্য দৈনিকের পাতায়, হঠাৎই চোখ আটকে গেল প্রথম পাতার রামকৃষ্ণ মিশন সংক্রান্ত একটি খবরে। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশন মামলায় সুপ্রীম কোর্টে প্রধান বিচারপতি পি.এন. ভগবতীর নেতৃত্বে তিন বিচারকের সুপ্রীম কোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ একটি অন্তর্বর্তী রায় দেওয়ার খবরে বলা হয়েছে, 'আবেদন করা হয় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। তাঁরা বলেন, রামকৃষ্ণ মিশন সংখ্যালঘু মিশন প্রতিষ্ঠান এবং সেজন্য সংবিধানের ২৬ ও ৩০ ধারা অনুযায়ী তাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ার, তা পরিচালনা করার এবং তার প্রশাসন চালানোর অধিকারী। রাজ্য সরকারের দুটি আইন প্রয়োগ করে এই অধিকার খর্ব করা যায় না।'

শ্রীমতী মঞ্জুর মনে প্রশ্ন জাগে রামকৃষ্ণ মিশন নিজে বলেছেন তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু। কিন্তু সংবিধান মতে হিন্দুরা তো সংখ্যা লঘু নন। তাহলে কি রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দু নন। রাম-

রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় ছবি : [illegible]
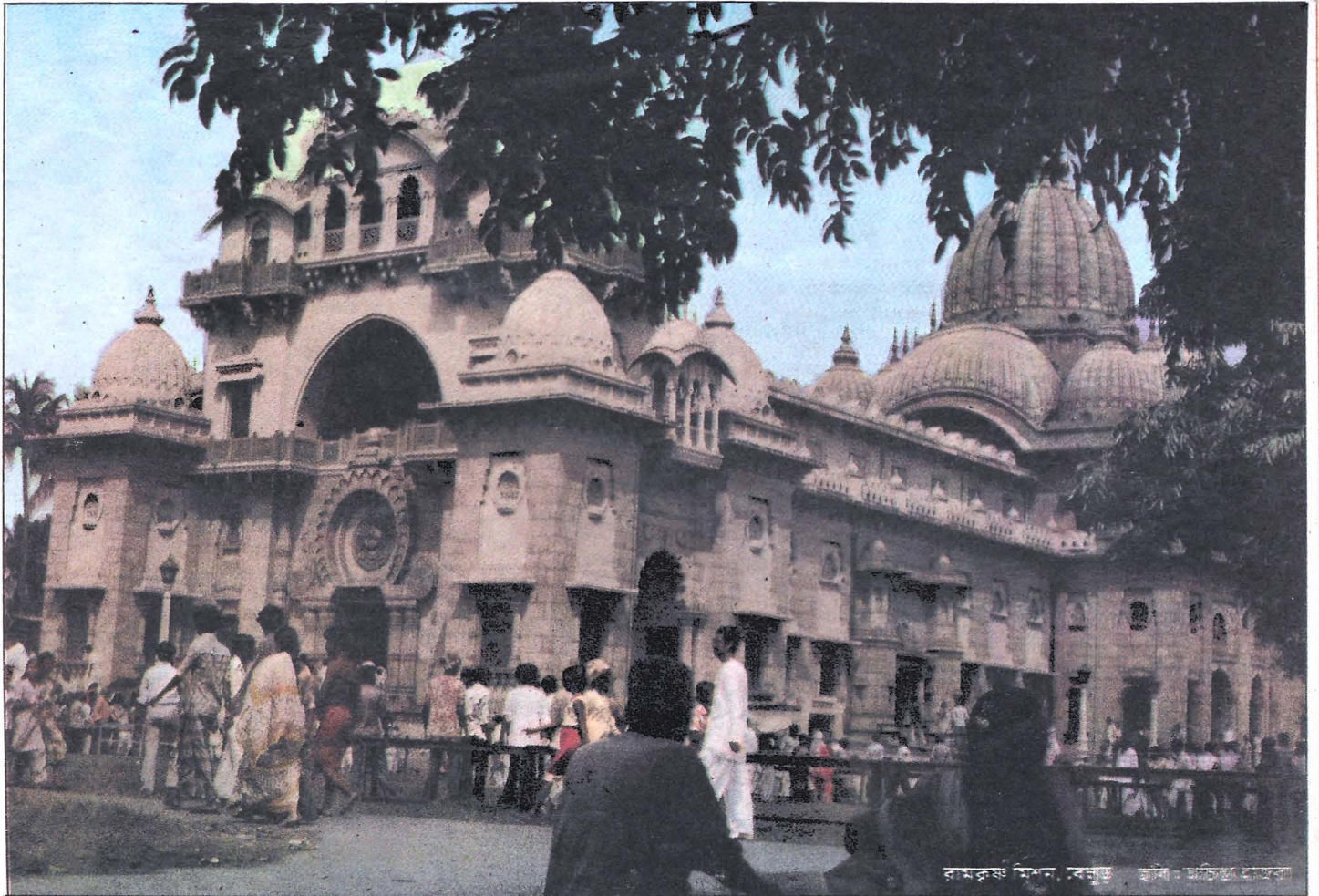
কৃষ্ণ অনুরাগিণী হিন্দুনারী মঞ্জু রাহার চোখে জল এসে যায়। বুকের মধ্যে ককিয়ে ওঠে এক অসহ্য যন্ত্রণা। মঞ্জু রামকৃষ্ণ দেবের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অঝোরে কেঁদে যায়।

এই তীব্র বেদনাঘন অধ্যায়ের পশ্চাদপট জানতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ১৯৮৫ সালে কলকাতা হাইকোর্টে প্রদত্ত রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ কর্তৃপক্ষের এক দরখাস্তে। সেখানে মহামান্য আদালতে আবেদন করে তাঁরা বলেছেন, যেহেতু রামকৃষ্ণ মিশন একটি সংখ্যালঘু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সেহেতু মিশন সংবিধানের ৩০ এবং ২৬ নং ধারার সুযোগ সুবিধা পাবে।

সংবিধানের ২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে, কোন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সংগঠন যেকোন ধরনের প্রতিষ্ঠান করার অধিকারি। আবার ৩০ ধারা মতে তাদের কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার অধিকার দেওয়া আছে। এই দুই ধারার সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য এবং রাজ্য সরকারের কলেজ সার্ভিস অ্যাক্টের আওতার বাইরে থাকার জন্যই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ নিজেদের ধর্মীয় সংখ্যালঘু বলেছেন।

বিতর্কের শুরু ১৯৮০ সালে সরকারি স্পনসর্ড ওই কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগকে কেন্দ্র করে। ১৯৮০ সালে রামকৃষ্ণ মিশন রহড়া কলেজের অধ্যক্ষপদে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী শিবময়ানন্দকে নিযুক্ত করে। অধ্যক্ষ পদে মনোনীত হবার আগে স্বামী শিবময়ানন্দ ২৬ বছর শিক্ষকতা করেছেন। তার মধ্যে ১৬ বছর ডিগ্রি কলেজে উপাধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষ পদে। কলেজের গভর্নিং বডি এই নিয়োগ মঞ্জুর করে।

কিন্তু এই নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক তোলেন কলেজের শিক্ষকরা। আপত্তি পেশ করেন। তাঁদের বক্তব্য এই কলেজ সরকার স্পনসর্ড। সুতরাং সমস্ত নিয়োগ ১৯৭৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস অ্যাক্ট অনুযায়ী হওয়া দরকার। 'রহড়া কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই আইন অনুযায়ী অধ্যক্ষ নিয়োগ না করে আইন ভঙ্গ করেছেন'—এই মর্মে কলেজের ১৫ জন শিক্ষক কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন।

হাইকোর্টে পেশ করা শিক্ষকদের আবেদনপত্রে প্রকৃতপক্ষে প্রশ্ন তোলা হয় কলেজ প্রশাসনে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা নিয়ে। ৫০ এর দশকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বড় এবং নামী কলেজগুলির উপর থেকে ছাত্র ছাত্রীদের চাপ কমাতে শহরতলির দিকে কিছু কলেজ প্রতিষ্ঠার নীতি ঘোষণা করেন। সেই মোতাবেক ১৯৬১ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি এস.সি. বন্দ্যোপাধ্যায় ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন সংক্ষেপে ডি.পি.আই.কে জানান যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নীতি অনুযায়ী রহড়ায় 'রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম' এর সহায়তায় একটি কলেজ তৈরি হবে। তার জন্য যুগ্মভাবে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রিয় সরকার ৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম যোগাড় করেছে ১০ বিঘা জমি। ডেপুটি সেক্রেটারির উক্ত ৩৪১৪–ই.ডি.এন(জি)40–158–61 নম্বর চিঠিতে আরও বলা হয়, কলেজের নাম হবে, 'রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ, রহড়া'। পরবর্তী পর্যায়ে কলেজটির নামে সামান্য রদবদল করা হয়।

কলেজটি ১৯৬৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায়। ১৯৬৩ সালের ৭ মে কলেজ পরিচালন বডির গঠনতন্ত্র সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক ১৮ মে প্রথম অ্যাডহক গভর্নিং বডি নিযুক্ত হয়। পরে ১৯৬৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ সালের ১৩ মার্চ এবং ১৯৭৫ সালের ১৪ মে রাজ্য সরকার কলেজের বডি নিয়োগ করেন এবং আর্থিক দায়দায়িত্ব মেটানোর দায়িত্ব গ্রহন করেন।

১৫ জন শিক্ষকের আবেদনের উত্তরে রামকৃষ্ণ মিশন বলে, 'রহড়ার বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজটি আমাদের দ্বারা স্থাপিত এবং বিশেষ স্পনসর্ড হিসেবে কলেজটি চলছে। রামকৃষ্ণ মিশনের এখন এক লক্ষের কিছু বেশি ভক্ত। যেহেতু এই সংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের কম। সেহেতু তারা সংখ্যালঘু। এবং সেজন্যই রামকৃষ্ণ মিশন সংবিধানের ৩০ ধারার সুযোগ পেতে পারে। এই ধারায় বলা আছে, ধর্মীয় বা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে পারে এবং সরকার সেই প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে কোন পৃথক নীতি নিতে পারে না।

অপরপক্ষে রাজ্যসরকার শিক্ষকদের আবেদনের উত্তরে বলেন, 'কলেজটির নিয়োগবিধি ১৯৭৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস অ্যাক্টের আওতাধীন এবং কলেজ প্রশাসনের যাবতীয় দায়িত্ব আছে ডি.পি.আই. এর হাতে।' রাজ্য সরকার আরও জানায়, 'কলেজের শেষ গভর্নিং বডি গঠন করা হয়েছে ১৯৭৫ সালে। এখন নতুন গভর্নিংবডির কথাও ভাবা হচ্ছে।

আদালতে রামকৃষ্ণ মিশন বলে, মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবের প্রচারিত বেদান্তের অনুগামী ছিলেন। ঠাকুরের দর্শনে সমস্ত ধর্মই ছিল সমান। ফলত শ্রী রামকৃষ্ণ তার জীবনে যা প্রচার করে গেছেন তা হিন্দু ধর্মের থেকে পৃথক। রামকৃষ্ণ দেবের প্রচারিত ধর্মের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃশ্চান, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সমস্ত ধর্মের স্থান আছে। ফলে রামকৃষ্ণ মিশন শুধুমাত্র এই সমস্ত ধর্মে বিশ্বাসই করে না, মিশন এই সমস্ত ধর্ম পালনও করে। বেদ ছাড়াও কোরাণ, বাইবেল, ত্রিপিটক এবং অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে বিশ্বাস করে।

আদালতে বক্তব্য রাখার সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের আইনজীবী শ্রী শক্তিনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং গরু ভক্ষণে [illegible]

২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন
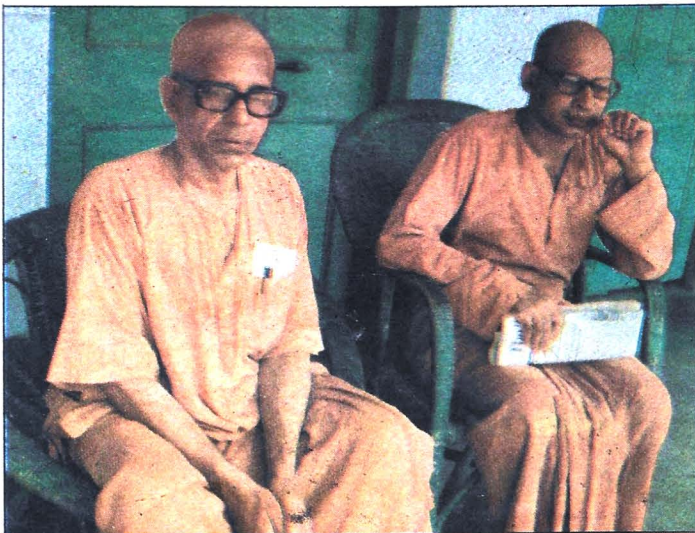
রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের চিন্তিত সন্ন্যাসীরা

ছবি : বিকাশ চক্রবর্তী

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট মহারাজ [illegible]

ছবি : পার্থ সারথি

শর্মিলা ঠাকুরঃ দুই দুনিয়ার দ্বন্দ্ব

ঠাকুর পরিবারের মেয়ে এখন পতৌদির নবাব পরিবারের বেগম। যার পর্দানসীন থাকার কথা তিনি এখন ফিল্মি দুনিয়ার সম্রাজ্ঞী। ব্রাহ্ম সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা নারী মুসলিম ঘরানায় কিভাবে খাপ খাওয়াচ্ছেন নিজেকে? সম্প্রতি টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়াতে নেওয়া ব্যক্তিগত কথাবার্তার মধ্য দিয়ে 'আলোকপাত'-এর প্রতিনিধি কমলকুমার ঘোষ তুলে ধরেছেন শর্মিলা ঠাকুরের দুই দুনিয়ার অজানা উপাখ্যান।

আলোকচিত্র:
কমল কুমার ঘোষ

মানিককাকু সেদিন রীতিমত চমকে দিয়েছিলেন রিংকুকে। শুধু রিংকুকে কেন বাড়ির সবাইকে। এমন কি আত্মীয়স্বজনদেরও। রিংকু তো প্রথমটায় বিশ্বাসই করেনি।

পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে তিন মেয়ে। টিংকু, পিংকু, রিংকু। পাড়ার কাউকেই তোয়াক্কা করে। টিংকু পিংকু তবু বকাঝকা খেয়ে মা'র কথা মেনে নেয় মাঝে মাঝে। রিংকুর সে সবের বালাই নেই। বাড়ির বড় মেয়ে বলে কথা। তা আবার সুযোগ বুঝে বাবাকেও হাত করে নিয়েছে। বোনেরা মা-বাবার থেকে বকুনি, মাঝে মাঝে টুকটাক চড়চাপড়ও খায়। কিন্তু রিংকুর ক্ষেত্রে তা হওয়ার উপায় নেই। রিংকুর আবার বাবার অফিস তাকে ভর্তি করিয়েছেন সি এল টি-তে। মেয়ের অভিনয়ের ট্যালেন্ট দেখে। ক'দিন যেতে না যেতেই রিংকুর বিরাট পসার। দু'দিনেই সব নাটকের মধ্যমণি বাবার আদরের সেই ছোট্ট রিংকু। বই পড়ায় তার আগ্রহ হত না শুধু কখন মহড়ায় যাবে তারই তাড়াহুড়ো। চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটার গ্রুপ রক্ষণশীল ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল থেকে বাংলার অভিনয় জগতে উপহার দিল একটি শক্তিময়ী নামঃ শর্মিলা ঠাকুর দর্শকের মুখে মুখে শুধু শর্মিলা আর শর্মিলা। কাগজে কাগজে শর্মিলার নাম, ছবি এবং প্রশংসা।

সেদিন বাড়িতে এলেন মানিককাকু প্রায়ই আসেন ওদের বাড়িতে পারিবারিক সত্রে মানিক-

শিখর ছুঁয়ে আসা শর্মিলার চোখে আজ কিসের সংশয়!

ফেরার পর কোলে লাফিয়ে ওঠে গলা জড়িয়ে চুমু না খেলেই নয়। গীতিন্দ্রনাথের বড় মেয়ের এ আব্দার না মেনে নিয়ে উপায় ছিল না।

দুরন্ত রিংকুকে বাবা সত্যি বেশি ভালোবাসেন। ছোট্ট বয়স রিংকুর। কিন্তু কেমন চনমনে। চোখ দুটো থেকে বুদ্ধির আলো ছড়িয়ে পড়ে। পিংকু, টিংকু কিন্তু এতটা প্রাণচঞ্চল নয়। ব্যস্ততার মধ্যেও এসব ঠিক নজর করেন গীতিন্দ্রনাথ। ইণ্ডিয়ান অকসিজেনের অফিস ফেরতা গীতিন্দ্রনাথ তাই বাড়ির সময়টুকুর অধিকাংশ রিংকুর জন্যই বরাদ্দ রাখেন।

বয়স পা ফেলে আসছিল। আর তাকে ছুঁয়েই বেড়ে উঠছিল রিংকুর শরীর। ইতিমধ্যে বাবা কাকু অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়ের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠতা গীতিন্দ্রনাথের। ইতিমধ্যে মানিকবাবুর 'পথের পাঁচালী' আর 'অপরাজিত' ক্ল্যাসিক চলচ্চিত্রের বাজারে ঝড় তুলেছে। ঘুরিয়ে দিয়েছে বাংলা ছবির মোড়। সত্যজিৎ তখন 'অপুর সংসার' ছবি করার ভাবনায় বিভোর। নায়িকা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎই বিভূতিভূষণের তালুক মুলুক খুঁজে বেড়ান 'অপর্ণা' হয়ে গেল ঠাকুর পরিবারের উচ্ছল রিংকু-শর্মিলা। রিংকু তখনও জানত না মানিককাকু তার জন্য এত বড় বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তখন তার বয়স মাত্র তেরো। সেই শুরু। পরে পরেই কাজ পেল তপন সিংহ ও পার্থপ্রতিম চৌধুরীর ছবিতে। হাতে ধরে অভিনয় শেখালেন তাঁরা। শেখালেন মহা শিল্পী সত্যজিৎ-ও। নিজের হাতে গড়লেন তাকে, আর তাকেই পুঁজি করে রূপালী পর্দায় রানী হয়ে গেল ঠাকুর পরিবারের আদরের রিংকু। ওরফে শর্মিলা ঠাকুর।

কাজ আর কাজ। অভিনয় শুধু অভিনয়। এর বাইরে কিছুই জানে না শর্মিলা। জানার অবকাশ নেই। সত্যজিতের মানসপুত্রী শর্মিলা এখন তৈরি করে নিয়েছে নিজেকে। নিখুঁত। তাঁর কাজের নিপুণতায় চারদিক থেকে ছবির অফার আসছে। অফার এল বোম্বে থেকে। এক সোনালী সকালে শর্মিলা উড়ে গেল বোম্বে। হয়ে গেল হিন্দি ফিল্মের অদ্বিতীয়া নায়িকা, বক্স্ ভ্যালু, গ্ল্যামার, জৌলুষ-কি নেই তার। কি রেপুটেশন'

সইফি সব পনেরো বছরের ছেলে এখন। কিন্তু ব্যাট নিয়ে যখন ক্রিজে দাঁড়ায় তখন কেউ বলবে না কমপক্ষে দশ বছর এর হাতে ব্যাট নেই। একেবারে পেশাদারি ভঙ্গিমা তার। দারুণ নেশা ক্রিকেটে ঠিক বাবার মত। বাবা মা-ও সমান খুশি তাঁদের সমান উৎসাহ এতে। ছেলের তো ক্রিকেট নেশা থাকবেই। এটাই স্বাভাবিক। বাপ কা বেটা। শর্মিলা আর মনসুর ছেলেকে দেখেন আর প্রাণ খুলে হাসেন। মনসুরের পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে একে একে। ছেলের মধ্যেই নিজেকে দেখেন। খুদে সইফির আবার গাভাসকারের ছেলের সাথে দারুণ বন্ধুত্ব।

ছেলেকে একেবারে বাবার ভঙ্গিতে দেখলে শর্মিলার সেই সোনালী দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। ইডেনের শিশির ভেজা সবুজ মাঠে গড়িয়ে যাওয়া উজ্জ্বল দিনগুলো। ক্রিকেট একেবারে আবশ্যিক ফ্যাসান তখন হাই সোসাইটির যুবতী মেয়েদের কাছে। তাঁর কাছে তো বটেই। যে কোন মূল্যেই হাজির হতে হবে মাঠে। রাজকীয় চেহারার ফর্সা 'প্যাট' তখন ক্যাপ্টেন ভারতীয় ক্রিকেটের। টাইগার 'প্যাট'। মাঠের পয়লা নম্বর হিরো। সপাটে ছক্কা আর লং-এ ফিল্ডিং, সাথে তুমুল রঙ্গ রসিকতা মিলিয়ে মনসুর তখন শুধুমাত্র মাঠের নয় শর্মিলারও মনের রাজা। মাঝে সাঝে বাউণ্ডারির সীমানা ধরে ফিল্ডিং করতে করতে হাতের বদলে অকারণে মাথায় টুপি দিয়ে বল ধরার চেষ্টা এবং মিস্ করার ফাঁকে অথবা ভি. আই. পি. বক্সে বসে খেলা দেখতে দেখতে মনসুর চতুর চোখে ঠিক মেপে নিতেন শর্মিলার পেটা গড়ন আর গালের টোল পড়া হাসি। শর্মিলা তো বেশ জানেন বাজারে তাঁর গালে এই ঝকমকানো টোলের কি কদর! যার বলে বাঘা পতৌদি শর্মিলার একটি মাত্র গুগলিতেই ক্লিন বোল্ড। আর রূপালি পর্দার শর্মিলা ঠাকুর, বাবা-মার আদরের রিংকু, বদলে হয়ে গেলেন বেগম আয়েসা সুলতানা।

ঠিক ষোল বছর হল। বিয়ে হয়েছে পতৌদি আর শর্মিলার। কারোরই মত ছিল না এ বিয়েতে। বাবা-মার তো ছিলই না। এমন কি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদেরও না। কেউ চান না ব্রাহ্মসমাজ থেকে সে মুসলিম হয়ে যাক। শর্মিলার জন্য মুখ দেখান ভার হবে। এতদিনের ঐতিহ্য, রুচিতে বাধবে। ঠাকুর পরিবারের দুর্নাম হবে। আরও কত। সব সময় বোঝান হল শর্মিলাকে।

একেবারে পাখিপড়া করান হল। তবু কোন-মতেই কিছু হল না। মনসুরের টকটকে রঙ, সুঠাম চেহারা আর খেলার মুন্সিয়ানায় শর্মিলা আচ্ছন্ন তখন। সিদ্ধান্ত বদলাবার নয়। দুই জগতের মধ্যে নিখুঁত গড়ে গেল মেলবন্ধন। বড় মেয়ে সাত বছরের সাবাকে হোমটাস্ক করাতে বসলে মনে পড়ে শর্মিলার। সেই ঠাকুর বাড়ির আবহাওয়া। পড়াশুনা। পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে পড়ার ঘর। মায়ের তীক্ষ্ণ নজর, বাধা নিষেধ। বাবার অফুরান ভালবাসা। অনেকখানি পক্ষপাতদুষ্ট বললেও ভুল হবে না। একথা আজও সত্যি শর্মিলার এসব ওজর আপত্তি বাবার কাছেই। পিতৃভক্তা মেয়ের সব সময় বাবার কাছে কাছে ঘোরা। থিয়েটার, অভিনয় তার উপর আবার ইডেনের ক্রিকেট মরশুমের একটা বিরাট আকর্ষণ।

কাজের লোককে গাছকোমর করে নির্দেশ দিতে দিতে এখন অনেক সময় কেটে যায় শর্মিলার। ছেলেমেয়েদের পোশাক আশাক গোছগাছ করা, বইপত্তর-বক্স সাজিয়ে দেওয়া, টিফিন বানানো খাওয়া দাওয়া মিলিয়ে শর্মিলাকে এখন মস্ত গৃহিণী হতে হয়েছে। বাইরে বেরোনর ফুরসৎ নেই হাতে। ছেলে মেয়ের বায়নাক্কা মেটাতেই হাতে সময় কুলোয় না। অবশ্য এসব ভীষণ ভালো লাগে শর্মিলার। একেবারে গিন্নিটি। কিন্তু বোম্বের রূপালী পর্দার সেই শর্মিলার সাথে মেলান যায় না।

বাংলার মাটি থেকে বোম্বের বাজারে শর্মিলার অন্য ইমেজ। ঠাকুর পরিবারের মেয়ে রিংকুর বুক থেকে শাড়ির আঁচল খসে পড়ল। একে একে খুলে পড়ল বাঙালির সাজ। শরীরে উঠল হট প্যান্ট, বিকিনি, ক্যাবারে ড্যান্সারের কসটিউম আর এমনতর পোশাক যাতে যৌবনকে অনাবৃত করে দেখান হয়। নামের জন্য এসব তেমন কোন বাধাই ছিল না শর্মিলার। যুবকদের কাছে সেক্সি আর সুইটি শর্মিলার কি কদর!

'কাশ্মীর কি কলি', 'অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস' করে বাজারে কি রমরমা। বক্স বলল: সেক্স-বম্ব। 'ছায়াসূর্য', 'শুভা', 'অপুর সংসার' এর চাইতে দর্শকের কাছে তখন তাঁর নতুন সাফল্য। কারণ সিগ্রেট আর হট ড্রিংকসে শর্মিলা তখন 'অপর্ণা' কিংবা 'শুভা' ছিলেন না আর। চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে নতুন জেল্লা। নতুন ইমেজ। নতুন গ্ল্যামা-রের নেশা।

টেবিলে সাহেবী খাবার সাজাতে সাজাতে আজও মা'র কথা মনে পড়ে শর্মিলার। মা নিখুঁত নজর করতেন মেয়েকে। মেয়ে কি খেতে ভাল-বাসে, কি খেতে চায় না-সব কিছু। যেমন শর্মিলা নিজে আজ 'সইফি' 'সাবা' আর 'সেহার' দেখা-শোনা করেন। নতুন নতুন খাবার তুলে দেন আলি মনসুরের প্লেটে তবু মায়ের রান্নার কথা ভুলতে পারেন না। মাঝে মাঝে এ বাড়ির খাবারও বিস্বাদ ঠেকে জিভে। ভুলতে পারে না মানিক-কাকুর কাছে 'অপুর সংসার'-এর অপ্রত্যাশিত অফার আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রেপুটেশন। কিংবা হাতে-কলমে ফিল্ম অভিনয় শেখার স্বপ্নময় দিন-গুলো অথবা পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরীর সাথে অল্প বয়সে আবেগী অ্যাফেয়ার্স। মানিক কাকুর কথায় ফিল্মে এসেছিলেন কিন্তু ফিল্মে অভিনয়ের পেশাই যে বেছে নেবেন এমন সিদ্ধান্ত ছিল না। প্যাটের কিন্তু কোন বিধি নিষেধ নেই শর্মিলার উপর বরং দারুণ উৎসাহ!

শর্মিলা আজ নবাব বেগম আয়েসা, তবু সেই বাঙালি গৃহিণীর মনোভাব আজও ছাড়তে পারেন নি। রোজরাতে স্বামীর উপস্থিতি চান। কিন্তু পেশাগত কারণে হয়ে ওঠে না। বুদ্ধিমতী শর্মিলাকে কৌশলের ছলনা নিয়ে বলতে হয় 'প্যাট'-এর সাথে তার দারুণ অ্যাডজাস্টমেন্ট। উইক এণ্ডে দেখা হলেও কোন ভুল বোঝাবুঝি নেই তাঁদের মধ্যে। মনে হয় এমন যুক্তিটা শর্মিলাকেই খাড়া করে নিতে হয়েছে। অন্য উপায় নেই বলেই। তবে ঠাকুরবাড়ির সেই চিরাচরিত রীতিটা শর্মি-লার বড় পছন্দের।

ছেলেমেয়েদের কাছে কাছে থাকার জন্য ছবির কাজ কমিয়ে ফেলতে হয়েছে শর্মিলাকে। এসময় মায়ের অভাব ছেলেদের উপর ভীষণ প্রভাব ফেলে। শর্মিলা জানেন। আরও জানেন কমবয়সে মা ছেলেদের কাছে কাছে না থাকলে ছেলেরাও তেমন কাছে আসতে পারে না। মেয়েদের অঢেল স্বাধীনতা দিয়েছেন শর্মিলা। তাদের আধুনিকা করে তৈরি করছেন। তারা বড় হয়ে ফিল্মে অভিনয় করতে চাইলে আপত্তি নেই তাঁর।

চল্লিশটা বছর গড়িয়ে গেছে। শর্মিলার সে বক্স ভ্যালু নেই বোম্বাই ফিল্মে। শর্মিলা বেশ বোঝেন। তবু গা ঢাকতে পারিবারিক ব্যস্ততার প্রশ্ন তোলেন। হয়ত বা কিছুটা সত্যি কিন্তু তা পুরোপুরি বলে মানা শক্ত।

আর্থিক নিরাপত্তা বিষয়ে সংশয় ছিল না শর্মিলার। নেইও। কিন্তু মাঝে কতদিন একরকম নীরব ছিলেন বলতে গেলে কিন্তু ঘর আঁকড়ে শর্মিলার চলা কঠিন, একেবারে চরিত্রবিরোধী। বছর দুই হল টালিগঞ্জের ক্লাবে তাকে দেখা যায় মাঝে মাঝে। 'প্রতিদান' এ শর্মিলাকে অনেক কাছে পেয়েছে বাঙালি চলচ্চিত্র প্রেমিকরা। আগামী ছবিগুলোতে আবার কেমন পায় তারই প্রত্যাশা। তবে শর্মিলা হিন্দি ছবির বিষয়ে সচেতন হয়েই বোধহয়, বাংলা ছবির দিকে ফিরেছেন। যদিও মুখে বলেন—বাংলা মাতৃভাষা, অন্য ভাষার চাইতে বাংলা ভাষায় অভিনয় করে বেশি আনন্দ পাই।

তবু মনসুর আলির ক্রিকেটের জগত আর নিজের চলচ্চিত্র জগত, পিছনে ফেলে আসা ঠাকুর বাড়ির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং তার সাথে সইফি, সারা আর সেহার সংসার, সিদ্ধ হাতে সামাল দিয়ে কি এক রিক্ততা শর্মিলাকে কেমন যেন উদাস করে দেয়। একটাই প্রশ্ন কি এক অপ্রাপ্তি, কি এক শূন্যতা অথবা পুরোনো স্মৃতির স্তিমিত ঝড় তুফান—শুধু কি এটুকুই চাওয়ার ছিল, না অন্য আরও কিছু!

শর্মিলা, এখন বেগম আয়েষা : স্বামী মনসুর আলি খাঁ পতৌদির সঙ্গে

পৃষ্ঠার পর

[illegible]য়েছিলেন :) 'ইভেন [illegible] [illegible] অন [illegible] ভার্জ অফ স্টার্টিং ক[illegible] [illegible] উপরিউক্ত আবেদন-[illegible]লির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র রায় সংবিধানের ৩০ নং ধারা যা সংখ্যালঘু ধর্মীয় সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই ধারা ভোগ করার অধিকার রামকৃষ্ণ মিশনকে দেন এক নাতিদীর্ঘ ঐতিহাসিক রায়ে। এরপর মামলাটি যায় হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ এবং আরও পরে সুপ্রীম কোর্টে।

রামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষিত ভক্তদের বক্তব্য কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। মোদনীপুরের প্রাক্তন সংসদ সদস্য সুধীর ঘোষাল স্বামী শংকরানন্দের দীক্ষিত। রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দু কিনা এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন বেলুড় মঠে মিশনের সহসভাপতি সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বামীজী ভরত মহারাজের কক্ষের প্রবেশ পথের দরজায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি-ষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের ছবির নিচে স্পষ্ট লেখা আছে 'দ্য হিন্দু মংক'। তাছাড়া মার্কিন মুলুকে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামীজী হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবেই বক্তব্য রেখেছিলেন। আমার গুরুদেব আমাকে যা মন্ত্র দিয়েছেন, তাও হিন্দু ধর্মানুযায়ী। এক্ষেত্রে আমাদের যদি অ-হিন্দু হতে হয় তাহলে বেদনা ও ব্যর্থতার সীমা থাকবে না।

দক্ষিণ কলকাতার ঠাকুরপুকুর এলাকার অর-বিন্দ নগরের বাসিন্দা প্রাবন্ধিক অমলেন্দু বিশ্বাস বলেন শ্রী রামকৃষ্ণ সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়ে গেছেন, একথা সত্যি। তাঁর 'যত মত তত পথ' সেই শিক্ষারই তাৎপর্য বহন করে। কিন্তু তিনি নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান হতেও বলেছিলেন। শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত ৫ম ভাগে

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী গম্ভীরানন্দ
ছবি : পার্থ সারথি

রামকৃষ্ণ অনুরাগিনী মঞ্জু রাহা
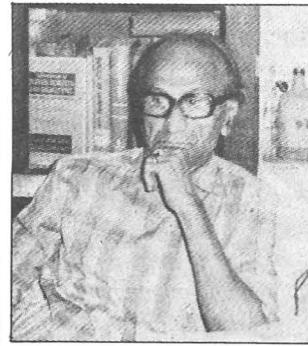
ধ্রুব মুখোপাধ্যায়
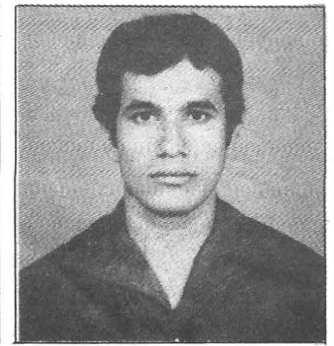
অমলেন্দু বিশ্বাস

তাঁর বাণীর মধ্যে দেখতে পাই, স্ত্রী যে স্বামীর সেবা করে সেও নিষ্ঠাভক্তি দিয়ে দেবর–ভাসুরকে খাওয়ায়, পা ধোয়ার জল দেয়। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ। সেই রূপ নিজ ধর্মতেও নিষ্টা হতে পারে। শ্রী রামকৃষ্ণ হিন্দুর ঘরেই জন্মেছিলেন। তার বাবা ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ঠাকুর-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠাকুরের ডাক নামও ছিল হিন্দু দেবতার নামে গদাধর। তাঁর রামকৃষ্ণ মহানামের অর্থও হল রাম ও কৃষ্ণ দুই শক্তি ও ভক্তির দেবের মিলন। এ দুজনই হিন্দুর দেবতা। তাছাড়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ হিন্দুদেবী মা কালির উপাসক এবং পূজারী ছিলেন।

নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরের কাশ্যপ-পাড়ার রামকৃষ্ণ মিশন দীক্ষিত সুবল মুখার্জি প্রশ্ন তুললেন : রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দু নয় জেনে আমি অতিমাত্রায় দুঃখিত এবং মর্মাহত হয়েছি। আমি তো মিশনের স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নিয়েছি, তাহলে মিশনের সাধুদের নিছক সুবিধাভোগের স্বার্থে আমাকে অহিন্দু হয়ে যেতে হল ? এ দুঃখ রাখার আমার জায়গা কই ?"

পক্ষান্তরে রামকৃষ্ণ মিশনের কালচারাল ইন-স্টিটিউটের প্রধান স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ওরফে কানাই মহারাজ বলেন, আমরা স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত রামকৃষ্ণদেবের বেদান্ত ধর্মের অনুসারী। সেটা সেবা ও মানব ধর্মের পরিচয়। কোন সং-কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে মিশন আবদ্ধ থাকতে পারে না। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্রে স্বামী বিবেকা-নন্দ বলেছেন

স্থাপকায়স্য ধর্মস্য সর্ব ধর্ম স্বরূপিনে
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণয়তে নমো।

তিনি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের জন্য আবির্ভূত হয়ে-ছিলেন। তাই সর্ব ধর্ম এক করলে যা দাঁড়ায় তা 'মানব ধর্ম'। আমরা সেই বৃহত্তর ও মানব ধর্মের উত্তরসাধক। কানাই মহারাজ ওই বিতর্কে ভাসা ভাসা কিছু বললেও বর্ষীয়ান রামকৃষ্ণ আন্দো-লনের নেতা ভরত মহারাজ মুখ খুলতে রাজি নন। তাঁর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে যা বলার প্রেসিডেন্ট মহারাজ বলবেন।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী ধ্রুব মুখোপাধ্যায় বলেন শুধু রামকৃষ্ণ মিশন নামিত একটি রেজিস্টার্ড সোসাইটির বক্তব্য শুনে সকল রামকৃষ্ণ ভক্তের ধর্মপরিচয় চিহ্নিত করা কোন আদালতের পক্ষে সমীচীন নয়, সম্ভবও নয়। বর্তমান রায়টি দুটি বিবাদমান পক্ষে পার্থিব অধিকারের বিষয়ে সীমিত। এবং শুধুমাত্র ওই দুই পক্ষের উপরেই সম্ভবত প্রযোজ্য। তবে হাই-কোর্টের ওই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সকল রামকৃষ্ণ ভক্তরাই অহিন্দু এ ধারণা ভ্রান্ত। কেননা রায়টি জাজমেন্ট ইন পার্সোনেম কিন্তু জাজমেন্ট ইন রেইন অর্থাৎ সর্বজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এমন কি রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত অন্য শিক্ষালয় যথা নরেন্দ্রপুর, বেলুড় বিদ্যামন্দির, শিক্ষণ মন্দি-রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই কথা বলেছেন। আইনের জগতে একটি মৌল নীতি সর্ব দেশে স্বীকৃত, ল্যাটিন ভাষায় একে বলে অডিয়ালতেরেম পেরতেম নীতি, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি্র বা জনসমষ্টির বা সংস্থার উপর বাধ্যকর কোন রায় দেবার আগে সেই ব্যক্তি বা জন সমষ্টি বা সংস্থার বক্তব্য শুনতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশনে রেজিস্টার্ডে সোসা-ইটির সভ্যসংখ্যা ৫০০ র বেশি নয়। ওই সোসা-ইটির বাইরে শত শত সংস্থা ও লক্ষ লক্ষ রাম-কৃষ্ণ ভক্ত আছেন যারা শ্রী রামকৃষ্ণের বাণীকে সনাতন ধর্মের প্রমাণ ও প্রতিভূ বলে মেনে নিয়ে-ছেন। তারা সকলেই নিষ্ঠাবান হিন্দু। এবং যেহেতু হাইকোর্ট এই সব ভক্তদের কথা শোনেন নি, তাই এই রায়ও তাদের উপর প্রযোজ্য নয়।'

আসলে হিন্দুত্বের কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা আমাদের ধর্মশাস্ত্রে নেই। বেদ, উপনিষদ, শ্রী ভাগবত গীতাতে হিন্দুধর্মের কোন উল্লেখ নেই। আছে আর্যধর্ম বা সনাতন ধর্মের কথা। গ্রীক এবং পারসিক আক্রমণকারীরা সিন্ধু নদের পূর্বদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের তাবৎ অধিবাসীদের হিন্দু বলত। কারণ, আক্রমণকারীরা 'স'কে 'হ'বলত। গ্রীক আক্রমণের পরবর্তী সময় থেকে সনাতন ধর্ম হিন্দু ধর্ম বলে পরিচিতি লাভ করে। স্বামী বিবে-কানন্দ বলেছেন শ্রী রামকৃষ্ণের জীবন এক অস্বাভাবিক সন্ধানী আলোকরশ্মি–যার প্রভায় সমগ্র হিন্দুধর্মের ব্যাপ্তি ও প্রসার এ কথা বলা যায়।

রামকৃষ্ণ মিশনের হায়দ্রাবাদ শাখার অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ তাঁর 'রিলিজিয়ানস্ ইউনিভার্সা-লিজম' প্রবন্ধে বলেছেন, 'একক অস্তিত্বের শিক্ষা দেয় বেদান্ত। তাই ঋকবেদের বল্লীতে বলা আছে :
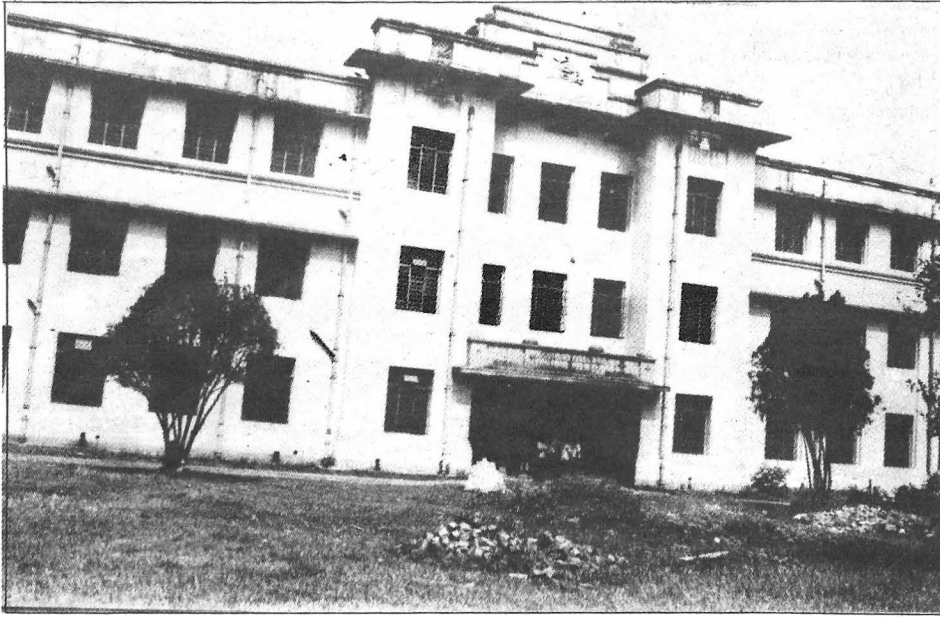
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ, রহড়া ছবি : বিকাশ চক্রবর্তী

'একম সৎ বিপ্রা, বহুধা বদন্তি।' ওই প্রবন্ধে স্বামী রঙ্গনাথন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে বেদান্ত দর্শনের তথা সর্বব্যাপী হিন্দু ধর্মের প্রাণ-পুরুষ বলে ঘোষণা করেছেন।

এমন কি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নামের মধ্যেই হিন্দু ধর্মের পরমহংস হওয়া এবং অবতার হওয়ার কথা নিহিত।

১০ ডিসেম্বর মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট তার অন্তর্বর্তী রায়ে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেন্‌চ এবং বিচারপতি বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের ঐতিহাসিক আদেশকেই সমর্থন করেছেন। প্রধান বিচারপতি পি.এন. ভগবতীর নেতৃত্বে সর্বশ্রী ভি. পি. মদন এবং জি.এল. ওঝা সমন্বিত তিন বিচারকের অন্তর্বর্তী রায়ে বলা হয়েছে 'রামকৃষ্ণ মিশন কলেজ চালাবেন নিজস্ব গঠন তন্ত্র অনুযায়ী। নতুন লোক নিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশ্লিষ্ট আইন মেনে চলার দরকার নেই। বরং কলেজ কর্তৃপক্ষ যদি লোক নিয়োগ করেন সেক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয় টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে হবে।' মামলা এখন চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা করছে এবং সুপ্রীম কোর্টের রায় মোতাবেক পরিচালন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রায়ের পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

মহামান্য আদালতের চৌহদ্দি পেরিয়ে 'রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দু না অহিন্দু' বিতর্কটি এখন প্রচণ্ড আবেগময় অবস্থার মধ্যে সাধারণ মানুষের মনোজগতে আলোড়ন তুলেছে। রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষায়তনগুলি ভারতের গর্ব। সেখানে দীর্ঘদিন ধরেই তথাকথিত বামপন্থী হানাদারদের দখল-দারি কব্জা করার লক্ষ্য। কিন্তু শিক্ষায়তনে প্রাসঙ্গিক স্বার্থরক্ষার পরেও বৃহত্তর জনমানসের ধর্মবোধ ও ভালবাসার কথা মনে রাখা উচিত।

হিতেশের মৃত্যুতে যুদ্ধ নতজানু

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারত ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। এদিন ঢাকায়, বিকেল ৪.৩১ মিনিটে পাক সেনাধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল নিয়াজী এবং তার দলবল ভারতের ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং ইন চিফ লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে অস্ত্র-শস্ত্র সহ আত্মসমর্পন করলেন।

লেঃ জেনারেল অরোরার সঙ্গী ছিলেন সেদিন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাউন্টেন ডিভিশনের মেজর জেনারেল জি. নাগরা। ভারতীয় সৈন্য দলের জওয়ান এবং অফিসারদের মধ্যে সেদিন বাঁধ ভাঙা আনন্দের উচ্ছলতা। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষজনের চোখে ভারতীয় সৈন্য বাহিনী তখন মহান পরিত্রাতা এবং নায়কের ভূমিকায়। ঢাকার রাস্তা তখন স্থানীয় জনতার বাঁধভাঙা খুশি এবং আনন্দের জোয়ারে উত্তাল। জনতা নামছে মুক্তির আবেশে। বিবর্ণ, ধুলি ধূসরিত পোষাকে মুক্তিবাহিনীর সভ্যেরা উন্মত্ত খুশিতে আকাশের দিকে তাক করে রাইফেলের গুলি ছুঁড়তে লাগল। মহিলা এবং পুরুষেরা, তাঁদের পরিবারের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং মৃত্যু সত্ত্বেও স্বাধীনতার আবেশে, আনন্দের জোয়ারে ভাসলেন, যদিও এর পেছনে রয়ে গেছে অনেক অশ্রু, ঘাম আর রক্ত।

চারদিকের এত উচ্ছাস এবং বাঁধভাঙ্গা আনন্দের মধ্যে মেজর জে. নাগরাকে যদিও ব্যথিত নিরুত্তাপ মনে হচ্ছিল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার মধ্যে একটা অস্থিরতা কাজ করে যাচ্ছিল। তাঁর এ. ডি. সি. (ব্যক্তিগত রক্ষী) ক্যাপ্টেন হিতেশ মেহতা কোথায় গেলেন? তিনি তো কয়েক ঘন্টা আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কাজে গেছেন। এবং অনেক আগেই তাঁর ফিরে আসা উচিত ছিল। সৈন্যদের মধ্যে তিনি খুঁজলেন, যদি এর মধ্যে কোথাও থেকে থাকে হিতেশ। না, হিতেশের কোন চিহ্নই সেখানে নেই। অঘটনের সম্ভাবনায় তার বুক কেঁপে উঠলো। তারপর কিন্তু তিনি কর্তব্যনিষ্ঠ সৈনিকের মতই সেই মুহূর্তের কাজের জন্য তৈরি হলেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের জন্য অনেক আয়োজন বাকী আছে। সমস্ত কিছুকেই সুষ্ঠুভাবে চালাতে হবে। পরাজিত অথচ পদস্থ অফিসারদের প্রতি তাদের প্রাপ্য সৌজন্যের ব্যবস্থা করতে হবে

সেটা ছিল এক অসাধারণ অনুষ্ঠান। সে মুহূর্তে খুব কম লোকই হিতেশকে নিয়ে ভাববার মত অবস্থায় ছিল। হিতেশের কথা ভাবছিলেন মেজর জেনারেল নাগরা, কয়েকজন অফিসার

ক্যাপটেন হিতেশ মেহতা

দক্ষিণ দিল্লির মালব্য নগরে রয়েছে হিতেশ মেহতা পার্ক। এই পার্কে বসে আজো সকলেই শ্রদ্ধায় স্মরণ করে সেই পরম সাহসী এবং দেশহিতৈষী ক্যাপ্টেন হিতেশ মেহতার নাম। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর যখন ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে ঢাকায় আত্মসমর্পণ করছেন পাকিস্তানী সৈন্যাধ্যক্ষ, তখন বাংলা দেশের অন্য এক প্রান্তে বহমান যুদ্ধকে থামাতে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন মেহতা। নিজের মৃত্যুর বিনিময়ে তিনি থামিয়েও ছিলেন এই আগ্রাসী যুদ্ধ। সেই পটভূমিকায় যোগেন্দ্র বালীর এই প্রতিবেদন।

এবং হিতেশের জনকয় সামরিকবাহিনীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধব। কেবল মাত্র তাঁরাই জানতেন পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণে হিতেশ কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, আত্মসমর্পন সত্ত্বেও ঢাকার কয়েক মাইল দূরে যে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে, সে লড়াই থামাতে হিতেশ কি মহান ভূমিকা পালন করেছেন, মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে

সেই রাতেই অবসরপ্রাপ্ত সুবাদার কিষেণ গোপাল মেহতা, এক সময়ে যিনি ... মিকিন্স-এর সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন, হিমাচল প্রদেশের সোলানে তাঁর রোজকার সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, তিনি নিজে ছিলেন গোর্খা রেজিমেন্টের প্রাক্তন অফিসার এবং হিতেশের বাবা। তিনি সোলানে সিভিল ডিফেন্সের কাজও দেখাশোনা করতেন। যুদ্ধের সময় সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে তাঁকেই সরকার বেশী করে চাইছিলেন। লোকে জানতো, তাঁর ছেলে মেজর জেনারেল নাগরার এ. ডি. সি., যাঁর অধীনস্থ সেনাদল বাংলাদেশে যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে সামনের সারিতে লড়াই করছে। সোলানের মানুষজন যুদ্ধের টাটকা খবরের জন্য মেজর কিষেণ গোপালের কাছে আসতেন।

একদিন তিনি পাহাড়ি রাস্তায় সন্ধ্যেবেলায় হাঁটছিলেন, এমন সময় একটি বাচ্চা মেয়ে দৌড়ে এল, বলল, "কাকু মা বলেছে তুমি আমাদের বাড়ীতে এসে চা খেতে খেতে যুদ্ধের গল্প বলবে।"

মেজর মৃদু হেসে বললেন, "সোনামনি চা তো এখন আমার খেতে একটুও ইচ্ছে করছে না। মাকে বল আমাদের সৈন্যরা দারুণ লড়াই করছে। শত্রুরা খুব শিগ্গীরই আত্মসমর্পণ করবে। আমি তোমাদের বাড়িতে না হয় অন্য সময় যাবো।"

কয়েক মিনিট পরেই তাকে অন্য এক বাড়িতে প্রায় টেনে আনা হলো, তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু বসবার ঘরে পা দিয়েই এক অদ্ভুত অনুভূতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। কাঁপতে কাঁপতে তিনি একটা চেয়ারে প্রায় বাধ্য হয়েই বসে পড়লেন। উৎকণ্ঠায় তার চোখমুখ বিবর্ণ হয়ে এসেছে। গৃহকর্ত্রী তাঁকে এক কাপ চা দিতে চাইলে, তিনি মৃদুভাবে তা প্রত্যাখান করলেন। বললেন, "আমার এখন চা খেতে ইচ্ছে করছে না। একটা আশ্চর্য কিছু আমার ওপর যেন ভর করেছে। আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।"

ফ্রিজ থেকে বার করে মহিলা তাঁকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা আপেলের রস দিতে চাইলেন। এক চুমুকে তিনি সেই গ্লাস খালি করে একটু সুস্থ হলেন। তারপর প্রতিদিনের মতই এসে গেল যুদ্ধের কথা, পাকিস্তানী সৈন্যদের বাংলাদেশে

আত্মসমর্পণের কথা। হিতেশ যে ভারতীয় সেনাদলের ঐতিহাসিক জয়ের মুহূর্তে, পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের সময় ভারতীয় দলে উপস্থিত, এতে সবাই আরো বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। সৈনিক পুত্রের জন্য গর্বে মেজর মেহতার বুক ফুলে উঠল। ঠিক সেই সময়ই, তাঁর মনে হ'ল অনির্দ্দেশ্য কি এক অনুভূতি যেন তাঁর ভিতরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কয়েক মিনিট পরেই তিনি ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে এলেন। তারপর থেকেই নীরবে তিনি তার সন্তানের নিরাপত্তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

পরের দিন সকালে, সমস্ত খবর কাগজ গুলোতেই ঢাকার সেই ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণের খবর ফলাও করে ছাপা হলো। সবাই আনন্দে এমন কি আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের সময়ও একদিনে দুবার পাল্টেছিল। সকাল ন'টা থেকে বিকেল চারটে, তারপর বিকেল চারটে একত্রিশে শুরু হয়েছিল অনুষ্ঠান। মেজর জেনারেল নাগরা অবশ্য জানতেন না, আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের এক মিনিট আগে তাঁর এ.ডি.সি. অন্য একজন যুবক অফিসারের সঙ্গে এক মরণপণ যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ১৭ ডিসেম্বর বিকেলে মেজর জেনারেল নাগরা ক্যাপটেন হিতেশ মেহতার খবর পেলেন। তাঁর মৃতদেহ অন্য আর একজন পাকিস্তানী সেনা অফিসারের মৃত দেহের পাশেই পাওয়া গেল, ঢাকা থেকে ১০ কি.মি. দূরে।

খবরটি জেনারেলকে মারত্মকভাবে শোকাহত করলো। এ যে অবিশ্বাস্য! তিনি হিতেশকে

১৬ ডিসেম্বর সকাল আটটার মধ্যেও এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া গেল না যা থেকে বোঝা যায় পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছুক। লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী জানতেন যে তার সৈন্যরা ফাঁদে পড়েছে। কিন্তু কোন সেনাধ্যক্ষর জীবনে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেওয়া ভীষণ কঠিন। কোন সেনাধ্যক্ষই চান না, শুধু শুধু তার দলকে পরাজিত হতে দিতে। কিন্তু কখনো কখনো সেনা বাহিনীর জওয়ানদের বাঁচাতে কমাণ্ডারকে তার নিজের গর্ব এবং সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হয়। নিয়াজীর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আত্মসমর্পণ করবো কি করবো না, কেবল মাত্র এই সিদ্ধান্তের উপর আশি হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের জীবন নির্ভর করছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর

জেনারেল বেয়ুরের হাত থেকে ক্যাপটেন হিতেশ মেহতার মরণোত্তর সেনা পদক নিচ্ছেন হিতেশের বাবা সুবাদার কিষেণ গোপাল মেহতা
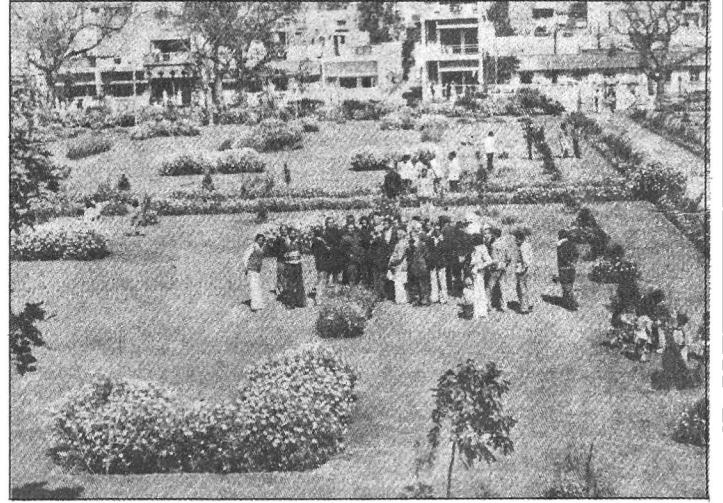
দক্ষিণ দিল্লির মালব্য নগরে হিতেশ মেহতা পার্ক

আত্মহারা। কিন্তু সুবেদার মেহেতাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছিল। খবরের কাগজে ছাপা সেই আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানের যাবতীয় ছবির উপর দিয়ে তিনি সযত্নে চোখ বুলিয়ে গেলেন। মে: জেনারেল নাগরার ছবি খুব বড় করেই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু কোথায় তার এ.ডি.সি? তার তো কমাণ্ডারের ডানদিকেই থাকার কথা, কিন্তু ছবিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না!

অনিবার্যভাবেই তাঁর মনে সেই চরম চিন্তা উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকলো। কিন্তু তিনি সে চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে চাইলেন। এবার তো যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে; ছেলেকে খুঁজে বার করার জন্য তিনি কাছাকাছি কর্মরত এক সিনিয়র অফিসারকে ফোন করলেন, তাঁকে সাহায্য করার জন্য।

ঢাকাতে ততক্ষণে ভারতীয় সেনাদল পরিস্থিতির উপর পুরো দখল এনে ফেলেছে। পাকিস্থানী সৈন্যদের ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধবন্দী শিবিরে চালান করার জন্যে এক ব্যাপক কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল। ১৬ ডিসেম্বর শেষ রাত্রি পর্যন্তও জেনারেল নাগরা অবাক হয়ে ভাবছিলেন, কেন হিতেশ এখনও ফিরলো না। অবশ্য বাঙালাদেশের তৎকালীন ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কারো পক্ষেই সময় সূচী ঠিক রাখা সম্ভব ছিলনা।

একজন এ.ডি.সি. র থেকে অনেক বেশি আলাদা চোখে দেখতেন, একেবারে নিজের ছেলের মত ক'রে। যখন কয়েক মাস আগে হিতেশ তার ব্যক্তিগত বিভাগে যোগ দেন, এই যুবক অফিসারের বাবা তাকে লিখেছিলেন, হিতেশ বোধহয় তার এ.ডি.সি. হওয়ার পক্ষে একটু কম বয়সী। জেনারেল নাগরা জানিয়েছিলেন, মোটেই নয়, ছেলেটি খুবই ভালো, কর্তব্যজ্ঞান নিখুঁত এবং যে কোন দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ।

বিভিন্ন প্রমাণপত্র, সিনিয়র অফিসারদের বর্ণনা থেকে হিতেশ মেহতার জীবনের শেষ আটচল্লিশ ঘন্টার সেই মর্মস্পর্শী কাহিনী পরে জানা গিয়েছিল।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১, হিতেশ মেহতা ঢাকার কাছাকাছিই ছিলেন। সেখানে জেনারেল নাগরার নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর মাউন্টেন ডিভিশনের প্রধান অফিস খোলা হয়েছিল। জেনারেল নাগরার সেনাপতিত্বে তখনকার পুর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার আধঘন্টা দূরত্বে এসে পড়ায় হিতেশ দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন

পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীকে ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯ টার মধ্যে আত্মসমর্পণের চরমপত্র দেওয়া হয়েছিল।

হাত থেকে সৈন্যদের বাঁচাতে নিয়াজী শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিলেন। সকাল সাড়ে আটটায় মাউন্টেন ডিভিশনের গোয়েন্দা বিভাগ একটি খবর পেল যা থেকে জানা গেল পাকিস্তানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করতে চায়। মেজর জেনারেল নাগরাকে খবরটা দেওয়া হলো, তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় নিয়াজীর হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ করার কথা ভাবলেন। কিন্তু কাজটা খুবই বিপজ্জনক। যে দায়িত্বটা নেবে তার যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যাপ্টেন হিতেশ মেহতা দেখলেন জেনারেল নাগরা খুবই চিন্তিত। এই চরম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি কে কাঁধে তুলে নেবে, যার উপর নির্ভর করছে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের ভবিষ্যৎ? হিতেশ মেহতা শান্তভাবে জেনারেল নাগরাকে জানালেন যে, তিনি দায়িত্বটি বহন করতে ইচ্ছুক।

জেনারেল নাগরা একটি খামে পুরে নিয়াজীর উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদবাহী পত্রটি হিতেশের হাতে তুলে দিলেন। একজন সহকর্মী অফিসার ক্যাপ্টেন শর্মা এবং অন্য দুই সিপাহীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন হিতেশ মেহতা।

মেজর জেনারেল নাগরার খবরটি একটি

ঐতিহাসিক দলিল হতে পারতো। নিয়াজী যখন সিন্ধুপ্রদেশের ব্রিগেড কমাণ্ডার, নাগরা তখন করাচীতে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের সামরিক অ্যাটাশে। তিনি নিয়াজীকে জানতেন। তাই পাক জেনারেল নিয়াজীকে নরম করার জন্য চেষ্টা করলেন জেনারেল নাগরা। নিয়াজীকে দেওয়া তার চিঠির বয়ানটি ছিল মোটামুটি এই রকম, "প্রিয় আবদুল্লা, আমি কাছাকাছিই আছি। খেলা শেষ হয়ে গেছে। আমার পরামর্শ মতো যদি চলো তা হলে বলবো আত্মসমর্পণ করো। কথা দিলাম আমি তোমাদের দেখবো।" ক্যাপ্টেন শর্মা এবং দুজন সিপাহীকে নিয়ে ক্যাপ্টেন হিতেশ মেহেতা এই খবর নিয়ে ঢাকায় লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজীর হেডকোয়ার্টারে গেলেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১—এ আত্মসমর্পণের কয়েকঘন্টা আগে তারাই হলেন জয়ী ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রথম অফিসারবর্গ, যারা ঢাকায় প্রবেশ করলেন। সকাল দশটার সময় তাঁরা নিয়াজীর সঙ্গে কফি পান করলেন। নাগরার খবরটি জেনারেলকে জানানো হলো। পাকিস্তানী সৈন্যরা আগে থেকেই অস্ত্রসস্ত্র সমপণ করতে প্রস্তুত ছিল। সেই মুহূর্তে বাহিনীর মাত্র দু'জন অফিসারই এই আত্মসমর্পণের কথা জানতেন—ক্যাপ্টেন মেহতা ও ক্যাপ্টেন শর্মা।

১৯৭২—এর ১৫ জানুয়ারী সোলানে সুবাদার কিষেন গোপাল মেহতাকে লেখা একটি চিঠিতে সেদিনের কিছু ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন হিতেশের সহকর্মী অফিসার ওয়াই.এম. বাম্মি

"৯ জানুয়ারীতে জেনারেল নাগরাকে লেখা আপনার চিঠির উত্তরে জানাচ্ছি, তিনি দিল্লির উদ্দ্যেশ্যে রওনা হয়েছেন। আমি আপনাকে একটি টেলিগ্রামও পাঠিয়েছি এ বিষয়ে। তিনি ২১ জানুয়ারী '৭২ অব্দি দিল্লিতেই থাকবেন।

'যাওয়ার আগে জেনারেল নাগরা আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেই ঘটনার কথা আপনাকে জানাতে, যে ঘটনায় আমাদের মহান, সাহসী, কর্তব্যনিষ্ঠ অফিসার হিতেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশের জন্য প্রাণ দিলেন। আমি এবং তিনি মেঃজেঃ নাগরার সঙ্গে বরাবর এক সঙ্গেই ছিলাম। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, দেশের জন্য এমন আত্মোৎসর্গ এবং ত্যাগের ঘটনা ইতিহাসে খুবই কম আছে।"

"১৬ ডিসেম্বর আটটা নাগাদ আমরা ঢাকার কাছে ছিলাম। পথে একটা সাংকেতিক খবর উদ্ধার করা গেল, যাতে করে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছুক। যেহেতু এ বিষয়ে অফিসিয়াল কোন স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি এবং আমরা দেরি করতে চাইছিলাম না, তাই ঠিক করা হল একটি জীপে সাদা পতাকা উড়িয়ে জি.ও.সি. ইন্.সি. নিয়াজীকে এবং জি.ও.সি. ১৪ পাক ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনকে মীরপুর ব্রিগেডে জেনারেল নাগরার কাছে আত্মসমর্পণ করতে খবর পাঠানো হবে। যদিও এই প্রচেষ্টায় যথেষ্ট বিপদ ও আশঙ্কা ছিল, তবু হিতেশ এর দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং ক্যাপ্টেন শর্মা ও দুজন সিপাহীকে নিয়ে ৮.৩০ মি. বেরিয়ে পড়লেন এবং ফিরলেন ১০.৪০ মিনিটে। সঙ্গে ছিলেন মেঃজেঃ মহঃ জামসেদ, জি.ও.সি. পাক ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন ৩৬। পরাজিত সেনাধ্যক্ষকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে হিতেশ জেনারেল নাগরার কাছে নিয়ে এলেন। তারপর ঢাকাতে জেনারেল নাগরা এবং জেনারেল জামসেদকে সেই আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে হিতেশ নানারকম ভাবে সহায়তা করলেন তার ভদ্র সভ্য ব্যবহারে পাকিস্তানী জেনারেলরা খুশি হয়েছিলেন। আত্মসমর্পণের জন্য জেনারেলকে নিয়ে আসার গৌরবের অধিকারী হয়েও তিনি খুব শান্ত ও নিরুত্তেজ ছিলেন। তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে তিনি মানুষের হৃদয় জয় করতে পারতেন সহজেই। আমরা যখন পাক ইস্টার্ন কমাণ্ডের হেড কোয়ার্টারে ছিলাম তখন জানতে পারলাম, আত্মসমর্পণের খবর না পাওয়ার ফলে একদল পাকিস্তানী সৈন্য তখনও আমাদের সৈন্যদলের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ঢাকায় তখনও আমাদের সৈন্যদল এসে পৌঁছায় নি অথচ যুদ্ধ তখনই থামানো দরকার। যুদ্ধ থামাতে এক-জন পাকিস্তানী সেনা অফিসারের সঙ্গে যাবার জন্য হিতেশ আবার রাজী হয়ে গেলেন। একটা জীপে সাদা পতাকা উড়িয়ে তাঁরা ঢাকা থেকে ৮ মাইল দূরে টুঙ্গির দিকে রওনা হলেন। পৌঁছে তাঁরা দেখলেন পরিস্থিতি আরো অবনতির দিকে। পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক বাহিনী ভারতের মাউন্টেন বি-গ্রেডকে ঘিরে ফেলেছে। আমাদের বাহিনী তখন মেশিন গান চালিয়ে মোকাবিলা করছে।

"জীপে যখন এই অফিসারদের দেখেও যুদ্ধ থামলো না, অসম সাহসী হিতেশ জীপ থেকে নেমে দাঁড়ালেন। একটি সাদা পতাকা ওড়াতে ওড়াতে হিতেশ একাই এগিয়ে চললেন পায়ে হেঁটে। পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক চালকদের এবং আমাদের 'যারা মেশিন গান চালাচ্ছিল, তাদের বললেন, "যুদ্ধ থামাও"। উভয় তরফের দারুণ ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ করতেই ছিল হিতেশের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। যুদ্ধের উন্মাদনায় ট্যাঙ্ক চালকেরা তখন বেপরোয়া। ট্যাঙ্ক থেকে আচমকা একটা গোলা ছুটে এল হিতেশের দিকে, হিতেশ ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। দেশের জন্য শহীদ হলেন তিনি। আরও রক্তপাত, আরও ক্ষয়ক্ষতি, আরও ধ্বংস নিবারণ করতে তিনি তার মূল্যবান জীবন দান করলেন।

"সাহসিকতা এবং কর্তব্যকর্মে হিতেশের অবিচলতা আমাদের দেশের সেনাবাহিনীর কাছে এক উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে থাকবে। চতুর্থ গোরখা রাইফেল বাহিনী এই গর্বকে ধারণ করবে আগামী দিনগুলোতেও।"

তাঁর এই মৃত্যুর খবর সবাইকে শোকাভিভূত করেছিল। বিজয়ী ভারতীয় সেনাদলের ঢাকা প্রবেশের আনন্দও ম্লান হয়ে গিয়েছিল এই শোকচ্ছায়ায়। তাঁর পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করলেন জেনারেল নাগরা নিজেই।

"শেষে, আমি কেবল একটা কথাই বলবো, আপনার এই অপূরণীয় ক্ষতির ভাগীদার আমরাও। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তার আত্মার অক্ষয় স্বর্গলাভ হোক আমাদের সৈন্যদলের কাছে হিতেশ এক অনুকরণীয় আদর্শ।"

জাতীয় স্তরের বিখ্যাত নেতারা, এমনকি ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সৈন্যদলের জেনারেল, ইস্টার্ন কমাণ্ডের জি.ও.সি. ইন–চিফ এবং গোর্খা রেজিমেন্টের পদস্থ অফিসারেরা হিতেশের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন এবং তাঁর বাবা সুবেদার কিষেন গোপাল মেহেতাকে একটি সান্ত্বনাপত্র পাঠিয়েছিলেন। দেশের পক্ষ থেকে, ক্যাপ্টেন হিতেশ মেহতাকে তাঁর বীরত্ব এবং কর্তব্যে অবিচলতার জন্য মরণোত্তর সামরিক পদক দেওয়া হলো।

পুত্রশোকে মুহ্যমান অথচ গর্বিত কিষেন মেহেতা একজন সেনার জীবনের পরিণতির কথা ভালোই জানতেন। তিনি জানতেন যে চরম সাহসী যোদ্ধা কখনও কখনও একটা দেশের জন্য এক বিরাট শূন্যতা রেখে যান, এবং গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে যান নিকটজনের বুকে, যা সারাজীবন ধরে সাহস এবং গর্বের সঙ্গে তাদের বয়ে চলতে হয়।

পুত্রের স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখতে তাঁর বাবা রৌপ্যনির্মিত একটি পদক প্রচলন করলেন। একটি অনুষ্ঠানে তিনি তার ছেলের ইউনিটের চারজন গোর্খা সৈন্যকে এই পুরস্কার প্রদান করেছিলেন। অসীম সাহসী গোর্খা রেজিমেন্টের কাছে এ এক অনন্যসাধারণ পুরস্কার হিসেবে আজ বিবেচিত। অন্যদিকে হিতেশের পিতাকেও গোর্খাদের শতাব্দী প্রচলিত সম্মান সূচক যুদ্ধাস্ত্র কুকরী প্রদান করে পুরস্কৃত করা হয়, তার ছেলের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানাতে।

দিল্লির নাগরিকেরা তরুণ হিতেশের সম্মানে ১৯৭৯ সালে দক্ষিণ দিল্লির মালব্য নগরের সব থেকে সুন্দর পার্কটির নামকরণ করেন "হিতেশ মেহতা পার্ক" এই পার্ক থেকে একটি ছোট্ট রাস্তা বেরিয়ে গেছে। যুবক শহীদের নামে এই রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। রাস্তার শেষে একটি বিরাট গাছ। তার পিছনে মাঝারী এক বাড়ি। এটাই হিতেশের পৈতৃক বাড়ি। গাছের তলায়, যখন খুব গরম থাকে না, তখন যে কেউ দেখতে পাবেন একজন শান্ত, সৌম্য বয়স্কা মহিলাকে। চুল সব সাদা, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ, বেশি নড়াচড়া করতে পারেন না। আশেপাশের বহু ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে জড়ো হয় এক বিনম্র শ্রদ্ধায়। কারণ তিনি যে হিতেশের মা।

বৃদ্ধা চুপচাপ বসে থাকেন; দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত ছেলের স্মৃতি রোমন্থন করেন। আসলে হিতেশের এই আত্মোৎসর্গ যে মায়ের উদ্দেশ্যেই গভীর এক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

উত্তরে মাথা রেখে শোবেন না

ডঃ সারদা সুব্রমনিয়ম

পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র কি মানুষের শারীরিক এবং মানসিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে? নিয়ন্ত্রিত তড়িৎ চৌম্বকীয় স্পন্দনের দ্বারা বাত, আর্থ্রারাইটিস, মানসিক অবসাদ এবং পক্ষাঘাতের চিকিৎসা কি সম্ভব? মাদ্রাজের একটি বিখ্যাত গবেষণাগারে এ নিয়ে বিশদ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। বিশ্ব এখনও পর্যন্ত এ ধরনের বিশেষ কিছু কাজ হয়নি। এ সম্বন্ধে মাদ্রাজ থেকে আমাদের প্রতিনিধি কাবেরী শেঠির প্রতিবেদন।

মা ঠাকুমারা সেই যে এক আপ্তবাক্য বলতেন 'উত্তরে মাথা রেখে কখনো ঘুমোবে না'—আজ বৈজ্ঞানিকেরাও তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রবাদটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তথ্যসহ প্রমাণ করেছেন 'তড়িৎ চৌম্বকীয় অনুস্পন্দন'—এ গবেষণারত মাদ্রাজের 'হেলথ্ সার্ভিসেস মেডিকেল সেন্টার'—এর কয়েকজন বিজ্ঞানী। ১৯৮০ সাল থেকে ভারত সরকারের বিজ্ঞান এবং কারিগরি শাখার সাহায্যে তাঁরা মানুষের সুস্থ এবং অসুস্থ অবস্থায় তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছিলেন।

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা গেল, চৌম্বকীয় অনুস্পন্দন খুব সফল ভাবেই দীর্ঘ স্থায়ী রোগ যেমন বাত, আর্থ্রারাইটিস, স্পনডিলোসিস, কটিবাত, মানসিক বিকারজাত শারীরিক ব্যাধি এবং স্নায়ু বিকলনের নিরাময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। মা-ঠাকুমার সেই প্রবাদ 'উত্তরে মাথা রেখে শোয়া ক্ষতিকর' সত্যি বলে প্রমাণিত হলো।

পৃথিবীর তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্র আসলে খুবই মৃদু। কিন্তু মেরুবদল এবং চৌম্বকীয় তীব্রতার পরিবর্তন কখনো কখনো ঘটে। এর জন্যে পৃথিবীতে ধ্বংসকারী শক্তির সূচনা হতে পারে। যেমন সেই পুরাণবর্ণিত মহাপ্রলয় অথবা কোন প্রজাতির বিলুপ্তি, যেমনটি হয়েছিল ডাইনোসোরাসদের। খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার পাঁচশ বছর আগে ইউরোপের মধ্যভাগে এ ধরনেরই একটা নাটকীয়, কিন্তু ক্ষতিকারক নয়, এমন ঘটনা ঘটেছিল। পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র হঠাৎ প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে গেল। ফল দাঁড়ালো আশ্চর্যজনক। মানুষের মুখাবয়বে দারুণ রকম পরিবর্তন এলো—চিবুক হয়ে উঠল তীক্ষ্ণ এবং ত্রিকোণাকার। পাঁচশ বছর পরে সেই ক্ষেত্র যখন তার আগেকার তীব্রতা ফিরে পেলো, মধ্য ইউরোপীয় মানুষের মুখাবয়বে মোঙ্গলীর ধাঁচ এসে জুড়ে বসলো। এ ধরনের আকৃতি হয়তো হয়েছিল কোন মহাজাগতিক বিস্ফোরণে। আর এমন ঘটনা সম্ভবতঃ দশলক্ষ বছরে একবার হয়। সুতরাং আমাদের চিন্তার কিছুই নেই। কিন্তু আজ চিন্তার বিষয় যেটা সব থেকে বেশি তা হ'লো মানুষের তৈরি পরিবেশ দূষণ। শেষ কয়েক যুগ ধরে হাজার হাজার রেডিও, টি ভি স্টেশান, হাইটেনশান ইলেকট্রিক লাইন, মাইক্রোওয়েভ যন্ত্রপাতি এবং এ ধরনের বহু জিনিস থেকে দিনে দিনে অল্প থেকে সুপ্রচুর তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকীরণ ঘটছে বায়ুমণ্ডলে। ফলতঃ প্রাকৃতিক ভারসাম্য যা আমাদের জীবনের পক্ষে উপযোগী তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এই মহা-অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি কোন ভাবে ঠেকিয়ে রাখা যায়? ওয়ার্লড হেলথ্ অর্গানাইজেশন ও এই ধরনের অন্যান্য নিবেদিত সংস্থাগুলি অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। কি ভাবে তড়িৎ চৌম্বকীয় দূষণের সঠিক মাত্রা, যা মানুষ সহ্য করতে পারে, তা নির্ণয় করা যায়। তাঁরা মনে করেন, একবার যদি এই সঠিক মাত্রাটি খুঁজে পাওয়া যায়, তবে এই বিশেষ ধরনের দূষণকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

কথাগুলো এখন কল্পনার বুদবুদের মতই ঠেকবে, কিন্তু এটাও ঠিক, এদিকে কাজ অনেকটা এগিয়েছে। বেশির ভাগ উন্নত দেশের ভালো হাসপাতালগুলিতে চৌম্বকীয় জীববিজ্ঞান (ম্যাগনেটো বায়োলজিকাল) সংক্রান্ত ইউনিট থাকে, যার কাজ হলো এই তড়িৎ চৌম্বকীয় তীব্রতা এবং স্পন্দনের দ্রুততা সম্পর্কে তত্ত্বাবধান করা এবং চিকিৎসায় সাহায্য করা। কিন্তু উচ্চস্তরে যে দূষণ ঘটে কেবল মাত্র সেদিকেই এসব প্রকল্পের মনোযোগ। অথচ নিম্নস্তরে যে দূষণ সর্বদা ঘটে চলেছে তাকে প্রায় পাত্তাই দেওয়া হয় না। পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রগুলি যা আমাদের সেই ভ্রূণাবস্থা থেকেই ঘিরে রেখেছে তা দারুণ শক্তিশালী, জটিল এবং দীর্ঘ সময় ধরে নিয়তই পরিবর্তনশীল (যদিও স্বল্পকালীন সময়ে বিশাল অঞ্চলজুড়ে পরিবর্তিত হয়)। যদিও এ দূষণ উচ্চতর স্পন্দনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, কিন্তু অন্যদিক থেকে দেখলে নিম্ন স্পন্দনের মাত্রাকেও পরিবর্তিত করে।

এটা কি ক্ষতিকর? আমরা কি এই বিপদ থেকে, নিজেদের বাঁচাতে পারি? অথবা আমরা এই ঘটনা থেকে মঙ্গলজনক কিছু কি আশা করতে পারি? রাশিয়ায় কিছু প্রাথমিক কাজকম ছাড়া ই.এল.এফ—(নিম্ন স্পন্দনের মাত্রা)—এর প্রভাব মানুষের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পর্কে গবেষণা এখনো উপেক্ষিত।

মাদ্রাজে এ বিষয়ে যে কাজ শুরু হয়েছে, তা সত্যিই এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। মাদ্রাজের দলটির সামনে অনুসরণ করার মতো সুনির্দিষ্ট কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, পদ্ধতি, নির্দেশ বা এসম্পর্কে আগে পাওয়া কোন তথ্যও ছিল না। মাদ্রাজের বৈজ্ঞানিকদের দলে তিনজন নিবেদিত প্রাণ মানুষ শেষ পর্যন্ত বিষয়টিকে সম্ভব করে তুললেন। ডঃ সারদা সুব্রমনিয়ম এদের মধ্যে প্রথমা। মাদ্রাজের স্ট্যানলে মেডিকেল কলেজের জিওলজির অধ্যাপক এবং তারামানির বেসিক মেডিকেল সায়েন্সের স্নাতো-

পক্ষাঘাতের রোগী, চিকিৎসার পর

কোত্তর অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নিয়ে তিনি গবেষণা শুরু করেন। দ্বিতীয় সদস্য ড:পি.ভি. শঙ্করনারায়ণ ভারতে আসার আগে বহুবছর আমেরিকায় শিক্ষকতা করেন। হায়দ্রাবাদের জাতীয় ভূপদার্থবিদ্যা গবেষণাগারের সহকারী ডিরেক্টর হিসেবে অবসর নেওয়ার পর তিনি আই.সি.এম. আর-এ আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে আসেন। এ সম্পর্কে তৃতীয় গবেষক হলেন ড:টি.টি.এম.শ্রীনিবাসন। তিনি মাদ্রাজের স্থানীয় আই–আই–টির একজন বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক। ড: শ্রীনিবাসন একজন সম্মানিত পরামর্শদাতা হিসেবে এবং অন্য দুজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে এই ম্যাগনেটিক পালসেসান প্রজেকটে গবেষণা রত।

১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে স্থানীয় জনসাধারণের শুভেচ্ছা এবং অর্থ সাহায্যে এই গবেষকরা মাদ্রাজে গড়ে তুললেন 'চৌম্বক জীববিদ্যা প্রতিষ্ঠান।' নিজস্ব ডিজাইনে নির্মিত চৌম্বকীয় ফিল্ড জেনারেটার এবং কয়েল সিস্টেম তারা ব্যবহার করছেন। যেহেতু মাদ্রাজ প্রায় চৌম্বকীয় নিরক্ষরেখার (যা মাদ্রাজ থেকে ৫০০ কি.মি. দূরে এট্টায়পুরমের উপর দিয়ে গেছে) মধ্যেই অবস্থিত সুতরাং এখানে এ.সি. এবং ডি.সি. শক্তি ব্যবহার করে যে কোন অক্ষাংশের তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব, এমনকি বহির্বিশ্বের চৌম্বকীয় শূন্যতাও তৈরি করে নেওয়া যায়।

প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয় অস্বাভাবিক (জিনবিদ্যার পরিভাষায় যাদের বলা হয় 'অ্যালবিনো') সাদা ইঁদুরের ওপর। পরে আগ্রহী স্বাস্থ্যবান স্বেচ্ছাসেবকদের উপর তা প্রয়োগ করা হয়। ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাম, ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাম ও অন্যান্য শারীরিক পরীক্ষা ছাড়াও স্বেচ্ছাসেবকদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার তীব্রতা নির্ণয় করা হয়েছিল। প্রায় তিনশো পশু এবং চল্লিশজন মানুষকে পরীক্ষার আওতায় আনা হয়।

ফলাফল হলো অবিশ্বাস্য আশাব্যাঞ্জক। পশু এবং মানুষগুলি সবাই যখন তার মাথা দক্ষিণে অথবা পশ্চিমে রেখেছে, তখন খুবই অল্প প্রতিক্রিয়া হলো। কিন্তু উত্তর এবং পূর্বদিকে যখনই মাথা রাখা হয় তখন তাদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে দেখা গেল। ইঁদুরগুলোকে উত্তরমুখী' করে রাখলে তারা চঞ্চল হয়ে উঠছে, এবং একনাগাড়ে আওয়াজ করে যাচ্ছে। মানুষেরা চঞ্চল হয়ে অভিযোগ করছে অস্বাচ্ছন্দ্যের এবং কারও কারও অসহ্য মাথা যন্ত্রণাও হচ্ছে। যেসব স্বেচ্ছাসেবকরা যোগাভ্যাস করেন, কেবল মাত্র তারাই এই স্পন্দনশীল চৌম্বকীয় ক্ষেত্র (পি এম এফ)–এর অস্বাচ্ছন্দ্য কাটিয়ে উঠতে পারছেন। পূর্বদিকে মাথা রাখা হলে ইঁদুরগুলি শান্ত এবং চুপচাপ হয়ে যাচ্ছিল আর মানুষেরা অনুভব করেছেন মানসিক শান্তি ও সজাগবোধ। আর এক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কার্যকলাপও যেন বেড়ে যাচ্ছিল।

অবশ্য কেবলমাত্র তড়িৎ চৌম্বকীয় স্পন্দনের সময়টুকুতেই এই অস্বাচ্ছন্দ্য ধরা পড়েছে। আর ব্যাপারটি তো রোজ ঘটে না। কিন্তু কোন কোন দিনে স্পন্দন কয়েকবার ঘটতেও পারে। সুতরাং এই অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে বাঁচবার অন্যতম সহজ পথই হোল উত্তরের দিকে মাথা রেখে না শোওয়া।

আর একটি আশ্চর্য্য ফলাফল পাওয়া গেল এই গবেষণা থেকে। দেখা গেল পি.এম.এফ দিয়ে খুব নিরাপদ ভাবে আর্থারাইটিস, বাত এবং ছোটখাটো কাটা ছেঁড়ায় চিকিৎসা করে রোগ মুক্তি সম্ভব।

পৃথিবীর তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্র আমাদের মানসিক অবস্থাকেও প্রভাবিত করতে পারে। আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থা, এমন কি জিন (আমাদের বংশগতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক উপাদান) সংশ্লেষনেও এর ভূমিকা রয়েছে। এই তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্র কাজ করে একেবারে কোষগত (মানুষের শরীরের গঠনগত ও কার্যগত একক) স্তরে। আর কোষের ভিতরে আয়ণিক ক্ষেত্রের অসামঞ্জস্যই যেহেতু অনেক শারীরিক গোলমালের কারণ, সুতরাং কোষের ভিতরকার এই অসামঞ্জস্যকে তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই রোগমুক্তি সম্ভব।

ম্যাগনেটো বায়োলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে গবেষণা করে দেখা গেছে যে পশুর ক্ষেত্রে লেজের ডগা পর্যন্ত এবং মানুষের ক্ষেত্রে আঙুলের ডগা পর্যন্ত রক্ত সংবহন তখনই বেড়ে যায় যখন তাদেরকে পূর্বাভিমুখী করা হয়। সুতরাং রক্ত সংবহনের অসামঞ্জস্য, পিঠের ব্যথা, স্নায়ুতন্ত্রের গোলোযোগ এবং আথারাইটিস রোগে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

ড: সুব্রমনিয়মের বাড়ির কাছাকাছি তড়িৎ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সাহায্যে চিকিৎসার জন্য একটি সংস্থাও খোলা হয়। চিকিৎসার জন্য এখানে পাঁচটি নিয়ন্ত্রিত চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। ছ'জন রোগীকে এক সঙ্গে এখানে চিকিৎসা করা সম্ভব। চিকিৎসা কেবলমাত্র শান্ত তড়িৎ চৌম্বকের দ্বারা সম্ভব।
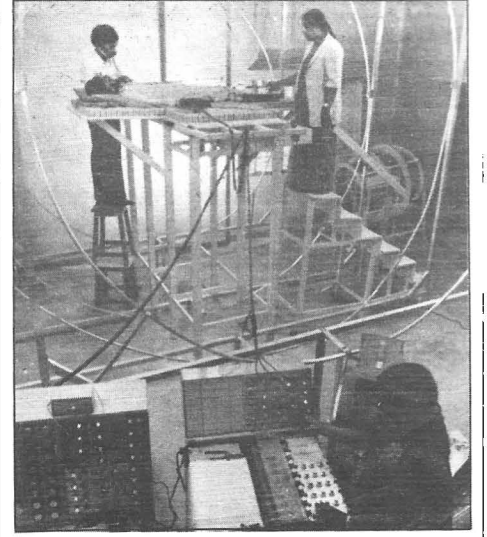
চৌম্বকীয় অনুস্পন্দন ক্ষেত্রে একজন স্বেচ্ছাসেবকের উপর পরীক্ষা চলছে

আজ পর্যন্ত প্রায় তিন'শ রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। ফলাফল সন্তোষ জনক। রোগীদের মধ্যে একজন মিসেস কৃষ্ণাণ (৪৪) সাত বছর ধরে বাতে ভুগছিলেন। হাঁটু এবং কব্জিতে প্রচন্ড যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। আয়ুর্বেদ বা আকুপাংচার কিছুতেই তার কষ্টের লাঘব হয় নি। কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া তিনি হাঁটতেই পারতেন না। কিন্তু মাত্র কুড়ি দিনের এই পি.এম. এফ চিকিৎসায় তিনি দেখলেন তার যন্ত্রণা কমে যাচ্ছে। চল্লিশদিন ব্যাপী চিকিৎসায় তিনি কারো সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে সক্ষম হলেন।

ড: সুব্রমনিয়ম বললেন, "এই চিকিৎসায় কোন কু-ফল নেই, আমার নিজেরই যখন ক্লান্তি লাগে এবং পিঠে ব্যথা হয়, তখন আমিও এর সাহায্য নিই।"

মধ্য বয়স্কা গৃহিণী যশোদা পড়ে গিয়ে পিঠে চোট পেয়েছিলেন। আগে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, কিন্তু মাত্র কুড়ি দিনের চিকিৎসায় তিনি গৃহস্থালির সব কাজ করতে সক্ষম। কেরালার একজন বৃদ্ধা, কুঞ্চি কুট্টির স্ট্রোক হয়ে শরীরের ডান দিকে পক্ষাঘাত হয়েছিল তিনবছর আগে। অ্যালোপাথ চিকিৎসায় কোন উন্নতি হয়নি। পি.এম.এফ চিকিৎসায় তিনি ডান হাত তুলতে সক্ষম হলেন। বম্বের খুর্শিদ বহু বছর ধরে আর্থারাইটিসে ভুগছে। সাত দিন ক্লিনিকে রয়েছে। সে উৎফুল্ল এবং আশাবাদী।

এই পদ্ধতির পুরো চিকিৎসায় খরচ হয়, তিনশ থেকে ন'শ টাকা। এই সংস্থা মেডিকেল কলেজ, কারিগরী সংস্থা এবং হাসপাতালগুলিতে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। গবেষণা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে, যদিও সংস্থাটি এখন তাদের কাজকর্মের পরিধি অনেকটা বাড়িয়েছেন। পি.এম.এফ পদ্ধতি দ্বারা এখনো পর্যন্ত ভাবা যায় নি এমন অনেক বিষয়ের ওপর দারুণ ভাবে আলোকপাত করা সম্ভব। আশা করা যায় অনেকেই এতে উপকৃত হবেন।

ফুটবলের তিন প্রধান কে কেমন?

বিবেক আনন্দ
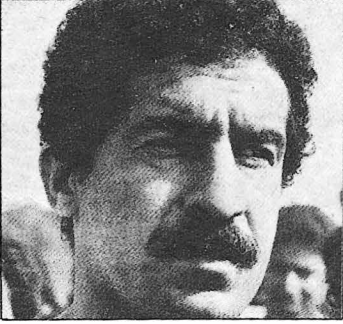
এ মরশুমে মহামেডানের দুই মহার্ঘ্য সংগ্রহ : জামশিদ এবং চিমা ওকেরি

১৫ জানুয়ারি ১৯৮৬। আই এফ এ–র পাওনা টাকা মিটিয়ে দেওয়ার শেষ দিন। এদিনের মধ্যেই মহামেডান ক্লাব বকেয়া বাষট্টি হাজার সাতশ' সাতাত্তর টাকা চল্লিশ পয়সা না মিটিয়ে দিলে আই এফ এ–র গভর্নিং বডিতে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ হারাবে। কলকাতার ফুটবল মহলে সংশয় দেখা দিল মহামেডানের আচরণে। 'যত টাকা লাগে দেব, এবার আমরা চিমা জামশিদকে একসঙ্গে খেলাবই', বলে বেড়াচ্ছেন কর্মকর্তারা অথচ বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেবার সময় কোন কথা শোনা যাচ্ছে না তাদের মুখ থেকে। গত দু'বছর ধরে এই টাকা বাকি পড়ে আছে। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময় চলে গেল, টাকা না জমা দেওয়ায় মহামেডান ক্লাব আই এফ এ–র গভর্নিং বডিতে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ হারাল। সচিব প্রদ্যোৎ দত্ত জানালেন 'টাকা জমা দেওয়ার শেষ সীমা ধার্য করা হল ৩১ মার্চ, এদিনের মধ্যে টাকা জমা না দিলে মহামেডানের অনুমোদন বাতিল হবে অর্থাৎ ক্লাব আর কোন খেলায় অংশ নিতে পারবে না।'

বছরের শুরু থেকেই স্টার ফুটবলারদের টানার চেষ্টা শুরু করল। ১৯ ফেব্রুয়ারি মহামেডান তাঁবুতে বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার কলিমুদ্দিন শামসের সভাপতিত্বে দল গঠন আর সেজন্য প্রয়োজনীয় টাকা জোগাড় করার জন্য সভা বসল। 'টার্গেট প্লেয়ার'দের নাম লিস্ট করা হল, যাদের দলে টানার চেষ্টা হবে। তাদের মধ্যে ছিল গোয়ার গোলরক্ষক ব্রহ্মানন্দ খানকোকার, কেরলের স্টপার ফ্রান্সিস বিনী, কর্ণাটকের স্টপার মস্তান আহমেদ, জম্মুর আরিফ বেগ ও খুরশিদ, গোয়ার মিড–ফিল্ডার সত্যেন, ইস্টবেঙ্গলের জামশিদ, মোহনবাগানের প্রশান্ত ব্যানার্জী ও সুবীর সরকার। খেলোয়াড় টানাটানি শুরু হল, সেই আসর বসল কখনও কলকাতায় কখনও জব্বলপুর, ওয়ালটেয়ার, হায়দ্রাবাদ অথবা বম্বেতে। লক্ষ লক্ষ টাকার চুক্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতে লাগল খেলোয়াড়দের, হাত বদল হতে লাগল অ্যাডভান্স নোটের বাণ্ডিল। কিন্তু তখনও আই এফ এ–র টাকা মেটানোর ব্যাপারে মহামেডান শিবির নিশ্চুপ। ১৫ মার্চ দলবদল শুরু হল। মহামেডানের পক্ষে সই প্রত্যাহার করল অনেকে, অনেকে আবার অন্যদল থেকে মহামেডানে যোগ দিল। সবাই জানে ৩১ মার্চের মধ্যে টাকা জমা না দিলে তারা এ মরশুমে খেলার সুযোগ হারাবে। কিন্তু মনে আশা, মহামেডান নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই টাকা জমা দিয়ে দেবে। মহামেডানের এক বিশ্বস্ত খেলোয়াড় বলল, 'না হলে ক্লাব ছেড়ে চলে যাব। ৪ এপ্রিল পর্যন্ত তো দলবদল চলবে আর ৩১ মার্চের মধ্যেই জানা যাবে মহামেডান আই এফ এ–র অনুমোদন হারাল কিনা।'

শেষ পর্যন্ত মহামেডান সমস্ত বকেয়া টাকা শোধ করে দিল একেবারে শেষ মুহূর্তে। মহামেডানের খেলোয়াড়রা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। 'কেন এত টালবাহানা করে শেষে টাকা দিল?' মহামেডানের কর্মকর্তা সুলেমান খুরশিদ স্বীকার করলেন 'চাপের মুখে পড়ে আমাদের টাকা শোধ করতে হল, ফুটবলের দল তৈরি করতেই সব টাকা বেরিয়ে গেছে। তাই ভীষণ আর্থিক সমস্যার মধ্যে রয়েছি।'

এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় কলকাতার ফুটবলের দলবদলের খেলায় ক্লাবের কর্মকর্তারা কেমনভাবে জড়িয়ে পড়েন। ভাল খেলোয়াড় চাই, স্টার প্লেয়ার ভাঙিয়ে আনতে হবে অন্য দল থেকে; কিন্তু ক্লাবের আসল অবস্থাটা কি সেকথা ভুলে যান সবাই সেই সময়। 'স্টার ফুটবলার' আনার নেশায় প্রতিবারই দেখা যায় তিন প্রধান ক্লাবে সুষম দল তৈরি হয় না, কোন একটি পজিশনে অনেক ভাল খেলোয়াড়ের ভিড়, আবার অন্য একটি পজিশনে তেমন ভাল খেলোয়াড় নেই। দলবদলের উন্মাদনা শেষ হলেই এসব সবার চোখে ভেসে ওঠে।

দুই বিদেশি খেলোয়াড় চিমা ওকেরি আর জামশিদ নাসিরি–কে পেয়ে মহামেডানের ফরোয়ার্ড লাইন এবার সবচেয়ে শক্তিশালী। ৮০ ও ৮১ দুবছর ইস্টবেঙ্গলে খেলার পর প্রচুর টাকার অফার দিয়ে মহামেডান দলে টেনে নিয়েছিল জামশিদকে। দু'বছর মহামেডানে খেলার পর পৌনে দু'লক্ষ টাকা আর ফ্ল্যাটের অফার পেয়ে আবার ইস্টবেঙ্গলে ফিরল জামশিদ। পঁচাশির লীগে সর্বোচ্চ গোলদাতা জামশিদকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল মহামেডান অনেকদিন থেকেই। কিন্তু জামশিদ প্রথম থেকেই বলে আসছিল ইস্টবেঙ্গল সে ছাড়বে না, তাছাড়া মহামেডানে টিম স্পিরিট নেই, কর্মকর্তারা আর পুরনো খেলোয়াড়রা নতুনদের বাধা দেয় প্রতি পদে। সেই জামশিদকে দলবদলের কিছুদিন আগে থেকে আর দেখা গেল না লোকচক্ষে। ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কিন্তু হদিশ পেলেন না। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বিরাট মিছিল বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসছে তাকে। মহামেডানের পক্ষে দলবদল করল জামশিদ গত বছরের চেয়ে এক লক্ষ টাকা বেশি নিয়ে। গত মরশুমে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা চিমা প্রথম থেকেই ইঙ্গিত দিয়ে আসছিল মহামেডান ছাড়বে কিন্তু দু লক্ষ টাকার টোপ আর সেই সঙ্গে ফ্ল্যাটের মায়া ছাড়তে পারল না। যে চিমা ওকেরি 'জামশিদ এলে দল ছাড়বো' বলেছিল তাকেই এবার দেখা যাবে জামশিদের পাশে খেলতে। এই দুজন একসঙ্গে ভারতের যে কোন ডিফেন্সকে ছিন্নভিন্ন করতে পারে। জামশিদের বিপক্ষের গোলে নিখুঁত হিট আর চিমার আক্রমণ গড়ে তোলার ক্ষমতা একসঙ্গে কাজ করলে তা দর্শনীয় হবেই। এছাড়াও তাদের সঙ্গে আছে বিশ্বস্ত সাবির আলি, যার নিখুঁত হেডকে বিপক্ষের গোলকীপার ভয় করে। মোহনবাগান থেকে আসা পরিশ্রমী ও হিসেবী খেলোয়াড় সুবীর সরকারও নিঃসন্দেহে মহামেডানের উইং শক্তিশালী করবে। দ্রুতগতির সুবীরের 'শুটিং' একটু দুর্বল হলেও পুশ ও ফ্লিক থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সে গোল পেয়েছে। আর দুই পুরনো খেলোয়াড় অরূপ দাস ও কার্তিক শেঠ এখনও চমক দেখাতে পারে। কার্তিক শেঠ মোহনবাগানে গত মরশুমে তেমন সুবিধে করতে পারে নি এবার মহামেডানে সে পাচ্ছে ষাট হাজার টাকা।

বম্বে থেকে আসা জোস ভি সিলভা লেফট্ উইং থেকে আক্রমণ তৈরি করবে, এই পরিশ্রমী খেলোয়াড়টির সঙ্গে মহামেডান ক্লাব আশি হাজার টাকার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া তারই সঙ্গে খেলবে অন্ধ্রপ্রদেশের ছেলে সরফুদ্দিন, তার সঙ্গে ক্লাবের এক মরশুমের জন্য চুক্তি হয়েছে পঁচাত্তর হাজার টাকায়। এরা ছাড়াও মহামেডানের ফরোয়ার্ডে আছে বিহারের বিজয়কুমার, বোখুমের বিপক্ষে গোল করেছিল জামসেদপুরে। মোহনবাগানের প্রদীপ তালুকদার, শক্তি মিত্র, খিদিরপুরের মাসুদ আলি, টালিগঞ্জ অগ্রগামীর কতুবুদ্দিন মোল্লা ও এরিয়ান্সের আশিস মিশ্র।

ফরোয়ার্ড লাইনে খুব বেশি নজর দিতে গিয়ে মহামেডান হাফ লাইনে ভাল খেলোয়াড় আনতে পারে নি। কেরালা থেকে আনা ডি পি সত্যেন, অন্ধ্র-

প্রদেশের জে বিবেকানন্দ এবছর মহামেডানে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। আশি হাজার টাকা করে পাবে এ মরশুমে। মহামেডান কর্মকর্তারা প্রথম থেকেই বলছিলেন 'এবার সমস্ত খেলোয়াড় আমরা বাংলার বাইরে থেকে আনব'। কিন্তু দুই নতুন খেলোয়াড় বর্ষাভেজা কলকাতার মাঠে কতটা সফল হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে দুজনেই খুব পরিশ্রমী খেলোয়াড় আর কলকাতার আধা পেশাদারী ফুটবলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা আরও পরিশ্রম করবে একথা নিশ্চিত। চিমার জেদ রাখতে নিমরাজি হয়েও জনি ওকোজুবিকে নিয়েছে মহামেডান। সেও হাফ লাইনে খেলবে। মোহনবাগান ছেড়ে সাদা কালো জার্সি গায়ে চাপাল সুদেশ বের আর মিহির বসু। মিহির বসুর সঙ্গে ক্লাবের নব্বুই হাজার টাকার চুক্তি হয়েছে কিন্তু মাঝ মাঠের খেলায় মিহির বসু নব্বুই মিনিট পরিশ্রম করতে পারবে কিনা সন্দেহ। তার সবচেয়ে ভাল দিনগুলি সে পিছনে ফেলে এসেছে। পেম দোরজী সমস্ত পজিশনে খেলতে পারে বলে দাবী করা হয়, যদিও সে মূলত উইং এর খেলোয়াড়। এবার তাকে মহামেডান মাঝ মাঠে খেলাবে। এরা ছাড়া ইরশাদ হাসানকে খেলতে দেখা যাবে তাদের সাথে।

নতুন খেলোয়াড়দের দিয়ে হাফ লাইন পজিশনের কাজ হয়ত চালিয়ে নেবে মহামেডান, কিন্তু তাদের ডিফেন্স ও গোলে ভাল খেলোয়াড়ের অভাব খুবই অনুভূত হবে। অনুদেব দাস এবারও খেলবে এবং সে-ই মহামেডানের সবচেয়ে বড় ভরসা। কেরালার সরাফ আলিকেক্লার এসেছে আশি হাজার টাকার চুক্তিতে, তার উপরে খুব আশা সবার। এছাড়া জম্মু থেকে নবাগত মহম্মদ সইদ ও মোহনবাগান ছেড়ে আসা অভিজ্ঞ খেলোয়াড় কম্পটন দত্ত ও সমর ভট্টাচার্য রক্ষণভাগ সামলাবে মইদুল ইসলাম, প্রেমনাথ ফিলি-

ইস্টবেঙ্গলের মুখ্য দায়িত্ব এবার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিকাশ পাঁজি এবং নবাগত এমেকা এজুগোর ওপর

পের পাশে দাঁড়িয়ে। এরা টেকনিক আর অভিজ্ঞতা দিয়ে ফর্মের অভাবের কতটা পূরণ করতে পারে ছিয়াশির মরশুমেই তার প্রমান পাওয়া যাবে। এছাড়াও এরিয়ান্স থেকে আসা বিদ্যুৎ কুণ্ডু, ও অচিন্ত্য বেলেল, মোহনবাগানের স্বপন সাহারায় ও স্বপন বসু এ বছর মহামেডান ক্লাবের ডিফেন্সে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাবে। বড় ম্যাচের টেনশনের মধ্যে এরা কেমন খেলে সে বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান। মহামেডান ক্লাব অনেকদিন আগে থেকে চেষ্টা করছিল কর্ণাটকের মস্তান আহমেদ ও মুনিয়াপ্পাকে আনার, কিন্তু সেই মুহূর্তে মোহনবাগান তাদের ছিনিয়ে নিল।

অতনু ভট্টাচার্য চলে যাওয়ায় খুব স্বাভাবিকভাবেই মহামেডানের গোলরক্ষা বিভাগটি দুর্বল। ক্লাবকে এখন নির্ভর করতে হচ্ছে জগদীশ ঘোষ, তাপস চক্রবর্তী, শিবাজী ব্যানার্জি ও দিলীপ পালের উপর। সঙ্গে থাকছে আরও দুজন গোলরক্ষক হায়দার আলি মণ্ডল ও নাসির আহমেদ। অতনু ভট্টাচার্য চলে যাওয়ার শূন্য স্থান কিন্তু এদের দিয়ে পূরণ করা যায় নি।

এবছর মহামেডান ক্লাবকে ফরোয়ার্ড লাইনের উপর নির্ভর করেই খেলতে হবে। ঠিক মত আক্রমণ করতে পারলে ডিফেন্স ততটা মজবুত না হলেই চলে তাই ক্লাবের সাফল্য নির্ভর করছে দুই তুরুপের তাস চিমা ও জামশিদের উপর। দুজনে কিভাবে একসঙ্গে মিলেমিশে খেলে সেটাই দেখার। গত বছর চিমা মহামেডানের খেলায় সর্বেসর্বা ছিল। এখন অনেক ঢাক পিটিয়ে তারা জামশিদকে নিয়ে এসেছে। চিমা এটা খুব ভাল চোখে দেখে নি। একজনের প্রতি আরেকজনের ধারণা যে ভাল নয় মাঝে মাঝেই তাদের মুখ ফসকে তা বেরিয়ে আসে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ কিন্তু দুজনকেই সমান সুবিধা দিচ্ছেন। একই রকম দুটি ফ্ল্যাট পেয়েছে চিমা ও জামশিদ। যদিও চিমার চেয়ে জামশিদ টাকা বেশি পাচ্ছে। মহামেডান কর্তৃপক্ষের আশা, দুই ভিনদেশী খেলোয়াড় বোকার মত স্বার্থপরতা করে পরোক্ষে নিজেদেরই ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না। তারা কিছুদিনের জন্য এদেশে এসেছে যতটা বেশি সম্ভব উপার্জন করেই ঘরে ফিরবে। মহামেডান কর্মকর্তারা এ মরশুমের দলবদলে দুটি দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন, ঘরের ছেলে চিমাকে দলে রাখা আর অন্য দিকে ইস্টবেঙ্গল থেকে জামশিদকে ভাঙিয়ে আনা। দুটি কাজেই তারা সফল হয়েছেন। অতনু ভট্টাচার্যকে রাখতে তারা কোন আগ্রহ দেখান নি। তাই অতনু চলে যাওয়ায় মহামেডানের আফশোসও নেই। কিন্তু এদিক দিয়ে দেখতে গেলে দলবদলের খেলায় ইস্টবেঙ্গল হেরে গেছে। ঘরের ছেলে কৃশানু দে, বিকাশ পাঁজী ও সুদীপ চ্যাটার্জীকে তারা মোহনবাগানের দলে যেতে দেয়নি কিন্তু ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে হয়েছে জামশিদ নাসিরি, দেবাশীষ মিশ্র, দেবাশীষ রায় ও অলক মুখার্জীকে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে দলবদলের ধাক্কাটা সবচেয়ে বেশি খেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। গত বছর ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল বাজেট ছিল উনিশ লক্ষ টাকা। এবছর তারা সেটাকে বাড়িয়ে চব্বিশ লক্ষ করবে এমনই ঠিক ছিল। কিন্তু নিজেদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের জন্য ভাল ভাল খেলোয়াড়দের তারা হারান। জীবন চক্রবর্তী ও পল্টু দাস তিন লক্ষ টাকা নিয়ে জামশিদ মহামেডানে যোগ দিতে পারে একথা বিশ্বাস করেন নি। অন্যদিকে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে অনেক খেলোয়াড়কে আগাম টাকা দিলেও দেবাশীষ ও অলকের কথা তারা সে সময় ভাবেন নি। ফলে হারাতে হয়েছে তাদের।

জামশিদকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ড লাইন এখন সবচেয়ে দুর্বল। ঠিক সময়ে কৃশানুদের চুক্তি বাড়িয়ে দেড় লক্ষ করা হয়েছিল, নয়ত সেও মোহনবাগানে চলে যেত। কৃশানু, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণগোপাল চৌধুরী ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের প্রধান শক্তি। এরা তিনজনই নিচের দিকের খেলোয়াড়দের স্কোর করার জন্য বল বাড়িয়ে দেয়। তবু সবচেয়ে ভাল স্কোরার জামশিদ ও দেবাশীষ রায়ের শূন্যতা রয়েই গেল। কৃশানুদের অনবদ্য থ্রু পাশ এখন কাজে লাগিয়ে বিপক্ষকে গোল দেওয়ার কেউ নেই। খিদিরপুর ছেড়ে আসা সুদীপ দাস ও রণজিৎ কর্মকার, জর্জ টেলিগ্রাফের বিশ্বজিৎ দাস ও মনোজিৎ দাসকে ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ড লাইনের জন্য ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু খেলার মাঠে এরা কতটা সুযোগ পায় সেটাই দেখার বিষয়। এদের একমাত্র রণজিৎ কর্মকার এ মরশুমে পাচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা। বাকি সবাই দশ হাজার টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

গতবারের তুলনায় ইস্টবেঙ্গলের হাফ লাইনও এবার কিছুটা দুর্বল। দেবাশীষ মিশ্র চলে যাওয়ায় এবার বিকাশ পাঁজীর সঙ্গে সমানভাবে আক্রমণ গড়ে তোলার কেউ রইল না। এজন্য হয়ত ইস্টবেঙ্গলকে এ মরশুমে ৪–৩–৩ প্রথায় খেলতে দেখা যাবে না। গত মরশুমে দেবাশীষ মিশ্রকে ইস্টবেঙ্গল খেলার সুযোগ দেয় নি, পেনারোলের সঙ্গে ম্যাচে শীল্ডে খেলার সময় তাকে হাফ টাইমে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ডি সি এম ট্রফির খেলাতেও ওয়ার্ম আপ করার পর তাকে জানানো হয় সে দলে নেই। দেবাশীষ চলে যাওয়ায় বহুযুদ্ধের নায়ক সুদীপ চ্যাটার্জীর দায়িত্ব আরও বাড়ল। সুদীপকে মোহনবাগান এবার দলে টানার খুব চেষ্টা করেছিল কিন্তু তার দাবী মেটানো সম্ভব হয়নি মোহনবাগানের। গত মরশুমে মহামেডানের কর্মকর্তাদের কাছে অপমান সহ্য করতে হয়েছিল সঞ্জীব ভট্টাচার্যকে। এবার সে এসেছে ইস্টবেঙ্গলে। বিপক্ষের আক্রমণের গতিকে বাধা দেওয়ায় সঞ্জীব ভাল। কিন্তু হাফ লাইন থেকে আক্রমণ গড়ে তোলার ব্যাপারে তার কাছে খুব বেশি কিছু আশা করা যায় না। হাফ লাইনে আরও রইল অমিত মজুমদার ও সুনির্মল চক্রবর্তী। কিন্তু সুনির্মল চক্রবর্তীও বিকাশ পাঁজীর মত রাইট হাফের খেলোয়াড়। তাই বাঁদিক থেকে আক্রমণ গড়ে তোলার অসুবিধে রয়েই গেল।

ইস্টবেঙ্গলের সবচেয়ে শক্তিশালী পজিশন হল ডিফেন্স। ভারতের দুই সেরা স্টপার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও তরুণ দে তো আছেই। মহামেডানের দুই ফরোয়ার্ড চিমা ও জামশিদকে সামলাবার দায়িত্ব এই দুজনের। তরুণ

দে-কে দলে টানার চেষ্টা করেছিল মোহনবাগান। ফুটবল সচিব বুয়া মিত্র ও সজল বোস ওর বাড়িতে পর্যন্ত গিয়েছিলেন দেড় লক্ষ টাকার অফার নিয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তরুণ দে দলবদল করল না। ইস্টবেঙ্গলে এ বছর তার সঙ্গে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকার চুক্তি হয়েছে। অলক মুখার্জি দল ছাড়লেও ইস্টবেঙ্গল ততটা অসুবিধায় পড়বে না। তার স্থান পূরণ করবে মহামেডান ছেড়ে আসা মুশির আহমেদ। এছাড়া আছে সমীর চৌধুরী। দুজনেই রাইট ব্যাকে ও লেফট্ ব্যাকে খেলতে পারে। পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান খেলোয়াড় বলে ইস্টবেঙ্গল এই জুটির উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। উদীয়মান স্টপার কবীর বসু, অলক সাহা, টালিগঞ্জ অগ্রগামী থেকে আসা উজ্জ্বল চক্রবর্তী, তালতলা একতার সুপ্রিয় চক্রবর্তী, মহামেডানের জয়দেব চক্রবর্তী আছে বিভিন্ন সময়ে কাজে লাগানোর জন্য। উজ্জ্বল ও সুপ্রিয় পাচ্ছে কুড়ি হাজার টাকা করে, অন্যদিকে জয়দেবের সঙ্গে এ মরশুমে চুক্তি হয়েছে আশি হাজার টাকা। মুশির আহমেদ গত বছর মহামেডানে পেয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। এ মরশুমে ইস্টবেঙ্গলে সে এক লক্ষ টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। অন্যদিকে সমীর পাচ্ছে পঁচিশ হাজার।

তিন বড় দলের মধ্যে সেরা গোলরক্ষক পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ভাস্কর গাঙ্গুলী নতুন করে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। অন্যদিকে অতনু ভট্টাচার্যের সঙ্গে চুক্তি করেছে ইস্টবেঙ্গল এ মরশুমে এক লক্ষ টাকা। ভারতের দুই সেরা গোলরক্ষকের মধ্যে কি চিমা–জামশিদ ধরনের কোন দ্বন্দ্ব গড়ে উঠবে? ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাদের আশা প্রবীণ ভাস্কর দলের খাতিরে অতনুর সঙ্গে মানিয়ে চলবে। তবে একথা নিশ্চিত ইস্টবেঙ্গলে অতনু হবে দ্বিতীয় গোলরক্ষক, প্রথমে ভাস্কর, তারপর সে। টালিগঞ্জ অগ্রগামীর প্রতিশ্রুতিবান গোলরক্ষক সুমিত মুখার্জী ও এরিয়ান্সের শেখর সাহা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পাবে কিনা কেউ নিশ্চিত নয়। এদের সাথে ইস্টবেঙ্গলের চুক্তি হয়েছে যথাক্রমে পনেরো ও পঁচিশ হাজার টাকার।

এ মরশুমে তিনটি ভিনদেশী ফুটবলার আনছে ইস্টবেঙ্গল–এদের মধ্যে দুজন নাইজেরীয়। এমেকা এজুগো পনেরো নম্বর জার্সি পরে খেলবে সম্ভবত অ্যাটাকিং মিড ফিল্ডে, অনুলু চার্লস বাপু খেলবে স্ট্রাইকার পজিশনে। এরা জে সি টি, টাটা স্পোর্টস ও বিড়লা ন্যাশন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে খেলার জন্য অফার পেয়েছিল। মহামেডান স্পোর্টিংও হানিফ খাঁর মাধ্যমে মোটা টাকার অফার জানিয়েছিল দুজনকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলেই এল এরা। অন্য এক ভিন রাজ্যের খেলোয়াড় আবিদ ইমামকে নিয়ে এসেছে ইস্টবেঙ্গল এ মরশুমের জন্য চল্লিশ হাজার টাকার চুক্তি করে।

গত কয়েক বছর খেলোয়াড় কেনা–বেচার খেলায় ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং মোহনবাগানকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছিল। এবার কিন্তু মোহনবাগানও সমান তালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। মহামেডান স্পোর্টিং–এর ফরোয়ার্ড লাইন এবার খুব শক্তিশালী আর রক্ষণভাগ অপেক্ষাকৃত দুর্বল। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ড লাইন দুর্বল কিন্তু রক্ষণভাগ খুব শক্তিশালী। সেদিক দিয়ে বিচার করলে মোহনবাগান অপেক্ষাকৃত ব্যালান্সড় দল তৈরি করেছে।

ফরোয়ার্ড লাইনে এবার মোহনবাগানের তুরুপের তাস হল দেবাশীষ রায়। ইস্টবেঙ্গল থেকে ছিনিয়ে এনেছে মোহনবাগান দেবাশীষকে। সে এবার মোহনবাগানের সবচেয়ে দামী খেলোয়াড়। এ মরশুমে সে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। পিছন থেকে তাকে বল এগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে নবাগত মুনিয়াপ্পাকে, পোর্ট ট্রাস্ট থেকে আসা সুব্রত রায়, ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে আসা সন্দীপ মুন্সী, বি এন আর–এর উত্তম মুখার্জীকে। মুনিয়াপ্পা কলকাতার মাঠে নিজেকে কতটা সেট করতে পারবে তার উপর নির্ভর করছে তার সাফল্য। অন্যদিকে সুব্রত রায়, সন্দীপ মুন্সী, উত্তম মুখার্জী এ মরশুমে অনেক বড় বড় ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। সে খেলায় টেনশনের মধ্যে তারা কতটা ভাল খেলতে পারবে সেটাই দেখার। এছাড়া আছে বিশ্বস্ত বিদেশ বসু, বাবু মানি, শিশির ঘোষ, মানস ভট্টাচার্য ও জেভিয়াস পায়াস। লেফট্ আউটে বিদেশ বসু আর ভিজে মাঠে মানস এখনও মোহনবাগানে অপরিহার্য। বাবু মানির উপর দলের আশা, এ বছর সে তার অভিজ্ঞতার ফল দেখাবে। এদের কাজ হবে দেবাশীষ রায়কে ঠিকমত ব্যবহার আর তার উপরেই নির্ভর করেছে দলের সাফল্যের চাবিকাঠি। আক্রমণ বিভাগে সুবীর সরকারের অনুপস্থিতির জন্য মোহনবাগানকে খেসারত দিতে হতে পারে। তার মধ্যে বিপদের সময় বুদ্ধি ও পরিশ্রম দিয়ে ম্যাচ বের করে আনার যে ক্ষমতা ছিল তা যে কোন দলের পক্ষে এক মস্ত সহায়।

হাফ লাইনে মোহনবাগানের পুরনো বিশ্বস্ত খেলোয়াড় প্রশান্ত ব্যানার্জী তো আছেই, তার সঙ্গে এসেছে ইস্টবেঙ্গল থেকে দেবাশীষ মিশ্র। প্রশান্ত তার পুরনো ফর্ম ফিরে পেয়েছে। সেই সঙ্গে যোগ হল দেবাশীষের মাঝ মাঠ থেকে আক্রমণ গড়ে তোলার ক্ষমতা আর তা প্রয়োজন মত ফরোয়ার্ডে এগিয়ে দেওয়ার দক্ষতা। এ দুজনকে দিয়েই মোহনবাগান মাঝমাঠটি দখলে রাখতে পারবে। তার সঙ্গে আছে মহামেডান স্পোর্টিং থেকে আসা অমল রাজ ও টেলিগ্রাফের লিংকম্যান সত্যজিৎ চ্যাটার্জী, যারা প্রয়োজনের মুহূর্তে দরকারি হয়ে উঠতে পারে। তপন ঘোষ ও টালিগঞ্জ অগ্রগামীর ভাস্কর দাশগুপ্তকেও এ বছর মোহনবাগানের মাঝমাঠে দেখা যাবে।

বহু বছর ধরে মোহনবাগানের রক্ষণভাগ আগলে রেখেছে সুব্রত ভট্টাচার্য অসাধারণ গেম সেন্স এখনও তাকে ভারতের প্রথম সারির স্টপারের আসনে বসিয়ে রেখেছে। তার পাশে আছে সত্যজিৎ ঘোষ। নবাগত মস্তানের স্থান এদের দুজনের পরিবর্তে হতে পারে। তবে তাকে প্রথমে কলকাতা মাঠে নিজেকে 'সেট' করতে হবে। কভারিং ডিফেন্সে আছে এক সেরা জুটি কৃষ্ণেন্দু রায় আর অলক মুখার্জী। অলক মুখার্জীকে এবার ইস্টবেঙ্গলের ডেরা থেকে ছিনিয়ে এনেছে মোহনবাগান, এ মরশুমে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার চুক্তি হয়েছে। বিপক্ষের আক্রমণের মোকাবিলা করতে কৃষ্ণেন্দু ও অলকের ট্যাকলিং মোহনবাগানের ডিফেন্সকে এক শক্ত ঘাঁটি করে তুলবে। এছাড়া

মোহনবাগানের আক্রমণ এবং দুর্গ সামলানোর দায়িত্বে: দেবাশীষ রায়, সুব্রত ভট্টাচার্য এবং অলোক মুখার্জি।

আছে আব্দুল মজিদ, রাজস্থানের সাইড ব্যাক কৃষ্ণেন্দু সেনগুপ্ত, শ্যামল ব্যানার্জী ও নবাগত অমিত ভদ্র যাদের উপরও দায়িত্ব পড়বে মোহনবাগানের রক্ষণভাগ সামলানোর।

গত মরশুমে তনুময় বোস একেবারে টপ ফর্মে ছিল। তার সঙ্গে রয়েছে প্রতাপ ঘোষ মোহনবাগানের গোলরক্ষার কাজে। এ দুজনকে পেয়ে মোহনবাগান নিশ্চিন্ত। এছাড়াও রয়েছে ইন্দ্রজিৎ পাল ও দীপ্তিপ্রকাশ দে। এরাও কখন কখনও গোলরক্ষায় দলের কাজে লাগবে।

এবার দলবদলের একটি বিশেষত্ব হল তিনটি বড় দলেই প্রচুর খেলোয়াড়ের সমাবেশ। এর মধ্যে মহামেডান স্পোর্টিং সবচেয়ে বেশি–বিয়াল্লিশ জন। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানেও তেত্রিশ জন করে খেলোয়াড় আছে এ মরশুমে। এত বেশি সংখ্যায় খেলোয়াড় নেওয়ার কারণ সম্ভবত এশিয়াডের কোচিং ক্যাম্প, যেখানে অনেক খেলোয়াড়ই চলে যাবে। গত বছরের মত এবছরও ফুটবল বাজেট ইস্টবেঙ্গলেরই সবচেয়ে বেশি। তাদের দলে নয় জন খেলোয়াড় লক্ষাধিক টাকা পাচ্ছে। অন্যদিকে মোহনবাগানে পাচ্ছে পাঁচ জন ও মহামেডান স্পোর্টিংএ তিন জন। বেশি পয়সা খরচ করে দামী দামী খেলোয়াড় নিয়ে দল তৈরি করলেই ট্রফি জেতা যায় না। সব সময় কাগজে কলমে যারা শক্তিশালী খেলার মাঠে তাদেরকে অনেক সময় বিপক্ষের দুর্বল দলের কাছে নাস্তানাবুদ হতে দেখা গেছে। ছিয়াশির ফুটবল লীগ শুরু হচ্ছে ৯ মে। তবে তিন প্রধানের খেলা পড়েছে একটু দেরিতে। ইস্টবেঙ্গলের ১৯ মে, মোহনবাগানের ২১ মে ও মহামেডান স্পোর্টিং এর ২৩ মে। তখনই পাওয়া যাবে আসল খবর, দলবদলের খেলায় কোন দল সত্যিকারের জয়ী।

Rashmi

পঞ্চামৃত
আয়ুর্বেদের জ্ঞানসাগর মন্থন করে পৃথ্বিতলের অমৃত
আপনার সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য
ঝণ্ডু পঞ্চারিষ্ট
খিদে বাড়ায়, দ্রুত হজম করায়।
মানসিক চাপ, অনিদ্রা প্রভৃতি জনিত দুর্বলতা দূর করে।
আপনার স্বাস্থ্যকে সদা সতেজ রাখে।
১৯১০ থেকে উৎকর্ষতার প্রতীক... ঝণ্ডু
AYURVEDIC MEDICINE
ZANDU
PANCHARISHTA
पंचारिष्ट
COMPOSITION
Each 30 ml. Contains
Angurasava 6.0
Ashwagandharishta 7.5 ml.
Dashmoolarishta 7.5 ml.
Lohasava 6.0 ml.
Alcohol Content about 7% v/v
Batch No 2140
ZANDU PHARMACEUTICAL WORKS LTD.
MADE IN INDIA